বাহুল্য বর্ণনার প্রয়োজন নেই। রীগল্ বিল্ডিংয়ের আশেপাশে লোক জমেছে বিস্তর। যানবাহনের জটলা সন্ধ্যার দিকে কনটুপ্লেসের পাড়ায় প্রতিদিনই বেড়ে ওঠে, তার ওপর 'রীগলে' আবার নতুন হুজুগ। আলোকমালায় চারদিক উদ্দীপ্ত। মখমলের সজ্জায় আর ইলেকট্রিকের ঘূর্ণ্যমান কৌশলে রীগল্‌কে সুসজ্জিত করা হয়েছে। কাউণ্টারে টিকিট আর নেই, ভিতরকার আলো নিভিয়ে কেরানীরা পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহের কোণ নিয়েছে। বাইরের দিকে প্রাচীরপত্র, ষ্ট্রীমার, প্রচার পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন ও হ্যাণ্ডবিল-এ পথের এই অংশটা পরিপূর্ণ। রীগলের পর্চ-এর নীচে উৎসুক একটি জনতা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। পথের ঠিক ওপারে ট্যাক্সিওয়ালাদের আজ উৎসব লেগে গেছে।

ভিতরে পালা গানের আসর বসেছে। রমেনবাবু ও তাঁর সহকারিগণের ব্যবস্থাপনা এবং ঈশানীর নির্দেশ—এর বাইরে আর কারো হাত নেই। মায়া-কানন হোলো একটা কল্পনা, তার ধরা-ছোঁওয়া নেই,—তাকে দৃশ্যমান বাস্তবে পরিণত করার মতো কবিকল্পনার দরকার বৈ কি। পিছন থেকে মোহলোক সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছে কে? কে যোগান দিচ্ছে যাদুমন্ত্র?

মিথ্যাকে সত্য ব'লে উপলব্ধি করার আনন্দ! শিক্ষিত সুরসিক জনসাধারণ আকুল আগ্রহ নিয়ে এসেছে সানন্দে প্রতারিত হবার জন্যে। নিখুঁতভাবে যদি প্রতারিত না হ'তে পারে তাহ'লেই কঠোর সমালোচনা। টাকা খরচ ক'রে নির্বোধ বন্‌তে না পারলে ওরা দুঃখবোধ করবে। মিথ্যা যদি মনোরম হয় তবেই পাবে হাততালি। ওরা সবাই এসেছে টাকা দিয়ে ঠক্‌তে, বাড়ী ফিরবে শূন্য তহবিল নিয়ে—তাইতেই আনন্দ।

নিস্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্ট শত শত মুগ্ধদৃষ্টি মঞ্চের দিকে নিমেষনিহত। সেই

বস্তু ওরা চায় যা পাবার উপায় নেই। চাইছে সেই রস, যেটা রসোত্তীর্ণ। সম্মোহন-বিদ্যাই নাকি রঙ্গমঞ্চের প্রাণ।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে লঘুগতি শান্তনু এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের চোখ দিয়ে সে দেখতে চায় ঈশানীকে। বাইরের দৃষ্টি দিয়ে জানা ভিতরের মানুষকে। কামনা, না আরাধনা—কোন্‌টা? আনন্দের ভোজ, না লোলুপের লেহনতা? মায়াচ্ছন্ন মোহলোক সৃষ্টি করে কি ঈশানী, না বাসনার অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে পতঙ্গদলকে পুড়িয়ে মারে? আপন আত্মিক শক্তির দ্বারা সে কি নাচের ছন্দে বিশ্বের নিগূঢ় প্রাণলীলাকে প্রকাশ করে, না কি কায়িক কসরতের কৌশলে প্রলুব্ধ দর্শকের তহবিল আত্মসাৎ ক'রে পালায়? অনেকগুলো জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া শান্তনুর দরকার।

মঞ্চের উপরে অরণ্যলোক শাল্মলীদলের ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন। অরণ্যবিটপীর পাদলোকে যোগাসীন প্রাচীন মুনিঋষিরা তপঃক্লেশে প্রস্তরীভূত—জটিল শিকড়ের জটলায় তাদের কঙ্কাল সমাকীর্ণ। গহনবনে জ্যোৎস্নার আভাস এসেছে। রাত-জাগা পাখীর কচিৎ কূজন। এমন সময় দূরাগত নারী-কণ্ঠের মৃদুসঙ্গীত। মদন আর বসন্তের খেলা চলছে বনে-বনে। তৃতীয় পাণ্ডব বনবাসী অর্জুন সেই অরণ্য অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিলেন, সহসা শুনলেন ললিতকণ্ঠের অনুরাগ। সেই কণ্ঠকে অনুসরণ করেন তিনি। অদূরে নির্জন বনতলে রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা নৃত্যের রসে আত্মবিভোর। অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে সব্যসাচী বিস্ময়ানন্দের সুধাপান করেন।

হঠাৎ চাপাকণ্ঠের ডাক শোনে শান্তনু। শান্তনু ফিরে তাকায়। ইসারায় ডাকেন দত্তচৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী। একথা মনে ছিল না এঁরা আজ আসবেন। শান্তনু তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ঠিক ধারেই তাঁরা বসেছেন, বাক্যালাপের অসুবিধা নেই। চাপা গলায় তাঁরা বললেন, আবার দেখা হয়ে গেল, ভারি খুশী হলুম। ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সীট্ পাননি?

সীট্ নেই, এমনি এসেছি।

ও, চেনাশোনা আছে বুঝি?—উল্লসিত কণ্ঠ তাঁদের।

শান্তনু বললে, ম্যানেজারের সঙ্গে সামান্য চেনা।

দত্তচৌধুরী বললেন, চমৎকার লাগছে মশাই, এ রকম দেখিনি কখনও।

স্ত্রী বললেন, এই ঈশানী রায়? অদ্ভুত সুন্দর দেখতে! নাচ দেখলে মনে হয় শরীরে কোথাও হাড় নেই,—যেমন খুশী বাঁকাচ্ছে আর মোচড়াচ্ছে। কী সাপ্‌ল্ বডি।

দত্তচৌধুরী বললেন, সত্যি নাচের সঙ্গে চেহারাটাও মানিয়েছে!

অন্ধকারে ওরা শান্তনুর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে না।

স্ত্রী বললেন, আচ্ছা, মিষ্টার চৌধুরী,—মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করা যায় না? ম্যানেজার ত' আপনার বন্ধু!

উৎসুক দত্তচৌধুরী বললেন, ওঁরা কি বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ করেন না?

ওখানে আর দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আশপাশের লোকের বিরক্তি হতে পারে। তা ছাড়া শান্তনুর এখনি ডাক পড়বে। টাকা নিয়েছে সে,—তার নিজের একাউণ্টে সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। এখনি গিয়ে তাকে বাঁশী বাজাতে হবে।

শান্তনু বললে, একটু পরে এসে আপনাদের জানাবো।

আমরা কিন্তু আশা ক'রে রইলুম।—

ঘাড় একটু হেঁট ক'রে শান্তনু দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পথের দিকে একবার তাকিয়ে মহিলা তাঁর স্বামীর কানে কানে বললেন, নাচ দেখে তুমি একেবারে পাগল! কই, বললে না ত' অমন মেয়ে তুমি কোথায় দেখেছিলে?

তন্ময় চক্ষে দত্তচৌধুরী মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার বললেন, কোথায় ঠিক্ মনে নেই, তবে অনেকটা ওই রকম।

মহিলা অন্যমনস্কভাবে ব'লে উঠলেন, বাঃ দেখো, জড়োয়ার মুকুটে কেমন মানিয়েছে চিত্রাঙ্গদাকে।

কতক্ষণের মধ্যেই বাঁশীর সুর শোনা গেল। সমস্ত আবহ্-সঙ্গীত এবং আনুষঙ্গিক বাদ্য সহসা নীরব। বাঁশীর মধুর তানে সচকিত হোলো চিত্রাঙ্গদা—

সম্মোহিত বিলোল নৃত্য বাঁশীর সুরে নিজেকে মিলিয়ে নিল। অশ্রুর বিন্দুরা জমে উঠেছে চিত্রাঙ্গদার দুই চক্ষে। অদূরে অন্তরালে ব'সে রমেনবাবুর দুই মুগ্ধদৃষ্টি স্থির হয়ে রইলো। নাচতে নাচতে চিত্রাঙ্গদা গেল বেরিয়ে, বনবাসীরা চড়া সঙ্গীত ধ'রে এলো তার সন্ধানে,—তারপর নৃত্য সুরু ক'রে দিল।

মাঝখানে দুটো গানের সঙ্গে নাচ, তারপর অর্জুনের বিরহ। সুতরাং সময় হাতে ছিল। ঈশানী এসে দাঁড়ালো একটি সিল্কের জোব্বায় নিজেকে জড়িয়ে। শান্তনু আড়ালে এসে দাঁড়ালো। ঈশানী বললে, মাঝে মাঝে তুই বেরিয়ে যাচ্ছিস কেন রে?

শান্তনু বললে, কে কি বলে জানা দরকার!

কিন্তু আজ আমার একটু আড়ষ্টতা আছে, সম্পূর্ণ প্রাণ ঢালতে পাচ্ছিনে।

সর্বনাশ,—এ কি কথা?

ঈশানী বললে, ভিক্টরকে তোরা না আনলেও পারতিস!

শান্তনু বললে, কই, ভিক্টর আসেনি ত'? তাকে যে নন্দর কাছে রেখে এলুম!

যাক্ বাঁচলুম! আর কোনো কুণ্ঠা নেই!—হাসিমুখে ঈশানী পুনরায় বললে, লজ্জা-মান-ভয় এবার দিলুম ঘুচিয়ে। পৃথিবীকে ডাক দিয়ে ব'লে দে এবার, কবি-কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি তারা দেখে যাক্!

শান্তনু হেসে বললে, এ ত' অহঙ্কারের কথা!

নিশ্চয়! কিন্তু তুই আমার সকল অহঙ্কারকে একদিন ঘোচাবি, তাই তোর কাছে প্রকাশ ক'রে রাখলুম! আমার যা কিছু ভালো-মন্দ, গৌরব-কলঙ্ক, পাপ-পুণ্য—সব নিয়ে যে-আমি, সেই-আমিকে অঞ্জলি দেবো!

প্রবল হাততালি উঠছিল প্রেক্ষাগৃহে। সেদিকে একবার তাকিয়ে শান্তনু বললে, ভাব করবি এক জনদের সঙ্গে?

ঈশানী বললে, কে?

সেই যে কাল বললুম, তোর সতীন?

পোড়াকপাল আরেকবার পুড়বে না ত'?

শান্তনু বললে, কা'র? তোর না তার?

ধর্ আমারই?

তাহ'লে নির্ভয় দিচ্ছি। তোর সিংহাসন অচল রইলো!

অভিভূত চক্ষে ঈশানী তাকালো শান্তনুর প্রতি। শান্তনু স্থির, সংযত, শান্ত। এক পা এগিয়ে ঈশানী কিছু বলবার চেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু থাক্, এখানে নয়। শুধু বললে, অবিশ্বাসী, জানি তোর মনের কথা। নিজের নখের আঁচড়ে হৃৎপিণ্ডের শিরা-উপশিরা না ছিঁড়লে তোর পুজো দেওয়া যায় না, তুই এমনি ভীষণ!—যা, পালা-গান শেষ হ'লে সতীনকে ভেতরে আনিস, আলাপ করবো।

গা থেকে পুনরায় ঈশানী জোব্বাটা খুলে' নিল, তারপর হেসে চ'লে গেল পর্দার পাশ দিয়ে সোজা মঞ্চের ওপর। প্রেক্ষাগৃহ অধীর উতরোল। কিন্তু তার আবির্ভাবে সহসা সব স্তব্ধ। সম্মান এবং শ্রদ্ধায় জনসাধারণ মন্ত্রমুগ্ধ।

পালা-গান শেষ হোলো, রাত তখন দশটা। বিরাট জনতার মোহমদির চক্ষু বিমূঢ় হতবিস্ময়ে সহসা যেন বাড়ী ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। পথে পথে জনতার প্রবল সোরগোল দেখা দিয়াছে।

প্রেক্ষাগৃহ প্রায় যখন শূন্য হয়ে এলো তখন শান্তনু এসে দাঁড়ালো দত্ত-চৌধুরীদের সামনে। শান্তনু যেন যন্ত্রচালিত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। তার এই দৌত্যগিরি উভয়ের জীবননাট্যে কোন্ অজানা ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করবে সে জানে না। কিন্তু তার নিজের কাছে তাকে সত্য হ'তে হবে বৈ কি। সে মধ্যবর্তী, তার জানা দরকার ঈশানীর প্রাণের নির্ভুল সত্যকে। সংশয়, সূক্ষ্ম অবিশ্বাস, নিগূঢ় দুর্বলতা, জপের মালায় প্রথম প্রণয়ের ইষ্টমন্ত্র, প্রাণদেবতার নিভৃত নৈবেদ্যের অঞ্জলি, নারীর অন্তরের আশ্চর্য রহস্য,—এসব না জানলে ঈশানীর সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কটাও সত্য হবে না। জানার থেকে জ্ঞান, সেই জ্ঞান যেন শান্তনুর সংশয়াচ্ছন্ন না থাকে।

আসুন!—শান্তনু তাদেরকে আহ্বান ক'রে ভিতরে নিয়ে গেল। ওরা খুশী হয়ে চললো শান্তনুর পিছনে পিছনে।

কাঠের রঙীন সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসেছিল চিত্রাঙ্গদা, মাথার মুকুট রয়েছে তখনও,—সহস্র মণিমাণিক্যভরা সেই রাংতা মোড়া মুকুট, বাজারে ফেললে যার দাম পাঁচটা টাকার বেশী নয়। কপাল বয়ে দরদর ঘামের ধারা নামছে,—রং ধুয়ে যাচ্ছে সেই ঘামে। ওষ্ঠাধর রক্তরঙীন চোখে মোহকজ্জল। লজ্জাবাসগুলি সীমান্তরেখার বাইরে যায়নি। আগেই বলা হয়েছে, ভয়-লজ্জা-মান,—এদের দায়-দায়িত্ব ঈশানী আজ স্বীকার করবে না।

অদূরে একটা টেবল্ ফ্যান্ ঘোরানো রয়েছে, সেই হাওয়ায় চোখ বুজে ঈশানী ক্লান্ত শরীরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

শান্তনু ওদেরকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে ঈশানীকে ডাকলো। ঈশানী চোখ খুলে সামনে ওদেরকে দেখেই দ্রুতহস্তে জোব্বাটা গায়ের উপর টেনে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে নমস্কার জানাতে গিয়ে দত্তচৌধুরীকে দেখলো নিরীক্ষণ ক'রে।

শান্তনু বললে, উনি ক'দিন থেকেই খুব ক্লান্ত।

মহিলা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, কাছে দাঁড়িয়ে আপনাকে কোনদিন দর্শন করবো স্বপ্নেও ভাবিনি,—কী যে আনন্দ হচ্ছে!

দত্তচৌধুরী সম্ভবত একেবারেই ঈশানীকে চিনতে পারেননি; কেন না প্রসাধনসজ্জাটা সম্পূর্ণভাবে তাকে অন্তরালে রেখেছিল। শান্তনু প্রতি পলক, প্রতিটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত একটির পর একটি গুণছে! পায়ের তলায় তার ভূমিকম্প নাড়া দিচ্ছে, পা টলছে তার।

দত্তচৌধুরী বললেন, আমার স্ত্রী মিথ্যা বলেননি। আজ আমাদের সকলের বড় গৌরব! আমরা সৌভাগ্যবান।

ঈশানী চিনতে পেরেছিল পলকের মধ্যে, কিন্তু তার চক্ষু ভাষাহীন,—কেবল তাকিয়ে ছিল যেন অর্বাচীন কুমারী মেয়ের মতো।

দত্তচৌধুরী ব'লে যাচ্ছিলেন,—আপনার নাম, আপনার খ্যাতি, দেশ-দেশান্তরে আপনার প্রতিষ্ঠা,—সত্যি বলতে কি, আপনি যাঁদের বাড়ীর মেয়ে, তাঁদেরও পরম সৌভাগ্য।

মহিলা প্রশ্ন করলেন, আমার কৌতূহলকে ক্ষমা করবেন, আপনি বিবাহ করেছেন?

দত্তচৌধুরীর মুখের উপর ঈশানীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো। ঘাড় নেড়ে সে জানালো, না, বিবাহ সে করেনি।

করেননি?—কী উদ্দীপনা মহিলার কণ্ঠে।

ঈশানীর স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি দত্তচৌধুরীর মুখের উপর থেকে সরলো না। উন্নত মস্তকে তার মুকুট, দীপ্ত মহীয়সীর মতো তার ব্যক্তিত্ব, প্রাকৃত যৌবনের অজস্র সম্পদ স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে সর্ব অঙ্গে তার উচ্ছ্বসিত।

পুলকিত কণ্ঠে মহিলা বললেন, বিয়ে না ক'রে ভালোই করেছেন!

অনিমেষচক্ষে চেয়ে মৃদু জড়িতকণ্ঠে ঈশানী কেবল উচ্চারণ করতে পারলো, ভুল করেছি!

তা'র অবশ হাতের মুঠি থেকে জোব্বাটা খ'সে পড়লো মাটিতে।

কেন বলুন ত?—কোট-প্যান্টপরা দত্তচৌধুরী খুব খানিকটা কৌতুক বোধ করলেন।

মহিলা উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, উনি বলছিলেন, ঠিক আপনার মতন মেয়ে উনি যেন কোথায় কবে দেখেছেন! বলো না গো, উনি নয় ত'?

না না, সে কিছু নয়, সে অন্য কথা।—দত্তচৌধুরী একটু লজ্জা পেয়ে এড়িয়ে গেলেন।

মাঝপথে এবার শান্তনু বাধা দিল। বললে, এবার উনি যাবেন গ্রীনরুমে! আচ্ছা আবার দেখা হবে। উনি বড় ক্লান্ত।—এই ব'লে বাঁশীটা হাতে নিয়ে সে স'রে গেল।—

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ম্যানেজার রমেনবাবু এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে অভ্যাগতরা এবার বিদায় নিল। যাবার সময় মহিলা গদগদ প্রশংসায় বললেন, আজকের কথা চিরদিন মনে রাখবো। আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে যাই!

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এত বড় আর্টিষ্টের পায়ের ধুলো থেকে আমিও

বঞ্চিত হ'তে চাইনে।—দত্তচৌধুরী সোৎসাহে মাথা নীচু করলেন। অতঃপর স্বামী স্ত্রী উভয়েই হেঁট হয়ে ঈশানীর পায়ের ধূলো নিয়ে নত নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। রমেন বাবু তাঁদের পথের দিকে একবার তাকিয়ে এবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, Delhi taken by storm! এতখানি সাফল্য লাভ করবে, কখনও কল্পনা করিনি।...আঁ্যা আঁ্যা, কি হোলো ঈশানী, ও কি, কি হোলো?

সিংহাসনের উপর কাৎ হয়ে লুটিয়ে ঈশানীর অচেতন দেহ মেঝের উপর প'ড়ে গেল।

আরে, তাই তো......অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ঈশানী অজ্ঞান হয়ে গেছে! ডাক্তার, ডাক্তার—বলতে বলতে রমেনবাবু পাগলের মতো ছুটলেন।

বাঁশীটা হাতে নিয়ে শান্তনু আবার এসে দাঁড়ালো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শান্তভাবে সে ঈশানীর মাথার মুকুট ও সর্বাঙ্গের অলঙ্কার খুলে নিল। সিংহাসনখানা সরিয়ে দিয়ে ঈশানীকে সমানভাবে সযত্নে সে শুইয়ে দিল। তারপর রেশমের মিহি জোব্বাটা নিয়ে এই প্রস্ফুটিত শতদলের প্রায় সমস্ত দেহখানি পরম স্নেহে আবৃত করলো। টেবল্ ফ্যানটা আরেকটু ফিরিয়ে রাখলো তার দিকে। মলিন আলোয় বিবশ তনুলতাকে আশ্চর্য মনে হচ্ছে। এক আঁজলা জল এনে সে ঈশানীর মুখে ও মাথায় বুলিয়ে দিল।

হুড়োহুড়ি ক'রে মেয়েরা ও পুরুষরা আসছিল এদিকে। শান্তনু ছুটে গিয়ে তাদেরকে বাধা দিল। বললে, কিচ্ছু দরকার নেই। আপনারা কেউ কাছে যাবেন না। আপনিই সেরে উঠবে।

ডাক্তার আসছে এক্ষুণি।

এলে ফিরিয়ে দেবেন। ডাক্তারের দরকার নেই!

সবাই অবাক। কিন্তু তারা আরও অবাক হয়ে গেল যখন দেখলো, শান্তনু ওইখানেই ব'সে বাঁশীতে ফুঁ দিল। লোকটা ত' ভারি অদ্ভুত! আক্কেল-বিবেচনা কিছু নেই,—এটা কি বাঁশী বাজাবার সময়? লোকটার চেহারায় কোনো উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে না, ভারি নিষ্ঠুর ত'! কেউ বললে, ওর মাথার ছিট্, কেউ বা বললে, ক্রু আল্গা।

ছুটছুটতে তে রমেনবাবু এলেন আবার।—কেমন আছে, ঈশানী ? সর্ব্বনাশ হবে না ত' ? ভাবনা নেই কিছু ?—তিনি হাঁপাচ্ছিলেন।

হাত বাড়িয়ে শান্তনু শুধু অভয় দিল।

মিনিট পাঁচেক পরে শান্তনু গিয়ে দেখলো, ঈশানী ক্লান্ত শরীরে উঠে বসেছে। কে যেন এক গ্লাস সরবৎ তাকে এনে দিল। হাসিমুখে শান্তনু এবার বললে, বেশ মধুর স্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলি, নারে ?

হাসিমুখে ঈশানী শুধু তাকালো। শান্তনু এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধ'রে বললে, চল্ এবার বাড়ী যাই।

চল্—জোব্বাটা জড়িয়ে ঈশানী সাজঘরের দিকে চ'লে গেল।

সেদিন অনেক রাত্রে একাকী ঈশানী ভিক্টরের বিছানার ধারে এসে দাঁড়ালো। অতি কোমল নীলাভ আলো জলছে, মৃদুগতি পাখা ঘুরছে। জানলা-দরজা সব খোলা। কেঁদে কেঁদে ঈশানীর চোখ ফুলেছে,—বোধ হয় যেন প্রায়শ্চিত্তের কান্না, বোধ হয় বা নিগূঢ় বেদনার। বিছানার পাশে অস্তমুখী চন্দ্রের মলিন আভা এসে পড়েছে। নিষ্পাপ নিরপরাধ বালক তার জীবনের সমস্ত সারল্য ও শুচিতা নিয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে। কদর্য আত্মগ্লানি আর ধিক্কৃত অনুশোচনায় এই বালকের জন্ম—একথা ঈশানী যেন নতুন ক'রে জানলো। অসীম ঘৃণায় জর্জ্জরিত তার বাৎসল্য, জঘন্য লজ্জায় তার মাতৃহৃদয় নিত্য মালিন্যের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত,—তার চেয়ে বেশী একথা কেউ জানে না। মনে আছে একটি দিনের জন্যও এ বালককে সে স্তন্যদান করেনি, একটি মুহূর্তের জন্যও কোলে তুলে নেয়নি, একটিবারও সে এ বালকের জন্য শুভকামনা করেনি।

ঈশানী অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একথা আজ বলা চলবে না যে, তার হারানো বাৎসল্যের নতুন ক'রে উদ্বোধন ঘটছে। দশ বছর ধ'রে যে সন্তানকে কোনোদিনই সে স্বীকার করেনি, একটিবারের জন্যও যে কাছে টেনে নেয়নি, আজ হঠাৎ একটা ঘটনাচক্রে নাড়া খেয়ে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে সে কাঁদবে—তেমন বায়ুগ্রস্ত স্বল্পমুগ্ধা অন্ধ জননী সে নয়। সব

জানে সে, কিন্তু অবাধ্য চোখের জল আজ কোনোমতেই আর বাধা মানছে না। নিরপরাধ নাবালক কোনো প্রকারেই কোনোদিন সামাজিক স্বীকৃতি পাবে না, পিতামাতা জীবিত থাকতেও তাকে চিরদিন জন্মকলঙ্কের ভার নিঃশব্দে ব'য়ে বেড়াতে হবে—এই বালকের মাথার উপর ভবিষ্যতের সেই জগদ্দল বোঝার কথা কল্পনা ক'রে ঈশানীর গাল বেয়ে আবার অশ্রু নেমে এলো। বাৎসল্যের বেদনা-বোধ নয়, অন্ধ মাতৃস্নেহের বুভুক্ষু বাসনা নয়—কিন্তু অপাপবিদ্ধ পুণ্যজন্মের উপর মিথ্যা কলঙ্কের গুরুভার চাপিয়ে সংসারের পথে ছেড়ে দিচ্ছে এক শুচি-শুদ্ধ বালককে,—এই ধিক্কারে ঈশানীর জীবন কি জ্বলে পুড়ে যাবে না? আকণ্ঠ গরলের বিষাক্ত রুদ্ধশ্বাস, আত্মপ্রতারণার চিত্তবিকার, অশুচি মনের পুঞ্জীকৃত মালিন্য, অনুশোচনার নিত্য হাহাকার,—এ নিয়ে ঈশানীর অভিশপ্ত পরমায়ু কবে শেষ হবে? এ নিয়ে দিনের পর দিন সে ওই শান্তনুর সামনেই বা দাঁড়াবে কেমন ক'রে? তার যত পাপ, অন্যায়, দুষ্প্রবৃত্তি, অসংযম, তার সমস্ত অগৌরবের দায়িত্ব এই বালকের কাঁধে চাপিয়ে সে নিজের সুখের সন্ধানে পালাবে ওই শান্তনুকে নিয়ে? এতবড় অনাচারের ফল ওই শান্তনুর অমঙ্গলকেও কি ডেকে আনবে না?

সহসা মেঝের উপর হাঁটুদুটো নামিয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়লো ভিক্টরের মাথার পাশে, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো বহুক্ষণ। বড় ঘড়িতে রাত দুটো বাজলো।

পিছনের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো শান্তনু। রুদ্ধ কান্নার তরঙ্গ উঠছে ঈশানীর সর্বশরীরে। স্তব্ধ হয়ে শান্তনু চেয়ে রইলো। এ দৃশ্যের একটি স্বাভাবিক মহিমা আছে, যেটি তার পক্ষে অপরিজ্ঞাত। কিন্তু নিষ্পাপ বালকের স্বাভাবিক আকর্ষণ যে তার উদাসীন জননীকে আজ বাৎসল্যের বেদনায় ঝরঝরিয়ে কাঁদালো, এর জন্য শান্তনুর মনে কিছু স্বস্তিবোধও ছিল।

চুপ ক'রে রইলো শান্তনু কিছুক্ষণ, তারপর যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চ'লে গেল নিজের ঘরে,—এবং নিশ্চিন্তভাবে বিছানায় পা এলিয়ে দিল।

কতক্ষণ অবধি সে ঘুমিয়েছিল কে জানে, কিন্তু ডাক শুনে জেগে উঠেই

দেখে, সামনে ভিক্টর সগু স্নান ক'রে পরিচ্ছন্ন হাস্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটি কখনও নিয়মের ব্যতিক্রম করে না।

বুঝলে মিষ্টার চৌধুরী, তোমাকে একটা খুব মজার কথা বলতে এলুম।

হাসিমুখে শান্তনু বললে, শীগগির বলো, দম আটকে আসছে।

হো হো ক'রে হেসে উঠে চুপি চুপি ভিক্টর বললে, মাম্মি কাল রাত্রে কোথায় ঘুমিয়েছিল জানো? আমার পাশে—হ্যাঁ, আমার বালিশেই মাথা দিয়ে। শিল্‌ভিয়া থাকলে কী হাসি হাসতো, তোমায় কি বলবো।

হাসতো কেন শিলভিয়া?

আমরা কি কেউ এক বিছানায় শুই?

শান্তনু বললে, সত্যি, ভারি মজার কথা। মাম্মি হয়ত মনে করেছে তুমি ওর ছোট ছেলে।

ভিক্টর বললে, তা কি ক'রে হবে? মাম্মি ত' আর স্বপ্ন দেখেনি! আমি ঘুমোচ্ছিলুম, তখন চুপি চুপি এসে ঘুমিয়েছে! আমি দেখেই লাফিয়ে উঠে পালিয়েছি।

শান্তনু হেসে উঠলো, বেশ করেছ! মাম্মিদের স্নেহ হোলো সাপের ছোবলের মতন। একবার ছোবল দিলেই হয়—ব্যস, চিরকাল মনের মধ্যে বিষ ছুঁয়ে থাকবে। আচ্ছা ভিক্টর—ধরো, মাম্মি যদি তোমার মা হোতো?

ভিক্টর বললে, বা রে, আমি কি ছোট্ট ছেলে যে, মা হবে?

মা হ'লে তুমি ভালোবাসতে?

ভিক্টর একটু অবাক হয়ে থতমত খেয়ে গেল। বললে, সে আমার কি? মা কেন হবে? আমাদের আবার মা থাকে নাকি?

শান্তনু বললে, অবিশ্যি আমিও ঠিক জানিনে, তবে শুনেছি সকলেরই একটা ক'রে মা থাকে।

তোমার ছিল?

শুনেছি। আচ্ছা ধরো, মাম্মি যদি সত্যিই তোমার মা হয়?

ভিক্টর হেসে বললে, তুমি আমাকে ক্ষ্যাপাতে চাও বুঝি? জানি তোমার মতলব। মা যদি হয় তবে বাবা কই?

বাবা! দাঁড়াও—শান্তনু বিছানা ছেড়ে নেমে এলো। পরে একটু পায়চারি ক'রে বললে, বাবাগুলো বড় গোলমেলে, বুঝেছ ভিক্টর? পথেঘাটে খোঁজো,—মা অনেকগুলো পাবে, কিন্তু ঠিক বাবার সংখ্যা বড় কম।

তুমি যে কি ছাইপাঁশ বলো বুঝতেই পারি না, মিষ্টার চৌধুরী!—ভিক্টর বললে, you are very naughty! মাম্মি যদি মা হয়, তবে ত' বাবাও থাকবে!

শান্তনু বললে, বেশ, কি রকম বাবা তুমি চাও বলো?

ভিক্টর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললে, দেখতে ভালো না হ'লে কিন্তু বাবা বলবো না!

এটা একটু মুস্কিল বুঝলে ভিক্টর? ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।—শান্তনু বললে, অর্থাৎ কি জানো, ছেলেদের ইচ্ছায় বাবারা ঠিক জন্মায় না,—ওটা একটু উল্টো ধরনের!

কেন?

শান্তনু বললে, তাহ'লে খুলেই বলি। ধরো, গাছ আর ফুল। গাছেই ত' ফুল ফোটে?

হ্যাঁ।

কিন্তু ফুল যদি বলে, আমি আগে ফুটবো, গাছ পরে উঠবে,—তাহ'লে কি সেটা সম্ভব?

যুক্তিসঙ্গত বটে! ভিক্টর একটু ভাবনায় প'ড়ে গেল। পরে বললে, বেশ, বাবা কই এবার দেখাও?

দাঁড়াও—শান্তনু বললে, একটু ভেবে নিই আগে। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটা লোককে খুঁজে পেয়েছি! কোথায় তাকে দেখেছ বলো ত'?

অনেক চিন্তা ক'রেও ভিক্টরের মাথায় এলো না। তারপর সে রাগ ক'রে বললে, আঃ তুমি বড্ড দেরী করছ বলতে,—আমি পড়তে বসবো যে এক্ষুণি! শীগগির বলো।

শান্তনু হাসি চেপে বললে, বিপদে ফেললে দেখছি। আরে, বাবা হওয়া সহজ, কিন্তু বাবা হয়ে পালিয়ে বেড়ানো যে আরো সহজ! দাঁড়াও, এবার ধরেছি! কুতব মিনারে সেদিন সেই যে দেখেছিলে মিষ্টার দত্তচৌধুরীকে,—ধরো, তিনি যদি তোমার বাবা হন? খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে ত'? অপছন্দ করতে দেবো না কিন্তু।

অনেকক্ষণ ভিক্টর ভাবলো। তারপর বললে, না, ওঁকে আমার ভালো লাগেনি সেদিন।

কেন? তোমাকে চকোলেট্ দিল, থুঁতনি ধ'রে আদর করলো!

ভিক্টর বললে, না, ওঁর ঠাণ্ডা হাত আমার ভালো লাগেনি। তা ছাড়া উনি খুকুর বাবা, আমার না! ওঁকে আমি চাইনে। তার চেয়ে তুমি অনেক ভালো। তুমি আমার বাবা হও না কেন?

শান্তনু ঢোক গিললো বার দুই। চোখ দুটো একবার সে কপালের দিকে তুললো। চোখ ফেরালো বাইরের দিকে, কিন্তু ঈশ্বরকে আকাশের দিকে দেখা গেল না। ভিক্টর তার ভঙ্গী দেখে হেসেই অস্থির। তারপর শান্তনু একটু সুস্থ হয়ে বললে, তোমার অভিসন্ধিটা খুব ভালো নয়, ভিক্টর,—তুমি যে একটি 'রেডি-মেড্' বাবা চাও, এ আমি আশা করিনি! আচ্ছা, ঝাঁটা কাকে বলে জানো?

ঝাঁটা! কই, না—?

শান্তনু বললে, জানলে ভালো করতে। তোমার মা নামক ওই মাস্মিটি এই 'রেডি-মেড্' বাবাটিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে, এই বোধ হয় তুমি চাও, কেমন?

ভিক্টর আবার হো হো ক'রে হেসে উঠলো হাততালি দিয়ে। তারপর বললে, আমি কিন্তু ঠিক আজ থেকে তোমাকে বাবা ব'লে ডাকবো, দেখে নিয়ো।

বলতে বলতে সে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এমনি ক'রেই সপ্তাহখানেকের উপর কাটলো। ইতিমধ্যে শান্তনু একদিন ভিক্টরকে নিয়ে দত্তচৌধুরীদের ওখানে গিয়ে ফটোগুলি পৌছিয়ে দিয়ে চা খেয়ে

এসেছে। ভিক্টরকে জড়িয়ে ধ'রে স্বামী-স্ত্রী অনেক সমাদার করেছে। ঈশানী এর মধ্যে চার দিন পাদপ্রদীপের সামনে নেচে বহু টাকা পেয়েছে,—যেটা রমেনবাবুর পক্ষে আশার অতিরিক্ত। শান্তনুকে বাঁশী বাজাতে হয়েছে প্রতিদিনই। তেমনি জনতার উদ্দীপনা, চারদিকে প্রচারকার্য, কাগজে কাগজে সচিত্র প্রশস্তি, বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। গেট্-এর সামনে তেমনি পাহারা, তেমনি টেলিফোন বাজছে অহোরাত্র। এর মধ্যে ঈশানী তার প্রাপ্য টাকাকড়ি এবং শান্তনুর পারিশ্রমিক—সমস্ত একত্র মিলিয়ে শান্তনুর ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা ক'রে দিয়েছে। শিলভিয়ার চিঠি এসেছে পর পর কয়েকখানা। প্রতি পত্রেই ভিক্টরের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা। কিন্তু ভিক্টরের গরমের ছুটি এখনও অনেক বাকি। শেষের চিঠিখানায় শিলভিয়া লিখেছে নিজের কথা। এই কনভেন্ট থেকে হয়ত শীঘ্রই তাকে বিদায় নিতে হবে, বিদায় নিয়ে কোথায় সে যাবে বলা কঠিন। কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করছেন, সে নাকি সম্প্রতি মিশনারী-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে। সম্ভবত ওখানে শিলভিয়ার অন্ন উঠলো। এদিকে রমেনবাবুর বোধহয় একটা ধারণা জন্মেছে, শান্তনু যদি ঈশানীর কাছে কাছে থাকে তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ঈশানীকে হারাতে হবে। ঈশানী একক থাক, এই তাঁর বরাবরের কাম্য। শান্তনুর সঙ্গে তার আত্মীয়তা কতখানি, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তিনি বোধ করেন না। কিন্তু শান্তনুকে ভিন্ন কাজে সরাতে না পারলে তাঁদের নৃত্যগীত প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবার সম্ভাবনা, এ তিনি একপ্রকার বিশ্বাস করেন।

এমনি সময়ে হঠাৎ সেদিন বিকালে বাগানের গেট থেকে ফোন এলো ঈশানীর শোবার ঘরে। রিসিভার কানে তুলে ঈশানী শুনলো, কমলা দত্তচৌধুরী এসেছেন তার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে। ঈশানী খুশীমুখে জবাব দিল, ঠিক হ্যায়, উনকো ভেজ দেও।

সিঁড়ির সামনে এসে ঈশানী আর শান্তনু দাঁড়ালো। মিনিট দুই পরে হাসিমুখে কমলা উঠে এলেন। নমস্কার জানিয়ে বললেন, কিছুতেই থাকতে পারলুম না আরেকবার আপনাকে না দেখে।

ঈশানীর সর্বাঙ্গে আজ কোথাও কোনো প্রসাধনের চিহ্ন নেই। হাত-পায়ের নখগুলি কেবল রাঙ্গানো, কারণ একবার রং লাগালে সহজে উঠতে চায় না। রুজ, পাউডার, লিপস্টিক—এগুলো বাহুল্য। আটপৌরে সাধারণ সজ্জাতেই ঈশানী ঝলমল করছিল। হঠাৎ আজ সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে, তার গলায় ঝুলছে মুক্তোর মালা!

ঈশানী উজ্জ্বল চোখে বললে, তাই বুঝি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির? আসুন, বিদেশে বাঙ্গালীকে পেলে বড় আনন্দ। কিন্তু আপনি ত' ঠিক আমাকে দেখতে আসেন নি?

কমলা বললে, নিশ্চয়, আপনার সঙ্গে দেখা করবো ব'লেই দুপুরবেলা থেকে রান্নাবান্না সেরেছি। উনি এসে পড়লে কি আর আসা হোতো? ঝি-চাকর আছে, মেয়েটাকে রাখবে, ওঁকেও চা-জলখাবার ক'রে দেবে। এবেলার মতন আমার ছুটি।

ঠিকানা পেলেন কোথায়?

ঠিকানা? দিল্লী সহরে আপনার ঠিকানা কে না জানে? তাছাড়া সেদিন শান্তনুবাবুর কাছ থেকেও ঠিকানা পেয়েছি।

ওরা কথা কইতে কইতে হলঘরটায় এসে বসলো। সহাস্যে ঈশানী বললে, তবুও বলছি, আমাকে দেখতে আসেন নি আপনি। আপনি চান চিত্রাঙ্গদাকে। মাথায় মুকুট থাকবে, জরির সজ্জা মানানো থাকবে, মণিমাণিক্য ঝলমল করবে, লজ্জা-মান খুইয়ে পা তুলে নাচবে—তাকেই দেখতে চান!

আপনাকেও চাই তার সঙ্গে!

ঈশানী এদিক ওদিক তাকালো। কোনো একটা পলকে শান্তনু কোথায় যেন গা ঢাকা দিল। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেজন্য বোধ করি শান্তনুর মনে ভয় ছিল। ঈশানী বললে, আমাদের এখানকার আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এলো। শীঘ্রই চ'লে যেতে হবে।

কমলা বললে, আমার নিজের একটা ইচ্ছে আপনাকে বলতে এলুম। এখানে বাঙ্গালীদের নাচ-গানের ইস্কুল নেই। যদি থাকতো আমার মেয়েটিকে সেখানে

ভর্তি ক'রে দিতুম। আপনি এ লাইনে একটু ভাবুন না? ওঁর কাছে শুনলুম, এখানে বহু বাঙ্গালী পরিবার আছেন।

ঈশানী প্রশ্ন করলো, আপনার কি ওই একটিই মেয়ে?

হ্যাঁ, ওই একটিই, আর না হলেই খুশী হই। উনি মাঝে মাঝে বদলি হন, ছেলেমেয়ে মানুষ করার অনেক অসুবিধে। সেদিন বাড়ী গিয়ে উনি আপনার শতমুখে সুখ্যাতি করছিলেন।

ঈশানী এক ঝলক হেসে উঠলো। বললে, আসল মানুষটাকে দেখলে কি আর অত সুখ্যাতি করতেন? উনি সেদিন দেখেছিলেন মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে! নকল সজ্জার আড়ালে আসল মানুষটা লুকিয়েছিল।

কমলা বললে, আমি যে কত চেষ্টা করলুম আরও দু'দিনের টিকিট কিনতে, কি বলবো! কোনোমতেই পেলুম না। আপনার নাচ দেখার জন্য মীরাট, রোটক, গাজিয়াবাদ থেকে পর্যন্ত লোক এসেছিল শুনলুম।

এইবার শান্তনু হাসিমুখে এসে একটু দূরে ব'সে পড়লো। কমলা বললে, কই, ভিক্টরকে দেখছিনে ত'? ছেলেটিকে নিয়ে সেদিন আমরা সবাই খুব আমোদ করেছি; মা-বাপকে জানে না, কিন্তু শিলভিয়াকে মাম্মি বলতে অজ্ঞান। ওর মা-বাবা কোথায়, আপনারাও জানেন না?

শান্তনু বললে, সম্পূর্ণ যে জানিনে, তাও ঠিক নয়—আবার সঠিক জানি বলতে গেলেও নানা অসুবিধে। ব্যাপারটা হোলো এই, আমাদের কাছে ঠিক মানুষ হয়নি ত'?

কমলা সোৎসাহে বললে, কিন্তু আমি আপনাদের ব'লে রাখলুম, ও ছেলে অসাধারণ হবে! এমন বুদ্ধি-বিবেচনা আর লেখাপড়ায় এত অনুরাগ, আমি দেখিনি কোথাও! উনি ত' সেদিন থেকেই ভিক্টর বলতে অজ্ঞান। সেদিন রাত্রে আমাকে বলছিলেন, অমনি একটি ছেলের বাবা হ'তে পারলে তবেই জীবনে আনন্দ!

ঈশানী হাসিমুখে বললে, উভয়পক্ষে রাজী হ'লে তেমন আনন্দ পাওয়া ত' খুব কঠিন নয়?

খুব হেসে উঠলো তিনজনে। কিন্তু শান্তনুর চেহারায় উদ্বেগ দেখা দিল। এর পরে এ নিয়ে যদি কথা এগোয় তবে ঘূর্ণী হাওয়ার আবর্ত রচনা হ'তে পারে। সে চুপ ক'রে রইলো।

কমলা বললে, আমার ভারি সাধ, যদি ভিক্টরকে কিছুদিন আমার ওখানে রাখার অনুমতি দেন আপনারা। শুনলুম ভিক্টরের ছুটি এখনও অনেকদিন বাকি। আমাদের ওখানে খুব ভালোই থাকবে।

ঈশানী বললে, এ ত' খুব আনন্দের কথা। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে শিলভিয়াকে নিয়ে। সে আবার ওকে ছেড়ে বেশীদিন থাকতে চায় না।

শান্তনু বললে, আরো একটা মুস্কিল আছে। যেটা প্রত্যেক মা-বাপের পক্ষে মুস্কিল।

কমলা ও ঈশানী তার দিকে তাকালো। শান্তনু বললে, এইমাত্র মিসেস দত্তচৌধুরী যা বললেন,—ধরো, অরুণবাবু যদি ভবিষ্যতে ভিক্টরকে নিজের ছেলে ব'লে দাবী করেন?

তামাসাটা অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে করা ব'লেই সোল্লাসে সকলের হেসে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগলো। শান্তনু আবার যোগ ক'রে দিল, ভিক্টরের স্বভাব প্রকৃতিও একটু বিপজ্জনক, মা-বাবার ভালবাসা ত' বিশেষ পায়নি,—হঠাৎ যদি একদিন অরুণবাবুকে বাবা ব'লে জড়িয়ে ধরে, তাহ'লে সে বাঁধন ছাড়াতেও দেরী হবে!

হেসে উঠলো কমলা। বললে, ভালোই হবে। অবিশ্বাস করবে না কেউ আপনারা ত' দেখেছেন, ভিক্টরের সঙ্গে ওঁর মুখের কতকটা আদল আসে! আমার দেওরও বলছিল তাই।

ঈশানী এবার পরিহাস না ক'রে থাকতে পারলো না। কমলার দিকে মুখখানা সরিয়ে একটু গলা নামিয়ে বললে, বলি ব্যাপার কি, মিসেস দত্তচৌধুরী? বিয়ের আগে আপনার স্বামীর কোনো ইতিহাস আছে নাকি? ঠিক খোঁজ-খবর নিয়েছেন ত'? আপনার কথাতেই যেন একটু খটোমটো লাগছে!

লজ্জায় কমলার হাসিমুখ রাঙ্গা হয়ে উঠলো। খিলখিল ক'রে হেসে

সে বললে, জানেন ত' দক্ষযজ্ঞের কালে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন ?

ঈশানীও হাসলো। বললে, আ আমার কপাল ! পুরুষ মানুষরা হোলো বিড়াল স্বভাব, ওদের পায়ের শব্দ টের পাওয়া যায় না। পালাবার পথ রেখে তবে ওরা হাঁড়ি-হেঁসেলে ঢোকে।

শান্তনু উঠে দাঁড়ালো। বললে, নাঃ, স্বজাতির অপবাদ কোনোমতেই বরদাস্ত করা চলে না।—এই ব'লে সে আবার বাইরে গেল।

হিন্দুস্থানী পাচক নিয়ে এলো গরম-গরম 'সামোসা' এবং ট্রে-তে কেটলীভরা চা। সেগুলি সামনে রেখে সে চ'লে গেল। ঈশানী নিজের হাতে সযত্নে চা ঢেলে কমলার দিকে এগিয়ে দিল, এবং বললে, নিন, দু'একটা শিঙ্গাড়া খান।

একটি শিঙ্গাড়া তুলে নিয়ে কমলা বললে, ওঁর সঙ্গে ভালো ক'রে যদি কোনোদিন আপনার আলাপ-পরিচয় হয়, আপনি খুবই খুশী হবেন।

ঈশানী মুখ তুলে তাকালো। কমলার চোখের উপর দিয়ে বহুদূরে কোথায় যেন সে উধাও হয়ে গেল। দৃষ্টি তার স্থির।

কমলা পুনরায় বললে, আমি আজও আশ্চর্য হই, মেয়েদের দিকে মুখ তুলে উনি কথা বলতে লজ্জা পান। সেদিন উনি আপনার পায়ের ধূলো নিলেন, এই ওঁর জীবনে প্রথম। সত্যি বলতে কি, বিয়ের পর ওঁর লজ্জা ভাঙ্গাতেই আমি প্রাণান্ত হতুম। মেয়েদের সাধ-আহ্লাদের কথা ওঁর কিচ্ছু জানা ছিল না। ওদিকে একেবারে নিস্পৃহ মানুষ।

নিজের চোখের মধ্যেই একসময় ঈশানীর মন ফিরে এলো। সমস্ত কথার বাইরে এসে সে কেবল বললে, তা হবে। কিন্তু জীবনটা বড় রহস্যময়, আমরা এর সামান্যই জানি।

টেলিফোন বেজে উঠলো। ঈশানী উঠে গিয়ে রিসিভারটা কানে তুললো। রমেনবাবু ফোন করছেন। কিছুক্ষণ অবধি তাঁর কথা শুনে ঈশানী প্রতিবাদ জানালো, না, কোনো পার্টিতে আমি যেতে পারবো না। না, অনুরোধ করবেন না, আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। বেশ ত' নভেম্বরে আবার দলবল নিয়ে আসা

যাবে। হ্যাঁ শুনুন, লেখাপড়ার ব্যাপারটা মিটে গেছে ত'?—বেশ, ওরা কি আজই সব চ'লে যাচ্ছে?—আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি দিন তিনেক আছি। বেশ ত', আসুন না সকালের দিকে, ওসব কাজগুলো মিটমাট ক'রে নেবো।—কি বললেন? —হঠাৎ গলা নামিয়ে ঈশানী পুনরায় বললে, হ্যাঁ, সমস্তই শান্তনুর একাউন্টে জমা দিন্। কাল আমি হিসেবপত্র দেখবো। আচ্ছা, ছেড়ে দিলুম।

ভিক্টরকে নিয়ে শান্তনু এসে দাঁড়ালো। কমলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এবার আমি যাই। অনেক বিরক্ত ক'রে গেলুম, ক্ষমা করবেন। শান্তনুবাবু, ভিক্টরকে নিয়ে আবার কবে যাচ্ছেন আমাদের ওখানে?

শান্তনু হেসে বললে, দৌত্যগিরিতে আমার হাত প্রায় পেকে উঠেছে। উভয়পক্ষের মিলন ঘটানোই আমার কাজ!

ঈশানী বলল, বটে? মাইনে কত?

মাইনেটা অবশ্য আমার একাউন্টে জমা হচ্ছে, তবে এটা আপাতত ভালো-বাসার মজুরি।

কমলা হাসিমুখে বললে, বেশ ত, আরেকটা দৌত্যগিরি করুন। শিলভিয়াকে ভুলিয়ে ভিক্টরকে আমাদের ওখানে কিছুদিন রেখে দিন! কেমন ভিক্টর, আমাদের ওখানে থাকতে তোমার ভালো লাগবে?

ভিক্টর সহাস্যে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

কমলা বললে, আমার বিশেষ অনুরোধ রইলো, দেখবেন চেষ্টা ক'রে। আচ্ছা, এবার আমি যাই। এতক্ষণ আপনাকে কাছে পেলুম, এ আমার গৌরব।

ঈশানী বললে, আমাদের গাড়ী আপনাকে পৌছে দিয়ে আসবে।

না না, আমি এসেছি ওঁর গাড়ীতে,—দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। আমি আজ ওঁকে ট্যাক্সি দিয়ে আপিস পাঠিয়েছি।

নমস্কার জানিয়ে কমলা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

শান্তনুর দিক থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ঈশানী সোজা চ'লে এলো হলঘরে। প্রবল চাপা উত্তেজনা এতক্ষণ পর্যন্ত সহ্য ক'রে এবার সে অবসাদের বোঝা নিয়ে সামনের গদি আঁটা সেট্টির উপর ঝুপ ক'রে ব'সে গা এলিয়ে দিল। গায়ের

জামাটা ঘামে ভিজে গেছে। মাথার উপরে পাখা ঘুরছিল,—এবার সে চোখ বুজলো।

এটা ঝড়ের গুমোট, শান্তনু জানতো। সেইজন্য নন্দকে দিয়ে ভিক্টরকে বাইরে পাঠিয়ে সে গুটি গুটি এসে ঈশানীর কাছাকাছি বসলো। গায়ে গেঞ্জিটাও রাখা যাচ্ছে না, এত গরম।

ঈশানী চোখ খুললো। হঠাৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে ব'লে বসলো, কেন এসেছিস আমার পেছনে পেছনে ?

শান্তনুর মেজাজটাও গত কয়েকদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। সেও ফস ক'রে জবাব দিল, ধর্মের যাঁড় পিছু পিছু কেন আসে, ধর্মকে জিজ্ঞেস করগে।

তুই জালিয়াৎ, ঠগ, প্রতারক !

শান্তনু তৎক্ষণাৎ জুড়িয়ে গেল। বললে, চমৎকার ! আমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে গভর্নমেণ্টকে তুই ফাঁকি দিচ্ছিস, আর আমাকে বলছিস জালিয়াৎ ! পেটের ছেলের কাছ থেকে নিজেকে কেবলই লুকিয়ে রাখছিস,—আর আমি হলুম ঠগ ! একটি নারীর সতীত্ব রক্ষার চেষ্টায় দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি আর আমাকে বলছিস প্রতারক ! তোর মাথার ঠিক নেই।

ঈশানী থামলো না ; বললে, তুই কাপুরুষ। আমাকে লুকিয়ে তুই দত্ত-চৌধুরীদের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে আমাকে ওদের হাতে তুলে দিতে চাস। এর চেয়ে কেন আমাকে বললিনে যে, আমাকে আর ভালো লাগছে না ?

শান্তনু এইপ্রকার সন্দেহে বরাবরই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে সে বললে, এইজন্যেই বলেছিলুম আমার সাহায্যে তোর দরকার নেই। ভালো লাগালুম কবে যে, আজ অরুচি ধরবে ? আমি কাপুরুষ—এ আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু অরুণ কাপুরুষ নয়,—সেদিন কুতবে ব'সে মাধবী-কথামৃত সমস্তটা আমাকে বলেছে।

মানে ?—কতদূর বলেছে ?—ঈশানী ফিরে তাকালো।

শান্তনু বললে, নিজের চরিত্র-মহিমা বজায় রেখে প্রণয়কাহিনী যতদূর অবধি বলা সম্ভব। কিন্তু একথা স্বীকার করেছে, এক বছর বাদে ফুলকাঠিতে সে

গিয়েছিল মাধুকে বিয়ে করতে। তাকে কোনোমতেই আমি কাপুরুষ বলতে পারবো না। সাধারণ ভদ্রপুরুষের আদর্শ রক্ষাই সে করতে চেয়েছিল।

ঈশানী কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, বেশ, বুঝলুম, কিন্তু তোর এই দালালীর মানেটা কি ?

মানে অত্যন্ত সহজ! আমের শাঁসে আর দুধে এক হয়ে সুখাদ্য প্রস্তুত হোক,—আমের আঁটিটা দূর হয়ে যাক।

কিন্তু কমলা যেদিন থেকে মনে করবে আমি ওর সতীন, সেদিন ওর কি চেহারা দাঁড়াবে ?

দাঁড়া—শান্তনু বললে, আগে তোদের বিয়েটা দিয়ে দিই আর্যসমাজে গিয়ে, তারপর সতীনপনার কথা ভাববো। ঠাকুরের ইচ্ছায় ভালোয় ভালোয় এখন কপালে তোর সিঁদুরটা উঠলে বাঁচি।—কিন্তু দেখবি, কী ঘটা করি! দিল্লী শহরসুদ্ধ নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবো, এই ব'লে রাখলুম। হাজার হোক, রাজবাড়ীর মেয়ে ত'।

ঈশানীর মুখের চেহারাটা বিকৃত হয়ে উঠলো। বললে, তুই বুঝি এই খেলাই খেলেছিলি সুষমার সঙ্গে ?

শান্তনু বললে, আরে, কি নির্বোধ তুই! জীবনটাই ত' খেলা! খেলতে গিয়ে সুষমা পেয়ে গেল মোটা টাকার চাকরি! খেলতে গিয়ে আমিও পেয়ে যাচ্ছি মোটা অঙ্কের টাকা।

দুটো চোখ ঈশানীর জ্বালা করছিল। তবু সে আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, আমাকে এই অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়ে পালাতে তোর একটুও গায়ে লাগবে না ?

অপমান!—শান্তনু হেসে উঠলো, স্বামী ব'লে যাকে কল্পনা করেছিলি কুমারী বয়সে, তার সঙ্গে মিলন হবে আজ সগৌরবে, একে বলছিস অপমান ? এমন মতিচ্ছন্ন কেন তোর ?

অসহ্য উত্তেজনা নিয়ে ঈশানী উঠে চ'লে গেল।

১১

কতকগুলো ভারী-ভারী মালপত্র নিয়ে সকালের গাড়ীতে নন্দ কলকাতায় রওনা হয়ে গেল। গতকাল শিলভিয়ার চিঠি এসেছে,—যদি নিরাপদ জায়গা বিবেচনা করো, এবং ভিক্টর যদি থাকতে রাজি হয়, তা'লে ওকে কয়েক-দিনের জন্ম রেখে দিতে পারো। শান্তনু দিল্লীতে কিছুদিন থাকতে চায় শুনে খুশী হলুম। ভিক্টর ওকে কাছাকাছি পেলে বেশ আনন্দে থাকবে। তুমি কবে আসছো? আমার অবস্থা তথৈবচ। এখানে আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে হয়ত ভারতবর্ষ ছেড়েই চ'লে যেতে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে তবে সিদ্ধান্ত করবো।

শিলভিয়ার সম্মতি পেয়ে শান্তনু কমলার ওখানে ফোন করেছিলো! কমলা নিজে এসে কাল সন্ধ্যায় ভিক্টরকে নিয়ে গেছে। দিন কয়েক ভিক্টর ওখানে থাকবে। দত্তচৌধুরী নিজেও খুব খুশী হয়েছেন। ভিক্টরের সঙ্গে তাঁর আলাপ জ'মে গেছে বেশ।

বেশ গরম পড়েছে দিল্লীতে। দুপুরবেলার দিকে আর যেন বেরোনো যাচ্ছে না। মে মাস শেষ হ'তে আর এক সপ্তাহ বাকি।

সকালের দিকে রমেনবাবু এসে উপস্থিত হলেন। একটু আগে ঈশানী হারমোনিয়মটা নিয়ে অনেকদিন পরে একটি গান ধরেছিল, এবং সেই গানের সুর ধ'রেই পাশের ঘরের বারান্দা থেকে বাঁশী বেজে উঠেছিল। শান্তনুর সঙ্গে কয়েকদিন থেকে ঈশানীর বিচ্ছেদ চলছিল, যাকে বলে ঘোরতর মনোমালিন্য। কিন্তু তাই ব'লে গানের সঙ্গে বাঁশীর বিবাদ থাকতে পারে না। ওটা আসছে হৃদয় থেকে, এটা আসছে প্রাণ থেকে—দুইয়ের মিল রয়েছে রসবোধের ক্ষেত্রে। বাইরের বিবাদটা লৌকিক, কতকটা বা ব্যক্তিগত। গান গাইতে গাইতেই

ঈশানীর মুখে হাসি আসছিল, কারণ গানটার তত্ত্ব হোলো মিলনাত্মক। নির্লজ্জ শান্তনু তারই ওপর আবার মীড়ের খেলা খেলছে। পুরুষের সকল কাপট্য এবার ধরা প'ড়ে গেছে, শান্তনুর সকল চাতুরী এবার ঈশানীর নখদর্পণে।

হাসির ঝলক চেপে পুনরায় সে অন্তরাটা ধরবে, এমন সময় রমেনবাবু ঘরে ঢুকলেন। বললেন, এই যে, বেশ ত' গান চলছে, চলুক না কেন? ক'দিন ধ'রে ফোনেই কথাবার্তা চলছে, শরীর গতিক সব ভালো ত'?

বাঁশীটাও হঠাৎ থেমে গেল ওদিকে।

ঈশানী বললে, শরীরের কথা আর বলবেন না। শরীর খারাপ হবার কোনো উপায় যদি থাকে ব'লে দিন,—দুদিন অসুখে প'ড়ে যদি কারো একটু সেবা জোটে, তাহ'লেও নতুনত্ব হয়।

রমেনবাবু বললেন, তা যা বলেছ, ঈশানী—বর্ণে বর্ণে সত্যি। টাকাকড়ি কিছু হাতে যখন আসে, কোনো অসুখ থাকে না। মনের প্রফুল্লতা থাকলে যমেও ভয় পায়। এই যে রোদ্দুরে ঘুরছি, একটু শরীর খারাপ হয় না।

ঈশানী তামাসা ক'রে বললে, আপনার ভাগে কত রইলো, বলুন না একটু?

ওইটি হলো দুঃখের কথা। নিজের জন্য কিছু রাখলে রমেন ঘোষের ভাবনা কি ছিল? দেনা শোধ হবে, এই জন্যই প্রাণে স্ফূর্তি। তোমার টাকা সব দিয়ে দিলুম, শান্তনুর টাকাও শোধ হোলো, আমাদের প্রতিষ্ঠানের ফণ্ডেও কিছু রইলো—ব্যস, এই যথেষ্ট। এবার শোনো আসল কথা। দু'চারখানা পাস পাঠিয়ে জন দুই সরকারী অফিসারকে হাত করেছি, তাই বলতে এলুম।

পাশের ঘরে কাসির আওয়াজ শোনা গেল। রমেনবাবু বললেন, ওই যে, শান্তনুবাবু ওঘরে রয়েছেন দেখছি। আজ ওর জন্যেই বিশেষ ক'রে এলুম, ঈশানী।

ওঘর থেকে গলা উঁচু ক'রে সাড়া এলো, আমাকে ডাকছেন বুঝি? যাই—

একদম নির্লজ্জ। কেউ ডাকেনি, তবু এলো। একেবারে গায়ে পড়ে এলো। এসেই ব'সে গেল প্রায় কাছাকাছি। শান্তনু বললে, তারপর? আপনাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন চলছে রমেনবাবু?

রমেনবাবু তার মুখের দিকে একবার তাকালেন, তারপর বললেন, এবারে কিন্তু আর ফক্কিকারি চলবে না ভায়া। একেবারে সরকারী চাকরি, দশটা পাঁচটা। এবার আপনার চাকরি হ'বে। সুখবরটি নিয়েই আমি এসেছি।

শান্তনু বললে, বলেন কি। এ ত' আমার সৌভাগ্য!—আপনি যে তলে তলে আমার চাকরির চেষ্টা করছিলেন, তা কে জানতো?—যাক্ এতদিনে একজন বেকারের হিল্লে হোলো। তাহ'লে দিল্লীতেই বাকি জীবনটা,—কি বলেন, রমেনবাবু? অ্যাঁ?

নিশ্চয়ই! কলকাতা একেবারেই ছাড়তে হবে। এখানে একদম সাহেবি টাইম্, একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই;

ঈশানীর মুখখানা বড়ই বিবর্ণ হয়ে এসেছে খবরটা শুনে। তার দিকে একবার কটাক্ষে তাকিয়ে শান্তনু সোৎসাহে বললে, একখানা বাগানবাড়ী ভাড়া করবো নিরিবিলি অঞ্চলে গিয়ে। ঠাকুর-চাকর থাকবে। মোটর আর টেলিফোন। চমৎকার একা একা থাকা যাবে! মাইনেটা বেশ মোটা ত'?

রমেনবাবু বললেন, ভায়া, আমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি যখন ভেতরে-ভেতরে তদ্বির করছি, তখন ভাবনা কি? ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে হবে।

ঈশানী আর থাকতে পারলো না। এবার বললে, এমন কি গুণ আছে ওর যে, অত টাকা মাইনে পাবে?

আরে বাপ রে, গুণ নেই মানে? গুণের আধার! বি-এ পাস, লখিন্দরের মতন চেহারা, বলিয়ে-কইয়ে, তা'র ওপর বাঁশী বাজিয়ে বংশীবদনকেও হার মানায়, ওর আবার গুণের অভাব?

নিজের সুখ্যাতি কাছে ব'সে শুনলে শান্তনু চিরদিনই সবিনয়ে মাথা নীচু করে। ঈশানী তার দিকে কটু-কটাক্ষে একবার তাকিয়ে বললে, আপনাদের গভর্নমেণ্টের হয়েছে কি বলুন ত'? নাচলে চাকরি, গাইলে চাকরি, নাটুকেদের ডেকে এনে চাকরি, বাঁশী বাজালে চাকরি,—গভর্নমেণ্টের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই? কেমন গভর্নমেণ্ট আপনাদের?

ওই দেখুন রমেনবাবু,—ব'লে উঠলো শান্তনু, ভালো কাজের দিকে মন দিলে এক শ্রেণীর লোকের এমনি ক'রেই বিদ্বেষ জ'মে ওঠে! দেশের সত্যিকার কাজ এদের জ্বালায় কিছু হবার জো নেই।

রমেনবাবু খুব এক চোট হাসলেন। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুখানা খাম বা'র ক'রে বললেন, এই নাও, তোমার প্লেন-এর টিকিট, আজ রাত আন্দাজ সাড়ে দশটা-এগারোটায় ছাড়বে। নাইট-প্লেন কিনা, তাই নাগপুর হ'য়ে যাবে। তবে একটা মুস্কিল, আমার আজ কিছুতেই যাওয়া চলবে না—'রীগলে'র ওখানে টাকাকড়ির হিসেবটা এখনও মেটেনি। তোমাকে একলাই যেতে হবে ভিক্টরকে সঙ্গে দিয়ে।

ঈশানী বললে, ভিক্টর ত' এখন যাবে না? সে আমাদের এক বন্ধুর ওখানে থাকবে কয়েকদিন। ইস্কুলের এখন ছুটি।

রমেনবাবু বললেন, তুমি আবার ওই এক গণ্ডগোলে প'ড়ে আছ। কা'র না কা'র ছেলে, মা-বাপের ঠিক নেই, কনভেণ্টে মানুষ—তুমি ঘাড়ে ক'রে নিজের অশান্তি বাধিয়েছ।

রমেনবাবুর কণ্ঠের বিকার লক্ষ্য ক'রে আড়ষ্ট ঈশানী একেবারে চুপ। শান্তনু মুখখানা গম্ভীর ক'রে বললে, উনি ত' আনতে চাননি, আমিই ওকে এনেছি। আমারই দায়িত্ব, রমেনবাবু।

আপনাকেও বলিহারি!—রমেনবাবু বললেন, বেশ ত', বাঁশী বাজাবেন, খাবেন-দাবেন, ফষ্টিনষ্টি ক'রে নেচে-কুঁদে বেড়াবেন। তা নয় মাথায় ক'রে তুলে আনলেন নোংরা থেকে কোন্ কুজাতের একটা ছেলেকে। ট্যাঁস ফিরিঙ্গিদের ঘরে অমন অনেক ছেলে ভেসে আসে বানের জলে,—ওদের কি জাতজন্মের ঠিক আছে? তার চেয়ে নিজের ভবিষ্যতের দিকে মন দিন্ দেখি? ভাইদের সঙ্গে মামলা বাধিয়েছেন, তার কি হোলো? এখনও হাইকোর্টে কেস চলছে নাকি? নিজের চাকরি, সংস্থান, ভালোমন্দ, মামলা—এই সব নিয়ে থাকুন, তাতে কাজ হবে! আমিই ব'লে রাখছি, চাকরিতে একবার জয়েন্ করুন, আমি নিজে সুন্দরী মেয়ে বেছে আপনার বে'থা দিয়ে দেবো। উচ্চবর্ণ

ব্রাহ্মণ সন্তান আপনি,—ও সব বেজাতের বাচ্চা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না! ওঁনাকে একটা বদনাম হয়ে যাবে!

মাথা হেঁট ক'রে উভয়ে রমেনবাবুর বক্তৃতা শুনলো। ত্রেতাযুগ হ'লে এতক্ষণে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যেতো, ঈশানী নেমে যেতো ধরিত্রীর গহ্বরের নীচে। কিন্তু তার জন্য শান্তনুকে ধিক্কার শুনতে হোলো এবং বিনা প্রতিবাদে শান্তনু সমস্তটা নিঃশব্দে সহ্য ক'রে রইলো,—এর আঘাত এবং অপমানের জন্য ঈশানী সম্পূর্ণ দায়ী, এতে ভুল নেই। সহসা তার মনে হোলো, সে যদি এই মুহূর্তে সমস্ত বিতর্ক ভুলে শান্তনুর পায়ের ওপর প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদে, তাহ'লেও তার প্রায়শ্চিত্তটা সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু সে যেন পাথরের মতো স্থাণু হয়ে গেছে; কোনো কিছুই করতে না পেরে শুধু কাঠ হয়ে ব'সে রইলো।

কিন্তু এতদিনের চাপা আক্রোশটা প্রকাশ করার জন্য রমেনবাবু যেন আজ সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ওদের সহশক্তির থেকে আস্কারা পেয়ে তিনি হঠাৎ মনের জ্বালাটাই প্রকাশ করলেন, কিছু মনে করবেন না শান্তনুবাবু, মিহিজামের সেই প্রথম আলাপ থেকেই আপনাকে দেখে আসছি। আপনি ফটো তুলতে জানেন, বাঁশী বাজাতে পারেন, ঈশানীর সঙ্গে নাকি আপনার কি যেন আত্মীয়তাও আছে, সব মানলুম। কিন্তু আপনার এই মাখামাখির জন্য অত বড় একটা প্রতিষ্ঠান আজ বিপন্ন হ'তে বসেছে, এ কি আপনি ভেবে দেখেছেন? আমার অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই, ঈশানীর সামনেই আপনাকে বলছি। আপনি গরীব গেরস্থ ঘরের ছেলে, আপনাকে এনে খেতে হবে, বে'থা ক'রে সংসারী হ'তে হবে—বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরলে ত' চলবে না। এত বড় একজন আর্টিষ্টের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু আপনার মাত্রাবোধের অভাবে ঈশানীর সমস্ত কর্মজীবন আপনার হাতে নষ্ট হ'তে বসেছে। যেমন ক'রেই হোক, আপনার একটা চাকরি আমি ক'রে দিচ্ছি, এবার আপনি এই মেয়েটিকে রেহাই দিন,—নৈলে বাঙ্গলার নৃত্যশিল্পের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঈশানী সেটা মুখ ফুটে আপনাকে বলতে পাচ্ছে না, আমিই দুর্মুখের মতো সেটা বলতে বাধ্য হলুম,—আমাকে ক্ষমা করবেন।—হ্যাঁ, আরেক কথা। যে কারণেই হোক, ঈশানী আপনার

একাউন্টে অনেক টাকা জমা রাখতে বাধা হোলো! এতে আপনার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল, কেন না এটা হোলো বিশ্বাসের কথা, সাধুতার কথা। আমি অবশ্য একথা বলতে চাইনে যে, আপনার পরামর্শেই ঈশানী এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে! কিন্তু দেখবেন, সাবধান,—ধর্মের কল্ বাতাসেও নড়ে, এটি মনে রাখবেন। দ্বিতীয় কথা, আপনি রইলেন দিল্লীতে, ঈশানী তার নিজের কাজ নিয়ে রইলো কলকাতায়। কিন্তু এত বড় একজন শিল্পসাধকের মন পাঁচ রকম আজে-বাজে কথায় কিম্বা চিঠিপত্র আনাগোনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে, এ নিশ্চয় আপনি চান না? সেই জন্য আমার একান্ত আবেদন যে, আপনি ঈশানীর ভাবনা-চিন্তে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজ নিয়ে আপন মনে থাকবেন। সত্যি বলতে কি, মিহিজাম থেকেই ত' যত অশান্তির উৎপত্তি! তার আগে কেই বা কোথায় ছিল! আত্মীয়তাই হোক আর বন্ধুতাই হোক, ব্যাপারটা দু'দিনের জোড়াতাড়া বৈ ত' নয়।

রমেনবাবু এবার দু'জনের প্রতি নিরীক্ষণ ক'রে এক সময়ে থামলেন। তাঁর আন্তরিকতার তারিফ না ক'রে উপায় নেই। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, বাচনভঙ্গী সুদক্ষ, চিন্তা প্রকাশের ধারাটিও নিখুঁত, এবং সত্যি বলতে কি, বাঙ্গলার নৃত্য-শিল্পের এমন ভবিষ্যৎ কল্যাণকামীও বড় একটা চোখে পড়ে না।

এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তা হ'লে এই কথাই রইলো। তোমার জিনিসপত্রের মধ্যে ত' একটা কি দুটো স্যুটকেস, কেমন? যদি বলো তা'হলে না হয় আমিই এসে তোমাকে রাত্রে বিমান-ঘাঁটিতে নিয়ে যাবো? হেপাজত ক'রে তুলে দিতে হবে ত'?

ঈশানী বললে, না, আমি একাই যাবো।

বেশ, তাই যেয়ো। আমি ঠিক এন্‌ক্লোজারের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবো। তোমাকে নিরাপদে তুলে দিতে পারলে তবেই আমার ছুটি। চললুম শান্তনুবাবু।

হাসিমুখে শান্তনু উঠে দাঁড়ালো। বললে, সকালবেলাটা আপনাকে পেয়ে বড় আনন্দে কাটলো। আপনি যে সব কথা বললেন, ঈশানী তার প্রতিবাদ করেনি, কেন না প্রত্যেকটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য! বাস্তবিকই জীবনে এই

প্রথম একজন প্রবীণ লোকের উপদেশ পেয়ে সত্যিকার জ্ঞানলাভ করলুম। আচ্ছা, নমস্কার।

কথাটার মধ্যে পরিহাসের সুর বাজলো কিনা, থমকে দাঁড়িয়ে রমেনবাবু একবার ভেবে নিলেন। কিন্তু শান্তনু তখন ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে। ঈশানী ব'সে রয়েছে চুপ ক'রে।

চললুম তা'হলে, রাত্রে দেখা হবে। বলতে বলতে রমেনবাবু বেশ খানিকটা বিজয়গর্ব নিয়েই নীচে নেমে গেলেন। একটিবারও বিচার করলেন না, কী বিপুল পরিমাণ গরলে ঈশানীর আকণ্ঠ ভ'রে উঠলো।

শান্তনুকেও চ'লে যেতে হবে, কেন না এ বাড়ীর মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। পাহারাদার যারা বাইরের দিকে মোতায়েন ছিল এতদিন, ঈশানীর যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আজ তারা ছুটি নেবে। হিন্দুস্থানী পাচক সন্ধ্যার রান্না ক'রে দিয়ে চ'লে যাবে। হলঘরটা শূন্য—যেখানে ঈশানী নীলাভ আলোয় শ্রীরাধার বিরহ-নৃত্য করেছিল! সমস্ত ছবি, আয়না, কার্পেট এবং অন্যান্য আসবাবপত্র সমস্তই নিয়ে গেছে। শান্তনুর নিজের কিছু নেই, কতকগুলো কাপড়-চোপড় সমেত একটা সুটকেস, ঈশানীরও তাই। নন্দর সঙ্গে অন্যান্য জিনিসপত্র সবই চ'লে গেছে।

একটি ঘরে ঈশানীর অনেকগুলো মূল্যবান কাপড়-চোপড় এখানে ওখানে ছড়ানো। তেলের শিশি খোলা, কয়েকখানা সুগন্ধী সাবান অযত্ন বিক্ষিপ্ত, তার সঙ্গে ছেঁড়াচুল জড়ানো চিরুণী, পাউডারের কৌটো ওল্টানো, মাথার ফিতেগুলো জট পাকানো। শান্তনু গরীব গেরস্থের ছেলে, ওগুলোর বাজার মূল্য বোঝে! ভাবের বিকার যদি কোথাও ঘটে ত' ঘটুক, কিন্তু তার জন্য নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর অপচয় করা চলবে না। সুতরাং শান্তনু একটির পর একটি সামগ্রী তুলে গুছিয়ে রাখলো। সাজসজ্জা না ক'রে রাস্তায় বেরোনো মেয়েদের পক্ষে চলে না, ওটা তাদের প্রাণের দায়। কাপড়-চোপড়গুলি সে একটির পর একটি পাট ক'রে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলো, এবং সবচেয়ে সৌখীন একটি শাড়ী ও জামা এবং ইত্যাদি সে ঠিক সামনে রেখে দিল। জানে, এগুলি ঈশানীর পছন্দ। এ ছাড়া ছোটখাটো কয়েকটি জিনিসও ছিল বৈকি। নাচের জন্য এক জোড়া ঘুঙুর, কিছু

অলঙ্কার, কতকগুলি জরি-মখমল-ব্রোকেডের জামা, এগুলো ঈশানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গ, অতি মূল্যবান।

বড় ঘরখানার এক কোণে ঈশানী কখন যে নিঃশব্দে এসে বসেছে, শান্তনু লক্ষ্য করেনি। এদিক ওদিক ফিরে শান্তনু যেন কিসের সন্ধান করছিল।

হঠাৎ সাড়া দিয়ে ঈশানী বললে, কি হচ্ছে এ সব?

শান্তনু মুখ ফিরিয়ে বললে, তোর জরিমোড়া স্যাণ্ডাল্ জোড়াটা কোথায় পাচ্ছিনে।

যারা না ব'লে পরের জিনিস নাড়াচাড়া করে, তাদের সুটকেসে যদি গিয়ে থাকে?

কথাটা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত! শান্তনু তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের সুটকেসটা খুলে উপুড় করলো। ঠক্ ক'রে ভিতর থেকে ক্যামেরাটা প'ড়ে গেল কাপড়-চোপড় সুদ্ধ, কিন্তু স্যাণ্ডেল জোড়া পাওয়া গেল না। ঈশানী বললে, ক্যামেরাটা ত' আমার কেনা!

আড়ষ্ট হাতে শান্তনু ক্যামেরাটা নিয়ে ঈশানীর টেবলের ওপর রেখে দিল। তারপর সুটকেসটা গুছিয়ে রেখে স্নান করতে চ'লে গেল। ঈশানীর আগেই তা'কে চলে যেতে হবে।

ঈশানী উঠে গেল ঘর ছেড়ে। সমস্ত বাড়ীটাকে অত্যন্ত শূন্য মনে হচ্ছে, যেমন শূন্য সে নিজে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না সে। যে গরল তার কণ্ঠকে ভ'রে তুলেছে, সেই গরল কেমন ক'রে সে উদ্গীর্ণ করবে, তারই জন্য সে বিষাক্ত কালনাগিনীর মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ফোঁস ফোঁস করে। উদ্যত ফণার দ্বারা আঘাত করা চাই, এবং এই উদ্যত ফণার উপরে আঘাত পাওয়াও তার দরকার।

• পরিপাটি স্নান ক'রে এসে শান্তনু এক সময় তার সুটকেসটি নিয়ে তার নিজের ঘরে গেল। সামনের একটা টেবিলে নানাবিধ কাগজপত্র এবং চুক্তি বিনিময়ের দলিলাদি ছড়ানো। প্রায় অধিকাংশই ঈশানীর। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের কতকগুলো মুদ্রিত ফর্ম এবং পাসবই ও চেকবই। তার নিজের টাকাকড়ি বলতে কিছু নেই,

কিন্তু একটি নারীর খেয়াল-খুশির জন্য এক রাত্রের মধ্যেই তাকে ধনবান হ'তে হয়েছে। সমস্ত জীবন ধ'রে পরিশ্রম করলেও এই পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা তার পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ।

টেবলে ব'সে শান্তনু কতকগুলি ছাপা ফর্মে বহু জায়গার ফাঁকে একটির পর একটি কথা বসিয়ে অবশেষে নীচের দিকে যথাস্থানে সই ক'রে দিল। তারপরে ব্যাঙ্কের নাম বসিয়ে দিল্লী ও কলকাতার আপিসে দুখানা বিশেষ দরকারী চিঠি লিখলো। এ সব টাকার গুরুভার এবং দায়িত্ব অনেক। কোনো ভার তার ওপর থাকা চলবে না, সে ভারবাহী নয়। তার মনের বাঁশীটা শূন্য, শূন্য ব'লেই বাজে। 'রঙ্গলে' সে বাঁশী বাজিয়েছিল নিজের আনন্দে ঈশানীর নাচের সঙ্গে, টাকার জন্য সে বাঁশী বাজায়নি! সুতরাং ওই অতগুলো টাকার ওপরেও তার অধিকার নেই। ওটাকে হস্তান্তরিত করার জন্যও সে চিঠি লিখে সই ক'রে দিল!

জামা-কাপড় প'রে সমস্ত গুছিয়ে শান্তনু যাবার জন্য প্রস্তুত হোলো। মোটর ছাড়া সে একদিনও দিল্লীর রাস্তায় বেরোয়নি। কিন্তু আজ স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে ফটক পেরিয়ে দুপুরের এই ভয়ানক রোদে সে যখন পা বাড়াবে, তখন গেট-এর চাপরাশি তাকে কিছু প্রশ্ন করবে বৈকি! মনে মনে দু'একটা জবাব সে খাড়া ক'রে রাখলো। বাঁশী সে আর বাজাবে না, কিন্তু আরেকটা ভালো ক্যামেরা যতদিনেই হোক, তাকে সংগ্রহ করতে হবে। যদি কলকাতার দিকে যায় তবে দিল্লীর কতকগুলো ভালো ছবি এবং ঈশানীর নাচের কয়েকটি মোহমদির ছবি সে বেচতে পারবে। অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা প্রৌঢ় বয়সে বাঙ্গলার চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগী হয়, তাদের কাছে এই ফটোগুলি গোপনে নিয়ে যেতে পারলে মোটা টাকা সে পেয়ে যাবে!

দরজার বাইরে পা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে শান্তনু একটি সুবিধাজনক মুহূর্ত খুঁজছিল, ঈশানী যেন সামনে দাঁড়িয়ে না থাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে হিন্দুস্থানী পাচক পিছন থেকে বললে, সাব, খানা দেগা?

নহি—শান্তনু বললে, বহুৎ খেয়ে আমার পেটের মধ্যে হজমের গড়বড়

হয়েছে, আর ভুথ, নোহ হায়। এবার হামকো ছেড়ে দেও ভাই, হাম পথে-পথে কেঁদে বাঁচেকা!

সুটকেসটা এক হাতে নিয়ে এবং অন্য হাতে কাগজপত্রের তাড়াটা চেপে ধ'রে হন হন ক'রে শান্তনু বেরিয়ে গেল। পাচক চ'লে গেল রান্নাবাড়ীর দিকে।

হলঘরটার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে যেতে হয়, সেখানে সামনাসামনি কাঠের ম্যাণ্টল্পীসে হাতের ভর দিয়ে ঈশানী দাঁড়িয়েছিল। শান্তনু সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, আমার জন্যে অনেক বাজে খরচ হয়ে গেছে এতদিন, সে জন্য যাবার সময় আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি!

সম্ভাষণ কিছু নেই, অত্যন্ত সাদামাটা শুষ্ক সৌজন্য! ঈশানী বললে, ক্ষমা চাইলেই কি খরচ ওঠে?

শান্ত নম্র হাস্যে শান্তনুর সুশ্রী মুখখানা একটু রক্তাভ হয়ে উঠলো। বললে, তা অবিশ্যি ওঠে না, কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা করা যেতে পারে! হ্যাঁ, এ কাগজপত্রগুলো ভালো ক'রে বুঝে নেওয়া দরকার। সত্যি সত্যি এত টাকা আমার জিম্মায় রাখা সঙ্গত নয়। মানুষের মন না মতিভ্রম। রমেনবাবু একটি অযথা কথাও বলেননি। লেখাপড়া সমস্তই আমি ক'রে দিয়ে গেলুম। তবু এগুলো অন্য একজনকে দিয়ে বুঝে প'ড়ে নেওয়া দরকার বৈ কি। তবে ভরসা রইলো এই, মিঃ দত্তচৌধুরী যেদিন সব স্বীকার করে তাঁর স্ত্রীকে গ্রহণ করবেন, সেদিন এ সব কাগজপত্র তিনিই যেন বুঝে নেন। আর আমার কিছু বলবার নেই।

ম্যাণ্টল্পীসের ওপর সমস্ত কাগজপত্র একে একে সযত্নে গুছিয়ে রেখে একবার শান্তনু দুপা এগিয়ে গেল, তারপর আবার ফিরে এসে বললে, হ্যাঁ, আর একটা ছোট কথা। আমি সম্পূর্ণ শূন্যহাতেই চ'লে যেতে চাই। আমার মজুরি ওই কয়েক শো টাকা ভিক্টরের জন্য দিয়ে গেলুম। দ্বিতীয় কথা, আমি যেখানেই যাই না কেন, সব কথা জানিয়ে রমেনবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দেব।

ঈশানী ফুলে উঠে বললে, চিঠি কেন? যে লোকটা অত টাকা মাইনের চাকরি জুটিয়ে দিয়ে ঘরকন্না পেতে দিচ্ছে, মনের মতন বৌ ঘরে এনে দিচ্ছে,—তার সামনে গিয়ে একবার কৃতজ্ঞতা জানানো যেতো না?

শান্তনু এবার মুখ তুলে তাকালো। বললে, চাকরিই বা কি, বউই বা কোথায়? সবই ত' মিথ্যে! আমাকে কাছ থেকে সরাবার জন্তে রমেনবাবু দু'-একটা ধাপ্পা যদি দিয়ে থাকেন, তিনি ত' কিছু অন্যায় করেননি?

ধাপ্পা!—ঈশানী সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

হোক না ধাপ্পা, হোক না আগাগোড়া মিথ্যে। আমি ত' স'রেই যাচ্ছি,—কিন্তু যার নাচগানের ওপর অত বড় প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে না পেলে রমেনবাবুর চলবে কেন? স্বার্থের ওপর আঘাত কেউ বরদাস্ত করে?—বলতে বলতে শান্তনু সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হোলো।

ঈশানী ছুটে এলো শান্তনুর পিছনে পিছনে। বললে, রমেন ঘোষ এমনি ক'রে প্রতারণার খেলা খেলছে, আগে আমাকে জানতে দিলিনে কেন?

শান্তনু বললে, আমি বাইরের লোক, তোদের ঘরোয়া ঝগড়ায় আমি সাহায্য করতে যাই কেন? আমি কোনো স্বার্থ নিয়ে তোর কাছে আসিনি,—তুই সাহায্য চেয়েছিলি তাই ছিলুম এতদিন। ইচ্ছে ছিল, দত্তচৌধুরী তোকে একদিন হাসিমুখে গ্রহণ করবেন, সেই দৃশ্য দেখে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে চ'লে যাবো। কিন্তু……

ঈশানী এবার হঠাৎ চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, ছি ছি ছি, এবার এখানে আমার মৃত্যু হোক। বার বার সে-লোকটার নাম ক'রে আমাকে অপমান করতে তোর বাধছে না? তুই চ'লে যাবি, কিন্তু যাবার সময় আমাকে লাথি মেরে ডুবিয়ে দিয়ে যাবি?

শান্তনু আবার তাকালো সবিস্ময়ে। আগ্নেয়গিরির চূড়ায় চূড়ায় গলিত অগ্নিস্রাব যেন ভলকে ভলকে উদ্গীর্ণ হচ্ছিল,—বিপুল অগ্নিকাণ্ডে সমগ্র দিল্লী বুঝি এখনই ভস্মীভূত হয়। ঈশানী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাউ দাউ ক'রে জলছিল।

চীৎকার করলো ঈশানী,—যার ওপর আমার সমস্ত জীবনের ঘেন্না পর্বতপ্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেই নোংরা হাতে আমাকে তুলে দিয়ে পালাতে চাস,—এত বড় কাপুরুষ তুই! একটা পাষণ্ড জালিয়াতের কাছে আমাকে হাত-পা বেঁধে তুই ছেড়ে দিয়ে যেতে চাস,—এত বড় বিশ্বাসঘাতক তুই? একটা

কিশোরী কুমারী মেয়ের অজ্ঞাত আচরণকে কোনোমতেই ক্ষমার চোখে দেখতে পারলিনে, এ যুগে জন্মেও এত বড় বর্বর হয়ে রইলি? ধিক্, তোকে ধিক্, তোদের সবাইকে ধিক্। আমি আজ সব তচ্‌নচ ক'রে দেবো।

ঈশানী ছুটতে ছুটতে এলো হলঘরে। ম্যান্টল্‌পীসের ওপর থেকে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে সে দাঁতে দাঁত ঘষে একে একে সবগুলি কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। সেই ছেঁড়ার ফড়ফড় শব্দ শুনে দৌড়ে ভিতরে এসে শান্তনু তাকে বাধা দিতে গেল, কিন্তু উন্মাদিনী নর্তকী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সহসা শান্তনুকেই আক্রমণ করে বসলো। গলার কাছে পাঞ্জাবীটা ধ'রে দুহাতে তার জামা ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল, এবং যে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা আপন নাম বদলিয়ে একদা ঈশানী রেখেছিল, সেই ঈশানী আপন কালকটাক্ষের নিমীলিত দৃষ্টিসহ ধারালো নখের আঁচড়ে শান্তনুকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো।

শান্তনু হাসছিল নির্লজ্জের মতো। পাঞ্জাবীর ভিতরের জামাটায় দেখতে দেখতে লাল রং ফুটে উঠলো। চিত্রাঙ্গদার সেই 'ম্যানিকিয়োর' করা রক্তিম ধারালো নখর তার জন্য সুরক্ষিত ছিল, একথা সে আগে ভাবেনি। পাঞ্জাবীটা ছিঁড়লো,—কম-সে-কম পনেরো টাকা দাম।

যাবার দিনে এ কি কাণ্ড করলি বল ত'?

চীৎকার ক'রে উঠলো ঈশানী পুনরায়, কোন্ জানোয়ার একথা বলে, গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দেবার জন্যে তোকে টাকা দিয়েছি? কোন্ মিথ্যেবাদী একথা রটায়, তোর জন্যে আমার সব নষ্ট হচ্ছে? একথা কেন তুই ধ'রে রেখেছিস যে, আমি দত্তচৌধুরীকে ধরবার জন্যে তোর সাহায্য চেয়েছি? আমি ভিক্টরের বাপের হাতে ভিক্টরকে তুলে দিয়ে ছুটি নিতে চাই, একথা তোর চেয়ে বেশী আর কেউ জানে? আমাকে সন্দেহ ক'রে কেন আমাকে পাঁকের তলায় ডুবিয়ে দিচ্ছিস? এত বড় অবিচার, এত বড় অত্যাচার আমার ওপর কেন? কেন?

হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠছিল ঈশানী, কিন্তু দু'হাত দিয়ে নিজের মুখখানা সে চেপে ধরলো।

শান্তনু বললে, ভিক্টরকে অমন ক'রে রমেন ঘোষ কলঙ্কিত করলো। তুই চুপ ক'রে রইলি কেন?

তুই দায়ী সেজন্যে! তুই আমার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছিস।—কম্পিত অধীর কণ্ঠে ঈশানী অভিযোগ জানালো, তোর নির্বুদ্ধিতার জন্যে সব নষ্ট হ'তে বসেছে। তুই ভিক্টরকে সঙ্গে টেনে আনলি, তাই শিলভিয়ার চোখের জল কর্তাদের কাছে ধরা প'ড়ে গেল; তোর কাঁচাবুদ্ধির জন্যে ভিক্টর তার জন্মকলঙ্কের বোঝা নিয়ে পথে বসতে যাচ্ছে; তোর ছেলেমানুষীর জন্যে একদিন ওই নিরপরাধ কমলারও সংসার ছারখার হবে—এও আমি বলে রাখলুম,—আর আজ, আমি তোকে বিশ্বাস ক'রে তোর পায়ের কাছে আমার মান সম্ভ্রম লজ্জা ভালো মন্দ সমস্ত অঞ্জলি দিলুম ব'লে তুই লাথি মেরে চ'লে যাচ্ছিস। তুই কি চাস? কি পেলে তোর মন খুশী হয় বলতে পারিস?

শান্তনু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।—

কান্নাজড়িত কণ্ঠে ঈশানী বললে, আর একটি মেয়েও তোর জন্য মরীচিকা পথ ধরেছিল তোর মোহে, তারও জীবন ছারখার হয়ে যেতো তোর পেছনে পেছনে ঘুরে। কিন্তু আমার মতন অভাগী সে নয়, তাই সময় থাকতে সে বেঁচে গেল! তোর লোভ নেই, আসক্তি নেই, মোহ দয়া মায়া স্নেহ কিছু নেই—তাই বুঝি চোখের সামনে সবাই জ্বলেপুড়ে মরলে তুই আনন্দ পাস? তুই এত স্বার্থপর নিজের দিকে ছাড়া আর কোনো দিকে তোর চোখ পড়ে না?

ঈশানী ছুটে চ'লে গেল তার শোবার ঘরে।

ডাইনিং রুমে খাবারগুলি ঢাকা দিয়ে রেখে পাচক চ'লে গেছে অনেকক্ষণ আগে। সুতরাং বাইরে চাপরাশি, দারোয়ান আর ড্রাইভার ছাড়া ভিতর-বাড়ীতে আর কোনো জনপ্রাণী ছিল না। ছিল না ব'লেই আজ মানরক্ষা হোলো। শান্তনু চুপ ক'রে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপর গায়ের জামা খুলে হাতে নিয়ে সে বাথরুমের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। দুপুর আড়াইটে বেজে গেছে, প্রখর রৌদ্রের উত্তপ্ত হাওয়া এবং ধুলো ঢুকে সমস্ত বাড়ীটাকে যেন মরুভূমিতে পরিণত করেছে।

ছেঁড়া জামা জুতো বর্জন ক'রে শান্তনু আর একবার স্নান করে নিল। নখের আঁচড় সারা গায়ে তখনও দগ দগ করছে! জল লেগে জ্বালা ধরেছে। সে একবার থমকে দাঁড়ালো, তারপর ঘরে এসে আবার নতুন সজ্জা চড়ালো। মাথাটা যেমন তেমন ক'রে ফিরিয়ে হলঘরে এসে সেই ছেঁড়া কাগজপত্রের টুকরোগুলি একটি একটি ক'রে কুড়িয়ে জমা করলো। এগুলি এভাবে থাকা চলবে না—একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলা দরকার।

ফিরে এসে দেখলো, ঈশানী নিজের বিছানার উপর চুপ ক'রে প'ড়ে আছে। হঠাৎ যাবার দিনে শান্তনুর মনে কেমন একটা বেদনাবোধ জেগে উঠলো, সত্যি কি তার অজ্ঞাতে কোথাও কোনো একটা অবিচার ঘ'টে যাচ্ছে? সুষমা, শিলভিয়া, ভিক্টর, কমলা, এবং এই নারী—যার সম্বন্ধে তার একান্ত কল্যাণ-কামনা ছাড়া আর কিছু নেই,—কই, সজ্ঞানে এদের সম্বন্ধে কোনো অমঙ্গলের কথা ত' তার অদ্যাবধি মনে আসেনি? কোথায় ভুল? কোথায় অবিচার? জেঠাইমা, দাদা, বৌদিদি, রমেনবাবু—একজনের পর একজন কেন তার প্রতি এমন বিরূপ হোলো? কারো ক্ষতি সে করেনি, কোনো ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা তার নেই,—তবু তার ঝুলিতে কেন ভ'রে উঠলো সংসারের যত কিছু লাঞ্ছনা, অপমান, উপেক্ষা এবং ঘৃণা? কেন তার অন্ন জুটলো না লোকসমাজে? কেন তার ঠাঁই হোলো না কোনো একটি হৃদয়ের ছায়ায়? তবে কি তার জীবনের এমন কোনো পরিণতি আছে,—যেটাকে বলা চলে সাধারণের বাইরে? তার ভাগ্যবিধাতা এমন কি কিছু সাজিয়ে রেখেছে কোথাও, যেটাকে পাবার জন্য এত ক্ষয় আর ক্ষতি তাকে স্বীকার ক'রে যেতে হচ্ছে? এমন কোনো ভালোবাসা আছে কোথাও, যেটা তাকে আঘাত ক'রে দগ্ধ ক'রে সর্বস্বান্ত ক'রে তা'কে নির্মল করবে? এমন দুঃখ, এমন বেদনা কোথাও আছে—যা তার স্বভাবের সমস্ত চটুলতা আর জটিলতাকে ঘুচিয়ে তার সমগ্র জীবনকে অশ্রুধৌত শুচিতায় পরিণত করবে? আছে কি কোনো পরমার্থ? কোথাও কোনো অজানা পরম মাধুর্যের আস্বাদ?

শান্তনু একসময়ে এগিয়ে গিয়ে ঈশানীর মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকলো, ঈশানী, আমি ক্ষমা চাইছি। ওঠ তুই।

ঈশানী সাড়া দিল না। কয়েক পা পিছিয়ে এসে শান্তনু একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে রইলো। ঘড়িতে চারটে বাজলো।

কিছুক্ষণ পরে ঈশানী নিজেই এবার উঠে বসলো। চোখ দুটো দেখে বুঝতে পারা যায়, ইতিমধ্যে অনেক রক্ত ঝরেছে ওই চোখ দিয়ে, কিন্তু উত্তপ্ত রৌদ্রের হাওয়ায় মুখখানা হয়ে উঠেছে রক্তাভ। চুলের ঝলক এসে পড়েছে মুখের উপর, সেগুলি সরিয়ে ঈশানী গায়ের উপর আঁচলটা টেনে জড়িয়ে নিল। মাথা হেঁট করে বসেছিল শান্তনু।

একটা ঝড় বয়ে গেছে কতক্ষণ আগে,—অবসাদ ও ক্লান্তি ঘিরে ধরেছে ঈশানীকে। শান্তকণ্ঠে সে প্রশ্ন করলো, প্লেন কটায় ছাড়বে ব'লে গেছে?

রাত সাড়ে দশটায়।

ঈশানী কোনো কথা খুঁজে পেলো না। শুধু নির্বিকার কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, দিল্লীতেই এখন থাকবি না অন্য কোথাও যাবি?

শান্তনু নতমস্তকেই ছোট্ট জবাব দিল, ঠিক নেই।

কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে করে না?

কি হবে ফিরে?

বিছানা থেকে নেমে এসে ঈশানী একবার ঘরময় ঘুরে বেড়ালো। এটা ওটা নাড়াচাড়া করলো। একবার বাইরে গিয়ে ঘুরে এলো এখানে ওখানে। তারপর শান্তনুর পিছনে গিয়ে তার গলার কাছে হাত রেখে বলল, কেন বল ত' তোকে ছাড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে সব ফুরিয়ে গেল? আমাকে না হয় ছেড়েই যাচ্ছিস, কিন্তু তুই একলা থাকতে পারবি? তোকে দেখবে কে?

শান্তনু চুপ ক'রে রইলো।

ঈশানী পুনরায় বললে, আজ মনে পড়ছে একটি দিনের জন্যেও তোকে যত্ন ক'রে খাওয়াইনি! হাসিতামাসায় তোকে নিয়ে কাটিয়েছি, ঠাকুর-চাকর দিয়ে তোর জন্যে রাঁধিয়েছি, নিজের গৌরবের মিথ্যে চেহারাটা তোকে দেখিয়েছি, ফাঁকা কথার ফাঁকিতে হয়ত মন ভোলাবারও চেষ্টা পেয়েছি,—কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে আমার সব মিথ্যে। সমস্তই ফাঁপা। তোর কাছে কেবল দাবীই

করছি, কিন্তু নিজের দাম কতটুকু, একবারও ভাবিনি। আমাকেই তুই ক্ষমা ক'রে যা, শান্তনু। শুধু ক্ষমা নয়, আমার সমস্ত জীবনের ওপরে তুই ধিক্কার দিয়ে যা। যে কদর্য উত্তেজনাটা আজ প্রকাশ পেলো, আমি যেন একদিন এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

ঈশানীর নধর ও কোমল বাহুখানা শান্তনুর গলাটাকে ঘিরে একটু একটু কাঁপছিল। ফুলকাঠির সেই অর্বাচীন গাঁয়ের মেয়েটা যে কান্নাটা নিয়ে জীবন-যাত্রা সুরু করে, দশ বছর পরে এত ধন দৌলত খ্যাতি প্রতিষ্ঠা স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও সেই কান্না আজও চলছে। কিন্তু পাছে এ কান্নাটাকে শান্তনু সৌখীন মনে করে, সেজন্য ওটা দেখাতে চায় না ঈশানী। শান্তনুর মাথার পিছনটাও ওর গায়ের ওপর ছোঁয়ানো ছিল, তাই থেকে ওর কান্নার কাঁপন অনুভব করা যায়।

গলাটা পরিষ্কার ক'রে ঈশানী আবার সহজকণ্ঠে বললে, একটা দুঃখের কথা তোকে বলি। হাজার হাজার মেয়ের মতন দৈবাৎ আমিও নীচে প'ড়ে গেছি, কিন্তু তোর শক্তি থাকতেও আমাকে তুই তুলবিনে। এর কারণটা আমি জানি, শান্তনু।—পেটের ছেলেকে সন্তান ব'লে কারো কাছে স্বীকার করিনি, কিন্তু ওই ছেলেকে বুকে নিয়ে যদি পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতুম, তা'হলে হয়ত তোর মনে একটু সহানুভূতি দেখা দিত। আমি ত' জানি তোর মনে এই সন্দেহটা খুব বড় হয়ে থেকে গেল, যে মেয়ে একবার পুরুষ মানুষের কাছে মান খুইয়েছে, সে যত অপরিণামদর্শী নাবালিকাই হোক না কেন, যত জ্ঞানের অভাবই তার থাক না কেন,—সে আস্তাকুঁড়ের উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। পুরাণে-ইতিহাসে-কাব্যে—সে মেয়ে বারবার নাকখৎ দিয়েও তোদের সন্দেহের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

শান্তনু শান্তকণ্ঠে এবার বলতে বাধ্য হোলো, একথা সত্যি নয়, ঈশানী।

ঈশানীর গলা আবার কেঁপে উঠলো—এ যদি সত্যি না হয় তবে তোর বুকভরা অমৃত কা'র জন্যে চাপা রেখে দিলি? কেন তবে আমাকে বঞ্চিত ক'রে রাখলি?

সবিনয়ে শান্তনু বললে, আমার সম্বন্ধে তোর এই আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্য

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, ঈশানী। ভালোবাসা অতিশয়োক্তি করে, এটা বুঝি। কিন্তু একটা কথা অপকটে স্বীকার করি, আমাকে ক্ষমা করিস।

কি বল?—উৎসুক হয়ে ঈশানী সামনে এসে দাঁড়ালো।

শান্তনু বললে, দত্তচৌধুরীর ওপর তুই অবিচার করেছিস। এখনও করছিস। বুকভরা অমৃতের আস্বাদ তুই কি পাসনি তার কাছে?

না পাইনি—পাইনি! একটি মুহূর্তের জন্যেও পাইনি। কৌতুক আর কৌতূহলের খেলাকে কখনও বলিসনে অমৃতের আস্বাদ। তুই কি এতই নির্বোধ যে, দুর্ঘটনাকে ভালোবাসা ব'লে ঠাওরাবি? তুই এনে দে' তাকে আমার সামনে। উঁচু গলায় তার মুখের ওপর বলবো, দশ বছর ধরে ঘৃণা ক'রে এসেছি তাকেও এবং নিজেকেও। একথা সত্যি, সেদিন সে-ছেলেটার চেহারা দেখে একটু মেতে উঠেছিলুম, কিন্তু ভালোবাসার কোনো চেতনা জন্মাবার আগেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। তাই আজকের দত্তচৌধুরীর কোনো দাম আমার কাছে নেই,—তুচ্ছের চেয়েও তুচ্ছ। আমার একথাটা বিশ্বাস করলে তোর সব ভুল ভেঙ্গে যেতো, শান্তনু।

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। গলায় সাড়া দিয়ে পাচক এসে দাঁড়ালো ঘরের বাইরে। হাতে চায়ের ট্রে। পাশের প্লেটে খাবার।

এসো ভেতরে।

ভিতরে এসে টিপাই টেনে সে ট্রে রাখলো, তারপর জানতে চাইলো, রাত্রের জন্য কি-কি খাবার তৈরী হবে।

ঈশানী জানালো, কোনো খাবার আর দরকার নেই। যা আছে তাই গরম ক'রে রেখে যাও। তাহ'লেই তোমার ছুটি। দাঁড়াও—

ঈশানী তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দশটি টাকা এনে পাচকের হাতে দিয়ে বললে, আজ রাত্রে আমরা চ'লে যাচ্ছি,—এ তোমার বকশিস।

লোকটা বকশিস পেয়ে নমস্কার জানিয়ে চ'লে গেল।

ঈশানী বললে, এবার আমি স্নান ক'রে নিই। আমার কোথাও লুকোচুরি নেই, শান্তনু। এ নিয়ে তুই অনন্তকাল ধ'রে তর্ক করিস, সে তর্ক আমি চালাতে পারবো।

ঈশানী কাপড়-চোপড় নিয়ে স্নান করতে গেল। চুপ ক'রে একভাবে ব'সে রইলো শান্তনু।

মিনিট পনেরো পরে স্নান সেরে এসে ঈশানী চা ঢেলে শান্তনুর সামনে খাবার এগিয়ে দিল। বললে, যাবার দিনে আমার ওপর রাগ ক'রে সারাদিন উপবাস ক'রে গেলি, এ আমি মনে রাখবো। কিন্তু আমি ব'লে রাখলুম, আমার নিজের যদি কোনো শক্তি থাকে, সেই শক্তির আকর্ষণেই তুই একদিন আমার দিকে মুখ ফেরাবি। শান্তনু, মেয়ে হয়ে জন্মালে জানতিস, সতীত্বটা তাদের প্রাণের সামগ্রী, বাইরের নয়। সোনার জিনিস পুড়ে গিয়ে বাইরেটা কালো হয়, কিন্তু আসল ধাতুটা নকল হয়ে যায় না।

দেখতে দেখতেই দিল্লীতে সন্ধ্যার আলো জ্ব'লে উঠলো।

চা-পান শেষ ক'রে শান্তনু উঠে পড়লো। বললে, এবার আমাকে যেতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়ে ঈশানী বললে, বলতে আর ভরসা হয় না, কিছু টাকা রাখবি সঙ্গে?

না, টাকার আর দরকার হবে না।

ঈশানী উঠে গিয়ে ক্যামেরাটা এনে বললে, এটা সঙ্গে রেখে দে। এ না হ'লে তোর চলবে না। স্যুটকেসের মধ্যে ভ'রে নে।

শান্তনু ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বললে, থাকার যখন জায়গা নেই, তখন স্যুটকেস নিয়ে রাখবো কোথায়? ও তুই কলকাতায় নিয়ে যা। আচ্ছা, চললুম।—বলতে বলতে সে বেরিয়ে সত্যিই চ'লে গেল।

ঈশানী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো সেখানে। না পারলো নড়তে, না চেষ্টা করলো উঠতে। শূন্য অট্টালিকা শ্মশানভূমির মতো মনে হচ্ছে। ঈশানীর দুই চোখ জ্বালা ক'রে নিরুপায় অশ্রুর ধারা নেমে এলো।

১২

আকাশপথে প্লেন উড়ে চলেছে স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রির ভিতর দিয়ে। শূন্য গগনের সকল প্রান্ত অপ্সরালোকের মতো মনে হচ্ছে। চারদিকে সৌরবিশ্বের অনন্ত বিস্তার, অন্তহীন ব্যাপকতা,—নীচেকার পৃথিবী খুব ছোট। নীচের দিকে তাকালে মানব-বিন্দুর চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না। বর্ষার মেঘের মধ্যে মাঝে মাঝে হারাচ্ছে এই যন্ত্রপক্ষী, সেই দ্রুতধাবী মেঘদলের থেকে জলের ঝাপটা আঘাত করছে, ধাক্কা পেয়ে নাড়া খাচ্ছে,—তারপর আবার অখণ্ড শান্ত নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রি যেন অনাদ্যন্তকালের মহাকাব্যের মতো নিজেকে মেলে ধরেছে। আশ্চর্য সৌরলোক। ঈশানীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

মেসিনের প্রবল আওয়াজটা কানের মধ্যে স'য়ে গেছে,—এয়ার হোস্টেস মেয়েটি দিয়ে গেছে দুই কানে গোঁজবার জন্য তুলো। ওঠা আর নামার সময়ে কানের মধ্যে কিছু যন্ত্রণা হয়, তুলো গুঁজলে কিছু উপশম ঘটে। হাতঘড়িতে দেখা যায় সাড়ে তিনটে বাজে। ঘণ্টা দুই আগে নাগপুরে নেমে তাকে প্লেন বদল ক'রে নিতে হয়েছিল।

নীচের দিকে মেঘলোক, তারও অনেক নীচে দিয়ে পাখীরা ওড়ে। কিন্তু প্লেন ছুটেছে অনন্ত ঊর্ধ্বের ব্যোমলোক পেরিয়ে। পাখী পৌঁছয় না, পৃথিবীর কোন ধ্বনি এই সীমাহীন ঊর্ধ্বকে স্পর্শ করে না,—এই আদি-অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের ভিতরে প্রবেশ করে' ভয় এবং ভাবনার চেতনা লুপ্ত হয়ে গেছে।

ঈশানী গা এলিয়ে দিল তার সীট-এ—চোখ বুজে রইলো। অজানা সৌরবিশ্বলোকে চন্দ্রহসিত গগনের ভিতর দিয়ে এই পাখী উড়ে চলেছে পথহারা, —এর গন্তব্য যেন কিছু জানা নেই। একটা সীমাহীন ধূসরতায় সামনের বিপুল পরিব্যাপ্তিটা ঢাকা পড়েছে।

তন্দ্রা জড়িয়ে এলো ঈশানীর চোখে। ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ছোট ছোট আনন্দ-বেদনা,—তারা সবাই যেন ওর মনের মধ্যে চুপ ক'রে গেছে। তাদের কোনো ভাষা আর শোনা যায় না।

পৃথিবীতে এসে নামলো সে ভোর পাঁচটায়। দমদমার বিমান ঘাটিতে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে সে বাঁচলো। এ দিল্লী নয়, এখানে বাতাস কোমল সজল, জননীর মতো আলিঙ্গন ক'রে নিল আপন জন্মভূমি করুণ স্নেহে। নম্বর লাগানো সুটকেসটি ছেড়ে দিয়ে কেবল মাত্র ছোট হ্যাণ্ডব্যাগটি হাতে নিয়ে এবং ভ্যানিটি ব্যাগটি অন্য হাতে ঝুলিয়ে ঈশানী ছুটতে ছুটতে এলো এনক্লোজারের মধ্যে।

ছুটলো কি নাচলো, বলা কঠিন। সুন্দরী 'এয়ার হোস্টেস' তরুণীটি বার বার ফিরে তাকালো ওর বৃষ্টিভেজা রেশমী শাড়ী জড়ানো দেহলাবণ্যের দিকে,—ঈষৎ ঈর্ষার ছোঁওয়া লাগলো মেয়েটার প্রশংসমান হাস্যে। ঈশানীর মতো মনোরম তনুলতার কাঁপন ওর দেহে থাকলে মাইনে বেড়ে যেতো আরও পঞ্চাশ টাকা। এত মাখন খেয়েও 'ফিগার' তার এমনিই র'য়ে গেল।

শেড-এর নীচে আসতেই সামনে পাওয়া গেল তেওয়ারীকে। নত নমস্কার জানিয়ে সে বললে, নমস্তে মেমসাব!

নমস্তে! গাড়ী কোথায় রেখেছ, তেওয়ারী?

তেওয়ারী হ্যাণ্ডব্যাগটি তার হাত থেকে নিয়ে বললে, সামনেই মজুত আছে।

ঈশানী সুটকেসের রসিদখানা তেওয়ারীর হাতে দিয়ে বললে, এটা নিয়ে এসো, আমি চা খেয়ে নিই।

পৃথিবীতে সে আবার এসে পৌঁছেছে, তার জীবন-চাঞ্চল্যের সীমা নেই। গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য-চন্দ্র জীবন-মরণ,—সমস্ত চঞ্চল, সমস্তই দ্রুতগতি। কলকাতা, কিন্তু কলকাতা নয়, ঈশানীর গায়ে-গায়ে এখনও দিল্লী জড়ানো—এখনও দিল্লীর মধুর আলিঙ্গনপাশ থেকে ওর ঘুম ভাঙেনি। এখানে বাতাস অপেক্ষা দ্রুতগামী হোলো দেহ, মন পিছিয়ে রয়েছে দিল্লীতে। দিল্লী, দিল্লী, দিল্লী চলো, দিল্লী চলো! নাচতে নাচতে ঈশানী এসে ঢুকলো, বিমান-ঘাটির রেস্তোরাঁয়!

বৃষ্টি ভেজা জড়োসড়ো দেহে এক পেয়ালা গরম-গরম চা ঢেলে খেয়ে দাম দিল সে একটি টাকা। বয় সেলাম ঠুকলো। লোকটা হয়ত পঁচিশ টাকার বেশী মাইনে পায় না, কিন্তু বকশিস মিলিয়ে উপার্জন করে পাঁচশো টাকা। আন্তর্জাতিক নিয়মে বকশিসটাই প্রাধান্য পেয়েছে।

হ্যাণ্ডব্যাগটি বে'র করে নিয়ে তেওয়ারী গাড়ীতে বসে অপেক্ষা করছিল পর্চের নীচে। ঈশানী এসে ঝাঁপিয়ে উঠলো গাড়ীতে। লঘুপক্ষ চটুল রঙ্গীন পাখীকে তুলে নিয়ে তেওয়ারীর গাড়ী হুস ক'রে বেরিয়ে গেল বিমান-ঘাঁটি ছাড়িয়ে।

পথ অনেকদূর। উত্তর শহরতলী থেকে দক্ষিণ শহরতলী, অন্তত বারো চৌদ্দ মাইল—বেশী ত' কম নয়। গাড়ীখানার ভিতর থেকে কী যেন একটা আওয়াজ উঠছে,—অনেকদিন হ'তে চললো গ্যারেজে পাঠানো হয়নি। বৃষ্টি পড়ছে ঝরঝরিয়ে, আকাশ মেঘমলিন। চারিদিকে লতাগুল্মের ফলন ঘটেছে অজস্র। গাড়ী ঘুরলো,—এ পথটা যেন চেনা-চেনা। দশবছর আগেকার কথাটা তার মনে প'ড়ে গেল। সাহেব বাগানের পথটা ছিল এমনি নির্জন আর নিঃসঙ্গ। ওই মাঠেরই কোনো এক প্রান্তপথে মুখ থুবড়ে সেদিনকার যন্ত্রণাজর্জর জীবনের নিরুপায় কান্না সে কেঁদেছিল।

তেওয়ারী, জোরে গাড়ী চালাও।

গাড়ীতে আরও স্পীড লাগানো হোলো।

সর্বপ্রথম দরকার শিলভিয়াকে, তার সকল দুঃসময়ের অকৃত্রিম বন্ধুকে। শিলভিয়ার সমস্যাটা আগে জানা দরকার। সে একবার বিলেত গেলে আর ফিরবে না,—ভিক্টর ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধাত্রীপান্না হোলো উদয় সিংহের প্রকৃত জননী। ইতিহাস বলবে, এ ঘটনা সত্য নয়; মানুষের চিরকালের ইতিহাস বলবে, এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।

মধ্য কলকাতার কোনো একটা পথ ঘুরে গিয়ে কন্‌ভেণ্টের গেট পেরিয়ে গাড়ী এসে বারান্দার নীচে দাঁড়ালো। টেলিগ্রাম এসেছে গতকাল সন্ধ্যায়—, রমেনবাবু পাঠিয়েছেন। সুতরাং মোটরের শব্দ পেয়ে শিলভিয়া দ্রুতপদে বাইরে

এলো একগাল হেসে। বয়স বছর ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু সংযত কৌমার্যের দীপ্তিতে মুখখানি অতি প্রসন্ন।

ড্যাম্, রট্—গালাগালি দিয়ে হাসিমুখে ঈশানী ছুটে গিয়ে শিলভিয়াকে জড়িয়ে ধরলো।

শিলভিয়া তামাসা ক'রে বললে, প্রণয়ীর সুগন্ধ তুমি আলিঙ্গনে জড়িয়ে এনেছো। বুঝতে পারছি তোমার আহ্লাদের রহস্য! কেমন কাটলো দু সপ্তাহ?

ঈশানী বললে, বিশ্বাস করো, শুধু ঝগড়ায় আর কথার কচ্‌কচিতে! আর কোনো ঘটনা নেই।

সত্যি? শান্তনুকে পুরুষ বলতে বাধছে যে? বেশ সুস্থ লোক ত'?

ঈশানী হেসে উঠলো,—ভয়ানক সুস্থ। আমি একেবারে ঝালাপালা।

বটে!—শিলভিয়াও হাসলো। পুনরায় বললে, ভালো মনে হচ্ছে না। গ্র্যান্-মা বলতেন, অনেক পুরুষ শিকার করে, আবার অনেকে শিকার নিয়ে খেলাও করে। তোমার কোন্‌টা?

দু'জনেই হেসে একেবারে লুটোপুটি।—

অফিস ঘরে এসে দু'জনে বসলো। শিলভিয়া বললে, চা আনতে বলি?

থ্যাঙ্ক ইউ।—ঈশানী বললে, চা খেয়ে এসেছি। শোনো, কাজের কথা বলো। তোমার পরিস্থিতি ঠিক কেমন শুনি।

শিলভিয়া পলকের মধ্যে চোখ টিপে এদিক-ওদিক তাকালো। বললে, ওসব পরে হবে। ভিক্টরকে যেখানে রেখে এলে সে জায়গাটা নিরাপদ ত'? ইস্কুল খুলতে একটু দেরী আছে, কিন্তু আসবে কবে? পড়া কামাই যাচ্ছে।

রেক্‌টর সাহেব গলায় একটি সোনার ক্রশ ঝুলিয়ে এ ঘর পেরিয়ে অন্য ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। থমকে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ঈশানীকে শুভপ্রভাত জানালেন। ঈশানী প্রত্যুত্তর দিল। তিনি চ'লে গেলেন।

ঈশানী তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে এক গোছা দশ টাকার নোট বা'র করলো।

শিলভিয়া বললে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আজ না দিলেও চলবে। ফোন ক'রে তোমাকে জানাবো।

গলা নামিয়ে ঈশানী বললে, আমি এখন সম্পূর্ণ একা। কবে তুমি আসছ আমার ওখানে ?

শিলভিয়া ভয় পেয়ে আবার চোখ টিপে মানা করলো। মুখে বললে, হ্যাঁ, অনেকগুলো কাজ জমেছে আমার। কিছু জিনিসপত্রও আমাকে কিনতে হবে। নিউ মার্কেটে একবার যাবো শনিবারে। এই দুপুরের দিকে আর কি।

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। শনিবারে সে ঈশানীর ওখানে আসবে। ঈশানী বললে, টাকা তুমি জমা ক'রেই নাও, শিলভিয়া—আমার খরচের হাত, সব সময়ে টাকা থাকে না। আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন উঠি। সোজা এসেছি তোমার এখানে বুঝতেই পাচ্ছ, এবার বাড়ী যাই। নিশ্চিন্ত থাকো, ভিক্টর বেশ ভালোই কাটাচ্ছে দিল্লীতে।

বিদায় নিয়ে ঈশানী গাড়ীতে এসে উঠলো। সকাল সাড়ে আটটা বেজে গেল। বাড়ীর দিকে গাড়ী ছুটলো।

গাড়ীর মধ্যে ব'সেই নিজের মহলের সমস্ত ঘরগুলো যেন একটা যন্ত্রণাদায়ক শূন্যতা নিয়ে তার চোখের সামনে হাজির হোলো। ইদানীং প্রত্যেকটি ঘর শান্তনু ভরে রেখেছিল। সমস্ত আসবাবপত্র, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রত্যেকটি অচল সামগ্রী, শয়নকক্ষগুলির প্রত্যেকটি বিছানা,—সবটা যেন শান্তনুময়। ঈশানী তার নারী জীবনের অনেকখানি অংশ দেখে নিয়েছে এতকালের মধ্যে, নিজ অভিব্যক্তিই সে দেখে এসেছে এতকাল, কিন্তু আজ তার সমগ্র সত্তার ঠিক মূল কেন্দ্রে সিংহাসন পেতে বসেছে শান্তনু তার বাঁশী হাতে নিয়ে,—তার সমস্ত অভিব্যক্তি নূতন ভাষ্যলাভ করেছে শান্তনুর মধ্যে। ঈশানী সঙ্গে ক'রে এনেছিল একটা প্রবল প্রাণ, অধীর অস্থির একটা জীবন-চাঞ্চল্য, নিজেকে প্রস্ফুটিত করার একটা বাসনা-বিহ্বলতা,—কিন্তু এতকালের মধ্যে এদের পরমার্থটা তার চোখে পড়েনি। আপন মেধা, প্রতিভা, শক্তি, কর্মক্ষমতা, সর্বাঙ্গীন যোগ্যতা,—এরা কোনোদিন তাকে স্থির থাকতে দেয়নি, এরা তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে

একখান থেকে অন্যখানে, এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায়, এক সাফল্যের থেকে অন্য সাফল্যে। কিন্তু এরা আজ সার্থক হ'তে চলেছে এমন একটি ভাবনার মধ্যে,—যেটি তার জীবনে ছিল অভাবনীয়। এতদিন পরে তার আয়ুকালের খণ্ড ক্ষুদ্র ভগ্নাংশগুলি একটি মহৎ সংহতি লাভ করলো, এটি তার জীবনের নতুন উদ্দীপনা। এরা আজ একটির পর একটি অভিনব অর্থ বহন ক'রে নিয়ে এলো। পথ ছিল এতকাল লক্ষ্যহীন, সেই পথযাত্রায় ঝড়ে দুর্যোগে অপঘাতে যন্ত্রণায় সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, হোঁচট খেয়েছে অন্ধকারে, ক্লান্ত দুই পা টেনে টেনে দুর্গম অতিক্রম করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সে কতবার, চোখের জলে আর বৃষ্টির জলে একাকার হয়েছে কতদিন, অন্ধ অমানিশি ঘনীভূত হয়েছে বার বার তার দৃষ্টিপথে,—কিন্তু আজ যেন পাওয়া যাচ্ছে একটা গন্তব্য, একটা লক্ষ্য। পথের শেষ প্রান্তটা বুঝি দেখাও যাচ্ছে। বিরহের শূন্যতায় আর কিছু না হোক, লক্ষ্যটা তার স্পষ্ট হোলো।

কিন্তু তার বহুপ্রকার কল্পনা-বিলাসের মধ্যে এও একটা নবতম বৈচিত্র্য নয় ত'? ভাবনার সঙ্গে শান্তনু কি মিলেছে? সে নিজে কি মিলিয়েছে শান্তনুকে? সমস্ত পথ মধুর মনে হচ্ছে, কেন না সে দেখছে তার মধ্যে শান্তনুর প্রকাশ। শান্তনু নিজেকে প্রকাশ করেছে তারই সত্তায়, তারই মর্মে মর্মে। বাঁশীর ধ্বনি উঠেছে তারই ধমনীর রক্তচলাচলে; তার হৃদয়ের একূলে-ওকূলে ঘনবর্ষার জলতরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু শুধু এই অনাস্বাদিতপূর্ব হৃদয়াবেগের প্রথম উদ্বোধনের বাইরে কাল্পনিক সত্য অপেক্ষা বাস্তব সত্য কতখানি,—এ প্রশ্নের জবাব কোথায়? শ্রীরাধার সঙ্গে মিলনের আকুলতায় বাঁশী তার অস্তিত্বের মর্মমূল অবধি কাঁদিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু সে ত' কেবল অভিসারের কল্পনা,—প্রত্যক্ষ সংসারের ঘরকন্নার মাঝখানে উভয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় কই? নবগঙ্গা এলো তার জীবনে নতুন পথ ধ'রে—কিন্তু পিপাসা তার মিটছে কি?

গাড়ী এসে পৌছলো গেটের মধ্যে। দরজা খুলে নামতেই সামনে চোখ ছুটে গেল, নীচের মহলে পাঞ্জাবী ভাড়াটেদের ওখানে। দু'তিনটি মহিলা বারান্দার উপরে অত্যন্ত বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে,—ওদের মধ্যে একজন উড়ানীর খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছিল।

পাশ দিয়ে দোতালায় উঠে যাবার আগে ওদের একজন সম্ভাষণ জানালো,
নমস্তে ঈশানীজি !

ঈশানী থমকে দাঁড়ালো ! বললে, নমস্তে বহিনজীভাই । ক্যা হুয়া ? রোনে কেঁও লাগা ?

ওরা পানিপথের লোক । কলকাতায় ওদের কালোয়ারী ব্যবসা । কিন্তু দেশে হোলো কারখানা । সেখানে রাজরত্তন কাউর নামক মহিলাটির স্বামী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সেই সংবাদটি পেয়ে ওরা ভয় পাচ্ছে । আজ একটু আগে ওরা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে জরুরী, সেই আলোচনা চলছে । ঈশানী তার সহানুভূতি ও অভয় জানিয়ে উপরে উঠে এলো ।

রামতীরথ তাকে নমস্কার জানিয়ে স'রে দাঁড়ালো । পিছনে পিছনে তেওয়ারী এসে হাণ্ডব্যাগটা দিয়ে গেল । ভণ্ডুল ঘরকন্না তার নয়, চারদিক পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত । আর কিছু না হোক, এমন একটা জীবন সে যাপন করে যেটা আজকের দিনের বহু মেয়ের আদর্শ । প্রত্যেকটি ঘরে ভিন্ন ভিন্ন রুচির আসবাব-পত্র, চারদিক খোলা হাওয়া আর আলোয় অবারিত,—অন্যদিকে বাধাবন্ধহীন স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা । অসংযত উচ্ছৃঙ্খল দিনযাপনের এমন সুযোগ সহসা কোনো মেয়ের ভাগ্যে ঘটে না, অথচ সংযমরক্ষার এমন অগ্নিপরীক্ষাও কোনো মেয়ের জীবনে সচরাচর দেখা যায় না । ঠিক এই কারণেই শান্তনুর তীক্ষ্ণ তীব্র পরিহাস ছুরির ফলার মতো প্রত্যেকটি ঘরে এসে দাঁড়িয়ে ঝলসিয়ে উঠতো । একথা সত্য, একজন সুস্থকায় সুদর্শন ও বলিষ্ঠ পুরুষের এমন কঠিন চরিত্রের বাঁধন এর আগে ঈশানীর চোখে পড়েনি ।

ঈশানী অনেকদিন পরে তার 'মেহনতে'র ঘরে গিয়ে ঢুকলো, এবং প্রা আধঘণ্টা পরে ঘর্মাক্ত এবং আলুথালু অবস্থায় সে চট ক'রে স্নান করতে চ' গেল ।

জিনিসপত্রসমেত নন্দ এসে পৌঁছলো আন্দাজ এগারোটায় । দিল্লী ঘু এলো, সুতরাং ভৃত্য মহলে তার খাতির বেড়ে গেল । বুড়ি ঝি কাজ করা

রান্নাঘরের পাড়ায়, সেও ছুটে এসে নন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। নন্দ বীরদর্পে তাদের সবাইকে ব'লে দিল, বলবো, সব একে একে বলবো! তোমাদের সাত জন্মের তপস্যে যে, এমন মানুষের বাড়ী চাকরি করছ! পনেরো দিনে তিনশো টাকা উপরি রোজগার ক'রে তবে ফিরেছি!

উপরি রোজগার! সে আবার কি! সবাই নন্দকে ধ'রে বসলো।

তোয়ালেখানা নেড়ে হাওয়া খেয়ে নন্দ বললে, জলের মতন সহজ! এ আর বুঝতে পারলে না? যত-যত লোক দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে সেখানে এসেছে,—দুটাকা পাঁচটাকা দশটাকা বকশিস দিয়ে গেছে আমার হাতে! আরে, আমার হাতেই ছিল যে কলকাঠি! পুরুতের পায়ে প্রণামী ফেলো, ঠাকুর দর্শন ক'রে চ'লে যাও!

নন্দর দিল্লী প্রবাসের কাহিনী শুনে সবাই মুগ্ধ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ঈশানী গিয়ে টেলিফোন ধরলো তাদের নৃত্য-প্রতিষ্ঠানে। আপিসে পাওয়া গেল রমেনবাবুর সহকারী হিসাবরক্ষক নানুবাবুকে। ঈশানী জানালো, আজ সকালে আমি এসেছি। রমেনবাবু আসছেন দু' একদিনের মধ্যে। আপনাদের খাতাপত্র সব ঠিক আছে ত'?

জবাব এলো, আজ্ঞে হ্যাঁ, যেটুকু বাকি রয়েছে, দুপুরবেলাতেই সেরে রাখবো।

অডিট্ হয়ে গেছে? ব্যালেন্স শীট?

সমস্তই প্রস্তুত আছে। আপনার সই শুধু হয়নি।

ঈশানী জানালো, আমি ঠিক সময়ে যাবো, তবে হৈ চৈ যেন না ওঠে।—টেলিফোন ছেড়ে ঈশানী স'রে এলো।

রামতীরথ একরাশি চিঠিপত্রের তাড়া বারান্দার টেবলের ওপর রেখে সামান্য জল ও চা এনে দিল। ঈশানী চায়ে চুমুক দিয়ে চিঠি খুললো একটির পর একটি। দিল্লীর সুখ্যাতির ঢেউ কলকাতায় এসে পৌঁছেছে, তার জন্য কয়েকখানি পত্রে প্রশস্তিবাচন। গ্রামোফোন কোম্পানীর দুখানা চিঠি, একখানি বেতার-কেন্দ্রের কণ্ট্রাক্ট। তার নাচের ফিল্ম তোলার জন্য বোম্বাই কোম্পানীর স্থানীয়

আপিস থেকে একখানি পত্রে প্রস্তাবনা। সিনেমা চিত্রে প্লেব্যাকে সে গান দিতে প্রস্তুত কি না তার জন্য বিশেষ বিশেষ অনুরোধ। খান দুই পত্রে তাকে একবারটি দর্শন করার সাগ্রহ অভিলাষ জানিয়ে আকুল আবেদন।

ঈশানী সামান্য একটু হাসলো। অনুরাগীদের সুলিখিত পত্রাদি বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু ভক্তরা সামনে ব'সে যখন আপ্লুত কণ্ঠে পূজা নিবেদন করে,—সে যে কী যন্ত্রণা, শিল্পীমাত্রেই জানে। উপমাটা শুনতে মন্দ, তবু মনে আসে বৈ কি। বারোয়ারীতলার প্রতিমা নিতান্ত অচেতন, তাই রক্ষা! ঠাকুরের প্রাণ নেই, তাই বেঁচে গেছেন!

রাশির ভিতর থেকে কয়েকখানি চিঠি বেছে নিয়ে ঈশানী গিয়ে আবার বসলো টেলিফোনে। চিঠি দেখে একটির পর একটি ফোন ক'রে সে তার যথাযোগ্য বক্তব্য জানালো। দুটি ব্যাঙ্কে জানালো, শেষ তারিখ অবধি রিটার্ণ পাঠাতে। এমনি ক'রে প্রায় আট নয়টি ফোন ক'রে সমস্ত কথাবার্তা সমাপ্ত করতে লেগে গেল প্রায় এক ঘণ্টা। তারপরে সোজা এসে ঢুকলো খাবার ঘরে। বেলা একটা বাজলো। রামতীরথ একটির পর একটি খাবার নিয়ে এলো।

হঠাৎ রমেনবাবুর কথাগুলো স্মরণ ক'রে ঈশানীর অধরে হাসি ফুটলো। তার এই একক জীবনই রমেনবাবুর প্রিয়। সমস্ত দিন সে থাক্ ব্যস্ত, চঞ্চল, উদ্দাম,—রমেনবাবু খুব খুশী। অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, বিলাস, সম্ভোগ—কোনো কিছুর অভাব না ঘটে। সুখ্যাতি পাক্ সে অজস্র, প্রতিষ্ঠা লাভ করুক সর্বত্র, সে প্রিয় হোক সকলের, সমস্ত জনসাধারণের, রমেনবাবু বড়ই আনন্দিত! এদের মধ্যে সঙ্গীত নৃত্য প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির বীজ লুকানো, এদেরই মধ্যে রমেনবাবুর নিজের ভাগ্যোন্নতির প্রশস্ত রাজপথ আলোকিত। ঈশানী ব্যক্তিবিশেষের প্রিয় হলেই রমেনবাবুর ঘোরতর আপত্তি। তিনি পাকা বিষয়ী লোক। ভালোবাসা অথবা প্রণয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তাঁর অভিধানে নেই। ওসব ব্যাপার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ সমাজের,—শিল্প-জগতে ওগুলো দু'চোখের বিষ! শান্তনুকে তিনি প্রথম থেকেই সহ্য করেন নি। সামাজিক সৌজন্যের খাতিরে অনেকদিন অবধি তিনি

ভদ্রতার মুখোসটি বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু তারপরে সে-মুখোস তিনি নিজেই খুলেছেন। পথের কাঁটা না সরালে ঈশানীর পদে পদে পায়ে ফুটবে, এ তিনি জানেন! ঈশানী কোনো কাজ করেনি গত কয়েক মাস, কোনো বিষয়ে মন দেবার সময় পায়নি, কোনো সমস্যা নিয়ে মাথাও ঘামায় নি। কিন্তু হঠাৎ এবার বোধ হয় রমেনবাবু তাঁর নিজের কবর নিজেই খুঁড়লেন।

খাবারের থালা থেকে মুখ তুলে ঈশানী একবার অন্যদিকে তাকালো।

যে সুস্পষ্ট নোংরা মনোবৃত্তি তিনি এবার প্রকাশ করলেন, ঈশানী সেটি ভোলেনি। ভিক্টরের প্রতি কদর্য মন্তব্য তিনি করেছেন,—কিন্তু সেখানে তাঁর অজ্ঞান নিহিত, সেটি ক্ষমার যোগ্য। তাঁর অমার্জনীয় অপরাধ ঘটেছে শান্তনুর প্রতি। এই সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত কুটিল ক্রূরতার জবাব ঈশানী দেবে বৈ কি। এবারে রমেনবাবুকে জানানো দরকার, অর্থশাস্ত্রে ঈশানী এম-এ পাস করেছিল ; জানানো দরকার, ঈশানী ভদ্র ব'লেই তাঁর আত্মপরতা এবং স্বার্থবাদের ছলা-কৌশলকে এতদিন বরদাস্ত ক'রে এসেছে। মনে পড়ে, তার একটি সামান্য উক্তিতে রমেনবাবুর প্রকৃতির প্রতি সামান্য কটাক্ষ ছিল ব'লে শান্তনু তাকে কোনোমতেই ক্ষমা করেনি। এত ভদ্র শান্তনু। শান্তনুর মন হোলো রসগ্রাহী, দৃষ্টি হোলো নিরপেক্ষ। ন্যায় বিচারে শান্তনুর বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব ছিল না ব'লে ঈশানীই তাকে খোঁচা দিয়েছে কতদিন। অনেক সময় শান্তনু অত্যন্ত কটু পরিহারের দ্বারা ঈশানীর আন্তরিকতাকে আঘাত করেছে, অনেক সময়ে বাকচাতুর্যের দ্বারা ঈশানীর চারিত্রিক সততাকে সন্দেহে কুন্ঠিত করতে চেয়েছে, কিন্তু তার কোনো আচরণ স্বার্থবাদ এবং আসক্তির দ্বারা কোনোদিন অনুপ্রাণিত ছিল না। আপন আচরণের নির্মলতা, নিরাসক্তির প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং সুদৃঢ় সংযমের সহিত সর্বপ্রকার ভোগ ও লোভের প্রতি স্পৃহাশূন্যতা,—এরা শান্তনুকে আরাধ্য ক'রে তুলেছে,—রমেনবাবু এর কতটুকু জানে?

নিষ্ক্রিয় স্বভাব-সৌজন্যবশতঃ ঈশানী রমেনবাবুর আচরণকে এ-যাত্রায় উপেক্ষার দ্বারা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়, কারণ এর মধ্যে তারও মানব-ধর্ম নিহিত ঈশানী নিজের মনেই একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে নিল।

আহারাদি সেরে ঈশানী গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। নন্দ এসে ঘরের জানালাগুলি বন্ধ ক'রে সামনে এক গ্লাস জল রেখে পাখাটা সামান্য খুলে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে চ'লে গেল।

ঠিক তিন দিনের দিন বিকাল বেলায় টেলিফোন বাজলো। নন্দ এসে জানালো, রমেনবাবু ডাকছেন। টেবলে ব'সে ঈশানী দু'একখানা চিঠিপত্র লেখায় ব্যস্ত ছিল। খবরটা শুনে কলমটা বন্ধ ক'রে এক মিনিট কি যেন ভাবলো, তারপর এসে ফোন ধরলো। রমেনবাবু কুশলবার্তা বিনিময় ক'রে উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, একটি আনন্দের খবর আছে। একটি জিনিস সঙ্গে ক'রে আজ সকালে এসে পৌঁছেছি, এটি তোমার হাতে তুলে দিয়ে কিন্তু বকশিস চাইবো।

ঈশানীর কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। হয়ত কোনও রকম উপহার হবে, কিন্তু রমেনবাবুর হাত থেকে কোনও উপহার সে গ্রহণ করবে না, এটা নিশ্চিত!

রমেনবাবু বললেন, তুমি বাড়ী আছো ত'? আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

ঈশানী বললে, না, আপনার আসবার দরকার নেই। আমি নিজেই ওখানে যাচ্ছি। ওখানে অনেক কাজ জমেছে আমার।

ঈশানীর গলার আওয়াজটা একটু যেন অন্য রকম ঠেকলো। রমেনবাবু বললেন, নাম্বুর মুখে শুনেছি খাতাপত্রগুলো তুমি একবার দেখতে চাও। কিন্তু নাম্বু তোমাকে একটা কথা ঠিক বলতে পারেনি। তোমার সই-সাবুদের জন্য কোনো কাজ আটকে যেন না থাকে, এই মর্মে যে চিঠি তুমি আমাকে কিছুকাল আগে দিয়েছিলে, নাম্বুর সেটা জানা ছিল না। সেইজন্য চেক্ পর্যন্ত আমিই সই ক'রে পাঠাই। আর তাছাড়া—হ্যালো—হ্যালো?

ঈশানীর দিক থেকে আর কোনো সাড়া না পেয়ে রমেনবাবু রিসিভার রেখে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। অফিস ঘরের আরেক পাশে বসেছিলেন নাম্বুবাবু। রমেনবাবু বিরক্ত হয়ে একবার তাকালেন নাম্বুর দিকে। বললেন, এতদিন তোমরা কাজ করছ, কিন্তু এক এক সময়ে এমন বেফাঁস কথা ব'লে ফেলো,

যার ধাক্কা সইতে আমার প্রাণ যায়। তাছাড়া মেয়েছেলে নিয়ে কারবার, তাদের মাথায় যদি একবার একটা পোকা ঢোকে, সে-পোকা আর বেরোতে চায় না। এখন ঠেলা সামলাই কোন্ দিকে বল ত'? নাও, ওই আর্ম চেয়ারখানা এগিয়ে দাও,—টেবিলটা ঝাড়ো, ওগুলো ভালো ক'রে গোছাও,—এখনি হয়ত এসে পড়বে।

আধঘণ্টার মধ্যেই ঈশানী এসে পৌঁছলো। এলো অনেকদিন পরে, ঝি-চাকর দারোয়ান তটস্থ। আগে থেকে কা'রো জানা ছিল না, সেজন্য চাপা কলরব দেখা যাচ্ছে না। ওপরে গান-বাজনার আসর বসেছে। ঈশানী দ্রুত সিঁড়ি পেরিয়ে সোজা উপরে উঠে গেল, একেবারে আপিস ঘরে এসে ঢুকলো। নান্নুবাবু এগিয়ে এসে নমস্কার জানালেন।

রমেনবাবু হাস্যমুখে সম্ভাষণ করলেন। বললেন, আমিও ভোরবেলায় প্লেনে এসে পৌঁছেছি। এই প্রথম প্লেনে চড়া, ভয়ে ভয়ে মরি। ওদের গণ্ডগোলের জন্যেই দুদিন দেরী হয়ে গেল। অবিশ্যি ভদ্রতা ক'রে আমার টিকিটখানা কিনে দিল আসবার সময়ে।

ঈশানী আরাম কেদারায় বসলো না,—টেবলের সামনে চেয়ার টেনে ব'সে বললে, আমিও খুব ব্যস্ত ছিলুম এ ক'দিন, অন্যদিকে মন দিতে পারিনি।

তার মুখের গাম্ভীর্য দেখে রমেনবাবু চিন্তিতমুখে বললেন, শরীর ভালো আছে তোমার?

ঈশানী তাঁর উদ্বেগের রহস্য জানে। একটু হেসে বললে, আমার শরীর কোনোদিন খারাপ হয় না, আপনি ত' জানেন।

হ্যাঁ, তাই তো। শরীর রাখতে পারে বাঙলা দেশের ক'জন মেয়ে?—রমেনবাবু বললেন, সুখের সংসার পেলেই বাঙালী মেয়ের ভুঁড়ি হয়। তোমার মতন ব্যায়াম করে ক'জন? তবে একটি জিনিস যদি এখনই তোমার হাতে দিই, এক্ষুণি তুমি আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। এ আমি বাজি রেখে বলছি।

ঈশানী মুখ তুলে তাকালো। বললে, কি জিনিস?

রমেনবাবু গলা বাড়িয়ে বললেন, ওহে নান্নু, একবার বাইরে যাও ত'? পর্দাটা ফেলে দিয়ে যাও, কেউ না আসে।

নাম্নুবাবু পর্দা টেনে দিয়ে বাইরে চ'লে গেলেন।—রমেনবাবু একটু গুছিয়ে ব'সে বললেন, তুমি সরল, ভদ্র, কাল্‌চারড্‌, তাই অন্যায় আর প্রতারণা দেখলেও তোমার মুখে কথা আসে না। কিন্তু এটা জেনে রেখো, ঈশানী তরুণ ছোকরাদের হাঁচি কাশি সব আমি বুঝি। হোক না আত্মীয়,—আত্মীয় কুটুম্বরাই ত' পথে বসায়! পাঁচটা কথার প্যাঁচে ফেলে শান্তনু তোমাকে পথে বসাতে চেয়েছিল, সে-জোচ্চুরি তুমি না বুঝলেও আমি ধরতে পেরেছিলুম! সেদিন দেখলে ত', মুখের ওপর যখন অপমান করলুম, একটি কথাও বলতে পারলো না? আর তাছাড়া তোমার মনের কথাই আমি ওকে শুনিয়ে দিয়েছি। বাছাধন যাবে কোথায়? এই নাও—

টেবলের ড্রয়ার থেকে একটি পার্সেল বার ক'রে সোল্লাসে রমেনবাবু বললেন, সব আছে এর মধ্যে। ব্যাঙ্কের বই, লেখাপড়া, চেক্ বই, ফিল্ আপ করা ফর্ম্, ষ্ট্যাম্প মারা দলিল,—সব একটি একটি ক'রে কান ধ'রে লিখিয়ে নিয়েছি। একেবারে ভরাডুবি হতে বসেছিল, সমস্ত উদ্ধার করেছি।—এই ব'লে তিনি পার্সেলটি খুলে ঈশানীকে বোঝাতে বসলেন।

ঈশানী আসবার দিন সে সমস্ত কাগজপত্র শান্তনুর সামনে ছিঁড়ে ফেলেছিল, শান্তনু নতুন ক'রে আবার সেগুলো প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে। সুতরাং কোনোটাই নতুন নয়। কিন্তু মনের কথা চাপা থাক্। ঈশানী একটির পর একটি কাগজ, বই ও দলিল বুঝে প'ড়ে নিল। এক সময় প্রশ্ন করলো, আপনি তার একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন বললেন, তার কতদূর কি হোলো?

রমেনবাবু আনন্দে আপ্লুতকণ্ঠে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন,—ধাপ্পাটা দেখছি তুমিও বুঝতে পারোনি। লোভ না দেখালে এ সব ধূর্ত লোককে দিয়ে কিছু করাবার জো আছে? কোথায় চাকরি? কে দিচ্ছে চাকরি? অমন গ্রাজুয়েট পথেঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে,—কে কার খোঁজ নেয়, ঈশানী?

কিন্তু তার চলবে কেমন ক'রে?—চাপা আগুনের থেকে কেমন একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে এলো।

রমেনবাবু বললেন, পাঁচটা গরীব গেরস্থর ছেলের যেমন ক'রে চলে, তেমনি

চলবে? ওসব জালছেঁড়া পলোভাঙ্গা ছেলে, পরের খরচে দিল্লী গেছে,—এবার নিজের বরাত নিয়ে ভেসে পড়ুক! ভাইদের সঙ্গে ওসব মামলা-মোকদ্দমা সব মিথ্যে, বুঝলে ঈশানী? তোমাকে ধ'রে ছোঁড়াটা নিজের ভাগ্য ফেরাতে চেয়েছিল! আত্মীয়-কুটুম্ব ব'লে তুমিও ঝেড়ে ফেলতে পারোনি। এই সঙ্গে আবার একখানা চিঠিও দিচ্ছিল তোমার নামে। আমি বললুম চিঠি? তোমার ওসব ভাষার ভোজবাজী পড়ার সময় ঈশানীর নেই, তা জানো?

বক্তৃতার কালে রমেনবাবুর একটিবার একথা মনেও হোলো না যে, লোহাটা যতই পুড়ছে, ততই সে ইস্পাতে পরিণত হচ্ছে। বাণ্ডিলটা হাতের মধ্যে নিয়ে ঈশানী এবার বললে, খাতাপত্রগুলো এবার একটু বা'র করুন, আমি চোখ বুলিয়ে নিই।

হ্যাঁ, এই যে—সবই গুছিয়ে রেখেছি। ব্যাঙ্ক থেকে রিটার্ণ পাঠিয়ে দিয়েছে। এই আমাদের ব্যালেন্স শীট্! আর এই হোলো পাকা জমা-খরচের খাতা!—রমেনবাবুর একটির পর একটি খাতাপত্র, কাগজ, বিলবই, ভাউচার, রসিদ ইত্যাদি বা'র ক'রে দিলেন। অলেক্ষ্য একবার ঈশানীকে লক্ষ্য ক'রে নিলেন। মেয়েটার মেজাজ আজ ভালো নেই। খুব স্বাভাবিক।

ঈশানী একবার উঠে গিয়ে তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি মোটা চাবি বা'র ক'রে সামনে ষ্টিল আলমারিটা খুলে নিজস্ব একটি ফাইল নিয়ে এলো। উদ্বেগ দেখা দিল রমেনবাবুর চোখে-মুখে। ফস ক'রে বললেন, অডিট্ করা হয়ে গেছে! তবে কি জানো, ডেবিট্ ভাউচার এখনো অনেকগুলো মেলাতে পারিনি, মুখে মুখে সব ব'লে গেছি কিনা।

ফস ক'রে ঈশানী বললে, তাহ'লে খাতাপত্র রাখার দরকার কি, রমেনবাবু?

রমেনবাবু বললেন, তুমি যে হঠাৎ এসে আগাগোড়া চেক্ করতে বসবে, এ কি আমি জানতুম?

ঈশানী বললে, ছ' মাস কি এক বছর আগে যে সমস্ত টাকা আপনার হাত দিয়ে খরচ হয়েছে, তার হিসেবগুলো না পেলে এ প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় কেমন ক'রে জানবো?

নিজের মুখখানার উপর কেমন একটা বিবর্ণতার ছাপ পড়ছে, এটা রমেনবাবু উপলব্ধি করলেন। ঈষৎ ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন, তুমি কি এতকাল পরে আমাকে সন্দেহ করছ, ঈশানী ?

না।—ঈশানী বললে, নিজের কাজে আমি যদি মনোযোগ দিই, সেটাকে আপনি সন্দেহ মনে করেন কেন ?—এই ব'লে সে খাতাপত্রের সঙ্গে বিল-ভাউচার ও চেক্‌বই মেলাতে বসলো।

রমেনবাবু ডাকলেন, নান্নু ?

নান্নুবাবু কাছাকাছি ছিলেন, ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। রমেনবাবু বললেন, এক গ্লাস জল আনতে বলো ত' ?

নান্নুবাবু বাইরে গিয়ে জল পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু জল এসে প'ড়ে রইলো টেবলের কোণে, রমেনবাবু সেকথা ভুলে গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা অবধি আনুপূর্বিক সমস্ত পরীক্ষা ক'রে ঈশানী স্তম্ভিতমুখে একবার রমেনবাবুর দিকে তাকালো, তারপর ডাকলো, নান্নুবাবু ?

পর্দা সরিয়ে নান্নুবাবু আবার ঢুকলেন। ঈশানী বললে, ওঁর ভুল-ভ্রান্তি হ'তে পারে ত' ? আপনি জবাব দিন্ আমার কথার। খাতাপত্র দেখে বলুন।

যে আজ্ঞে—নান্নুবাবু টেবলের ওধারে এসে বসলেন।

ঈশানী প্রশ্ন করলো, সাড়ে তিন বছরে কত টাকা মেম্বারদের কাছে সবস্‌ক্রিপসন্ পেয়েছেন ?

নান্নুবাবু বললেন, সাড়ে তিন বছরে বিরাশীজন থেকে তিনশো সাতজন মেম্বর হয়েছে। মাথা পিছু সাত টাকা চাঁদা। আজ পর্যন্ত মোট টাকা জমা পড়েছে ছাপ্পান্ন হাজারের কিছু বেশী।

ঈশানী বললে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। 'শো' হয়েছে মোট ক'টা ?

নান্নুবাবু বললেন, কলকাতা, মফঃস্বর আর বাংলার বাইরে মিলিয়ে মোট তেতাল্লিশটা। শুধু সেদিনের দিল্লীটা বাদে। তাতে টাকা এসেছে মোট এক লাখ তেষট্টি হাজার আটশো বিয়াল্লিশ টাকা।

ডোনেশন্ কত পেয়েছেন ?

একচল্লিশ হাজার টাকা। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের সুদ আটাশ শো টাকা। প্রচার পুস্তিকা বেচে লাভ হয়েছে এগারো শো টাকা।

রমেনবাবু একবার চেয়ারে হেলান্ দিচ্ছিলেন, একবার সোজা হয়ে ঝুঁকে বসছিলেন। এবার বললেন, তুমি যে একেবারে সব মুখস্থ ক'রে রেখেছ, নানু। আগের জন্মে বোধ হয় তোতা পাখী ছিলে!

মাঝখানে নানুবাবু হিসাবটা একটু সংশোধন ক'রে বললেন, একটা ভুল হয়েছে, অ্যাড্মিশন্ ফি বাবদ সাড়ে একুশ শো টাকা ধরা হয়নি।—এই ব'লে তিনি বিগত সাড়ে তিন বছরের আয়-ব্যয়ের একটি তালিকা ঈশানীর সামনে প্রস্তুত ক'রে দিলেন।

ঈশানীর সমস্ত কণ্ঠস্থ ছিল। শান্তকণ্ঠে সে বললে, এবার সাড়ে তিন বছরে মোট খরচের পরিমাণটা বলুন।

নানুবাবু বললেন, মোট ছিয়াত্তর হাজার টাকার ডেবিট্ ভাউচার আমি পেয়েছি!

ঈশানী বললে, ব্যাঙ্কে এখন কত টাকা থাকা উচিত, নানুবাবু?

নানুবাবু বললেন, এক লাখ অষ্টআশী হাজার টাকা!

কিন্তু আছে কত?

এক লাখ তিন হাজার একশো বাহান্ন।

ঈশানী মিষ্ট হেসে বললে, আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ, এবার আপনার ছুটি। আপনার সঙ্গে আমার হিসেব মোটামুটি মিলেছে।

ইশারা বুঝে নানুবাবু বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের পা কাঁপছিল। ঈশানী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে; কই, জল খেলেন না, রমেনবাবু?

রমেনবাবু ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে বললেন, তোমার মেজাজ-মর্জি দেখে মনে হচ্ছে, শুধু গেলাসের জল নয়, সাত ঘাটের জলও আমাকে খেতে হবে!—এই বলে তিনি গেলাসটা তুলে নিলেন।

ঈশানী বললে, সর্বসুদ্ধ ছিয়াত্তর হাজার টাকা আপনার খরচ, কিন্তু আপনি একলাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এই সাড়ে তিন বছরে ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন।

প্রায় নব্বই হাজার টাকার হিসেব কই ? এ টাকার হিসেব না পেলে ত' আমার চলবে না ?

উত্তেজিত হয়ে রমেনবাবু বললেন, তুমি বোধ করি আমাকে চাকরি থেকে সরাতে চাও ? আমার বিশ্বাস শান্তনুই তোমাকে এই মতলব দিয়েছে ! বেশ, আমি এখনই রিজাইন্ দিচ্ছি !

ঈশানী হাসলো ! বললে, আমার বিশ্বাস, এ প্রতিষ্ঠানে আপনার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। এ সমস্ত উন্নতি আপনারই জন্যে। কিন্তু এই নব্বই হাজার টাকার হিসেব না দিয়ে আপনি চাকরি ছাড়লে লোকে আপনাকে বল্‌বে কি ?

চোর বল্‌বে। বাঙ্গালী জাতি কথায়-কথায় সবাইকে যা ব'লে থাকে ?

ঈশানী আবার হাসলো। তারপর বললে, দিল্লীতে এক সপ্তাহে আপনি প্রায় পনেরো হাজার টাকা পেয়েছেন, সে-হিসেব এখনও নিইনি।

এক্ষুণি নাও, আমি প্রস্তুত। কড়ায় গণ্ডায় সব বুঝিয়ে দিতে পারবো।—রমেনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছিলুম, তুমি আমার কাজকর্ম আর ভালো চোখে দেখতে পারছ না। তা বেশ, এই আমার কপালে ছিল। এবার আমাকে ছুটি দাও, ঈশানী।

ঈশানী বললে, নব্বই আর পনেরো,—এই এক লাখ পাঁচ হাজারের হিসেব বুঝিয়ে না দিয়ে আপনি কেমন ক'রে ছুটি নেবেন ?

তুমি কি তবে আমাকে পুলিসে দিতে চাও ?

মোটেই না, আপনি আমার পরম শ্রদ্ধেয়। আমি ওই টাকাটা সম্পূর্ণ পেতে চাই, কারণ সমস্ত টাকাই এই প্রতিষ্ঠানের। আপনি ত' জানেন, গত ছয় বছরে আমার উপার্জনের অধিকাংশ টাকা এই প্রতিষ্ঠানে আমি দিয়ে রেখেছি।

অস্থিরকণ্ঠে রমেনবাবু বললেন, তুমি ব্যবসা করতে বসেছিলে, না সঙ্গীত-নৃত্যের উন্নতি চেয়েছিলে ?

ঈশানী একটু হাসলো। তারপর বললে, ওসব বড় বড় কথা থাক্ ; কিন্তু আপনার সঙ্গে কি এই চুক্তি ছিল যে, টাকার হিসাব চাইলেই আপনি পদত্যাগের

ভয় দেখাবেন ? এই চুক্তি ছিল কি যে, এই প্রতিষ্ঠানের টাকা নিয়ে আপনার পঁচাত্তর বছরের দরিদ্র শ্বশুরের বেনামীতে ছত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি কিনবেন ? এই চুক্তি কি ছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানের টাকা নিয়ে আপনার স্ত্রী আর ছেলের নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমাবেন ?

ভীতকণ্ঠে রমেনবাবু বললেন, এ সব তুমি কোত্থেকে জানলে ?

আপনার আচরণের দ্বারাই আপনি জানিয়েছেন !—শুনুন রমেনবাবু, চাকরিতে ইস্তফা দিলে আপনার পক্ষে বড্ড বিপদ হবে। তার চেয়ে মাসখানেকের মধ্যে টাকাকড়িগুলো সমস্ত ব্যাঙ্কে আবার জমা ক'রে দিন, সেইটি আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।—ঈশানী উঠে দাঁড়ালো।

এটা কি তোমার আল্টিমেটম্ ব'লে মনে করবো ?

ফিরে দাঁড়িয়ে ঈশানী বললে, নিশ্চয়ই ! কাল আমাদের ব্যাঙ্কে ইন্‌ষ্ট্রাকসন পাঠাবো, এবার সমস্তই আমার নিজের হাতে নেবো। তবে আপনার নামে এই মর্মে শুধু পুলিসে একটা ডায়েরী রেখে দিতে চাই, যাতে তারা আপনার স্ত্রী-ছেলের একাউণ্টগুলো সীজ্ করে, এবং আপনার শ্বশুরের সম্পত্তিটা যাতে তছরূপ না হয় ! —এবার আমি যাই। হ্যাঁ, দিল্লীর দরুন সমস্ত টাকা কাল আমার একাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেবেন।

নিরুপায় কণ্ঠে রমেনবাবু বললেন, এই নব্বই হাজার টাকা সম্পূর্ণই কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ?

আবার ঈশানী ফিরে দাঁড়ালো। বললে, নিশ্চয়ই।

তুমি কি বলতে চাও, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমি পথে দাঁড়াবো ?

পথেই আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, আমিই আপনাকে ঘরে তুলে এনেছিলুম একদিন, রমেনবাবু। তা ছাড়া কেনই বা পথে দাঁড়াবেন, আপনার সাড়ে তিন শো টাকার চাকরি ত' রইলোই !

ষ্টিলের আলমারিতে সমস্ত কাগজপত্র সযত্নে রেখে বন্ধ ক'রে দিয়ে ঈশানী ভ্যানিটি ব্যাগে চাবি রাখলো, তারপর শান্তনুর বাণ্ডিলটা নিয়ে অগ্রসর হোলো দরজার দিকে।

হৃষেনবাবু করুণ কম্পিতকণ্ঠে বললেন, তুমি আমাকে এত বড় শাস্তি দিয়ে যেয়ো না, ঈশানী। আমি সইতে পারবো না।

ঈশানী থমকে দাঁড়ালো। বললে, নিঃস্বার্থ নিরপরাধকে আপনি লোকসমাজে কলঙ্কিত করবেন, অপমান আর অপবাদের আঘাতে তাদের বুক ভেঙ্গে দেবেন বিনাদোষে। কিন্তু নিজে এত বড় অপরাধ করবেন, এতখানি প্রতারণা করবেন, —এই বা আমি সইবো কেন বলুন ?

তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ঈশানী। তুমি মায়ের জাতি !

মায়ের জাতি ব'লেই ক্ষমা করতে চাই,—চাকরিতে আপনি বহাল থাকুন ; কিন্তু আমি নারীর জাতিও বটে,—সমস্ত ক্ষতিপূরণ আমি বুঝে নিতে চাই— ঈশানী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

১৩

শান্তনু বলতো, আমার সংস্কারে বাধে, সেই সংস্কার আমি কাটিয়ে উঠতে পারছিনে। আমার পিছনে রয়েছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য চেতনার একটা ছায়া, আমার পিতৃপুরুষের বিশ্বাসপরম্পরা,—সেই বিশ্বাস আর সেই নৈতিক চেতনা আমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করছে। আমার চিন্তা বুদ্ধি উপলব্ধি, আমার ধ্যান ধারণা, আমার প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত গতিবিধি আর খুঁটিনাটি তারা যেন বিচার করছে আমার ভিতরে ব'সে,—এই ভৌতিক বিশ্বাস থেকে মুক্তি না পেলে নিজকে নতুন যুগের মানুষ ব'লে ঠাওরাতে পারবো না। চেয়ে দেখছি সবই ভাঙ্গছে, কিন্তু যা ভঙ্গুর তাই ভাঙ্গছে,—যে সুপ্রাচীন সংস্কারের নীতি যুগ থেকে যুগান্তরে বারম্বার নিজের ভোল্ বদলে চ'লে এসেছে,—সে যে আজও অটুট, তাকে ভাঙ্গছে কে? সংস্কারের ধারাবাহিকতা মানি ব'লেই ত' অনেকগুলি ব্যক্তিকে পিতা বলিনে, কিংবা অনেকগুলি পুরুষকে একই সঙ্গে স্বামী বলিনে। ব্যভিচারকে কেন ঘৃণা করি? জননী যদি সন্তানকে পালন না ক'রে ভাসিয়ে দেয়, কেন বিপ্লব বাধে মনে? প্রতারণা করলে বিবেকে বাধে কেন? এ সব প্রশ্নের জবাব আধুনিক কালে পাওয়া যায় না। একজনের বউকে আরেকজন টেনে নিয়ে এলো, এতে যদি কেবলমাত্র একখানা ঘর ভেঙ্গে যেতো, এমন কিছু ক্ষতি হোতো না; একজনের বউ আরেকজনের স্বামীকে নিয়ে পালালো,—এতে হয়ত গোটা দুই পরিবার বিপন্ন হোতো। কিন্তু এই আচরণের দ্বারা যে বৃহত্তর সমাজের নৈতিক চেতনাটা আঘাত পায়,—সমগ্র আধুনিক সভ্যতার সমাজ-দর্শন তার জবাব দিতে পারলো কি? এই আচরণের দ্বারা আঘাত পাচ্ছে মানুষের সততা ও শান্তি, মানুষের কল্যাণ ও মহৎ চিন্তা, এবং মানুষের পারিবারিক জীবন এই আচরণের বিষবাষ্পে অশুচি হয়ে উঠেছে। আজ ভিক্টরকে বাদ দিয়ে ঈশানীকে

নিয়ে শান্তনু দাঁড়াবে কোন্ অধিকারে? ভিক্টরই হোলো ভবিষ্যৎ। আর বর্তমানের অলংযত সুখস্বপ্ন ভবিষ্যৎকে মলিন করবে কেন? দত্তচৌধুরী সুস্থ শরীরে জীবিত থাকতে তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে তঞ্চকতায় ভ'রে তুলবে কেন? দত্তচৌধুরীর আচরণে কোনো প্রতারণা ছিল না,—এ কথা শান্তনু জানে বৈ কি। শান্তনুর অভিমত হোলো এই, মাঝখানে কমলা যদি থাকে তবে থাক্, তাই ব'লে আপন সন্তানের জননীকে দত্তচৌধুরী কি বঞ্চিত করবে? লোকটা ত' কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়নি? ঈশানী কোন্ অধিকারে পিতার স্নেহের আশ্রয় থেকে ভিক্টরকে চিরদিন সরিয়ে রাখবে? কোন্ অধিকারে ঈশানী আপন গর্ভজাত সন্তানকে মাতৃ পরিচয় থেকে লুকিয়ে রাখবে? সংস্কারে আঘাত করে বৈ কি। শান্তনু বলে, ভালোবাসা অনেক বড় জিনিস, কিন্তু তার মধ্যে যদি পারিপার্শ্বিকের প্রতি কল্যাণবুদ্ধির কথা না থাকে, তবে সেই ভালোবাসা গুহাবাসী জন্তুর মত নিভৃতে গিয়ে নিজেকেই নিজের লালাসিক্ত জিহ্বায় লেহন করতে থাকে,—সভ্যসমাজে তার ঠাঁই নেই।

বিছানায় এপাশ ওপাশ ফিরে ঈশানী নিজের মনেই শান্তনুর কথা নিয়ে হাসছিল। বেলা দুটো বেজে গেছে। এমন সময় নন্দ এসে জানালো, শিলভিয়া এসেছে।

ঈশানী তাড়াতাড়ি উঠে এলো সোজা বারান্দার দিকে। শিলভিয়া সিঁড়ি পেরিয়ে এসে হাসিমুখে সম্ভাষণ করলো। তারপর বললে, একদম সময় নেই! যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম এতদিন সেখানকার মাটির তলা নড়বড় করছে আমাকে তিন দিনের মধ্যে চ'লে যেতে হবে।

ঈশানী তাকে ধ'রে বাইরের ঘরের নরম গদীআঁটা আসনে বসিয়ে পাখা খুলে দিল। পরে বললে, আমারও অনেক কথা আছে, অত তাড়াতাড়ি করলে চলবে না কিন্তু।

আঃ—শিলভিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলে বললে, সত্যি বলছি, তোমার কাছে এলে আমার বিলেত যেতেও ভাল লাগে না। আর তা ছাড়া কন্‌ভেণ্টে বসে খুব বড়মানষি করছি, বিলেত গেলে ঝি-গিরি ছাড়া আর কোন্ কাজ জুটবে?

ঈশানী বললে, তোমাকে যেতে বাধ্য করছে কে ?

ওয়াই।—শিলভিয়া বললে, তুমি ত' জানো আমার 'ডেডিকেশন্' নেই, সমস্ত ত্যাগ ক'রে ওখানে আত্মনিবেদন করিনি, বিলেত থেকে বাবাও মানা ক'রে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এতদিন ভিক্টরকে নিয়ে আমি দোটানায় পড়েছিলুম।

এখন কি ভিক্টরের টান কাটাতে চাইছ ?

শিলভিয়া হাসলো। বললে, কাটাতে পারলে ভালো হোতো, তুমি জব্দ হ'তে। কিন্তু এবার আমাকে বিদায় নিতেই হচ্ছে, আর কোনো উপায় নেই।

ঈশানী কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। মাঝখানে রামতীরথ এসে শিলভিয়াকে সেলাম ক'রে দু'পেয়ালা গরম কফি রেখে গেল। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শিলভিয়া ম্লানহাস্তে বললে, এ হয়ত ভালোই হোলো, ভিক্টর কাছে নেই, এইবেলা চ'লে যাবার সুবিধে। ভিক্টরের আকর্ষণ ভয়ানক বেশী, ঈশানী।

ঈশানী পেয়ালাটা তুলে নিল। বললে, ভিক্টর তোমাকে ছাড়া কারোকে ভালোবাসতে পারেনি, তুমি চ'লে গেলে যে আঘাত সে পাবে, তাতে সে মানুষ হয়ে উঠতে পারবে তুমি মনে করো ?

শিলভিয়া বললে, তা'কে তুমি যদি বিলেত পাঠাও, সেখানে আমিই তার ভার নেবো।

কিন্তু তুমি যদি বিয়ে করো, যদি তোমার ছেলেপুলে হয় ?

শিলভিয়া হাসলো আবার। বললে, এ তোমাদের দেশ নয়, ঈশানী। ভিক্টর সেখানে আমার প্রথম সন্তান হয়েই থাকবে। তবে তোমাকে একথা জানিয়ে রাখি, আজকাল বিলেতের মেয়েরা বিয়ে ক'রে সুখের ঘরকন্না পাতবার বিশেষ সুবিধে আর পায় না। তাদের কষ্টও করতে হয়, রোজগার করতে গিয়ে অনেক সময় মান খোয়াতেও হয়। ভারতবর্ষের সুখ বিলেতের সাধারণ মেয়ে এখন আর ভাবতেও পারে না!

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে শিলভিয়া সযত্নে একখানা চিঠি বা'র ক'রে ঈশানীর হাতে দিল। চিঠি লিখেছে ভিক্টর। শিলভিয়ার জন্যে সেখানে তার মন আর টি'কছে না। তবে কমলা এবং দত্তচৌধুরী চমৎকার লোক, তাদের মোটরে

ভিক্টর প্রচুর ঘুরে বেড়ায়। আমার একটি বোন আছে, তার নাম খুকু।' 'ভেরি লাভলি।' ওর বয়স পাঁচ বছর। আমি ওকে সেই ছবির বইটি দিয়েছি।

চিঠির শেষে ঈশানী শান্তনুর কথায় এসে পৌঁছলো। ভিক্টর লিখছে, মিষ্টার চৌধুরী প্রত্যেক তৃতীয় দিনে আমার কাছে আসেন। সেদিন আমার 'গ্যালা-ডে'। ওঁকে পেলে আর আমি কিচ্ছু চাইনে। কিন্তু উনি কোথায় থাকেন আমি জানিনে, উনিও বলেন না। এখানে একদিন 'রাঁগলে' বাঁশী বাজিয়ে উনি অনেক টাকা পেয়েছেন। তবে উনি শীঘ্রই কোন্ দেশে যেন যাচ্ছেন চাকরি নিয়ে। উনি ভীষণ জেদী লোক,.বুঝলে মাম্মি? আমি কবে যাবো, আমাকে ব'লে পাঠাও!

ঈশানী চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে বসলো। শিলভিয়া বললে, এ তোমার ভারি অন্যায়, ঈশানী। তুমি ঠিক হাল ধরতে পারোনি, তাই নৌকো ভেসে যাচ্ছে নিজের খেয়ালে। আমার বড় আশা ছিল, তোমাদের 'মধুচাঁদ' নিয়ে হাসি-তামাসা ক'রে যাবো, কিন্তু তোমার জন্যেই আমি বঞ্চিত হলুম।

শান্তনুর মনের কথাটা অস্পষ্ট নয়। প্রত্যেকটি স্নেহের ক্ষেত্র থেকে সে প্রশান্ত মনে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে এবং যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। ঈশানীকে সে জানালো না, কারণ সে নর্তকী,—জনসাধারণের হাততালির তরঙ্গে তার জীবন ভেসে যাক্।

ঈশানী বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে শিলভিয়ার দিকে তাকালো, তারপর ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলো তার দিল্লীবাসের আনুপূর্বিক কাহিনী। আগাগোড়া দত্ত-চৌধুরী ও কমলার কথা, রমেনবাবুর ইতিবৃত্ত। শান্তনুর মনোজগতের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম রহস্য,—তাও সে অকপটে ব'লে গেল। সে ব'লে চললো, বাধা বাইরে কোথাও নেই, বাধা হোলো মনে। উভয়ের সম্পর্ক এখানে সত্য, কিন্তু সেই সম্পর্কের উপরে দাঁড়িয়েছে বিচারবুদ্ধি। সুখের প্রলোভনকে এখানে বড় হ'তে দেওয়া হচ্ছে না। এখানে ত্যাগের দ্বারা মহৎ ভালোবাসাকে জয় করা হচ্ছে। দুটো জীবন পাশাপাশি এখানে শূন্য হয়ে থাক্, দুঃসহ বিচ্ছেদের অগ্নিআভায় সেই শূন্য জ্যোতির্ময় হোক।

শিলভিয়া ছলছল চোখে ঈশানীর প্রতি চেয়ে রইলো। এক সময় বললে: তোমার কি সন্দেহ হয় যে, দত্তচৌধুরী তোমাকে গ্রহণ করলে শান্তনু খুশী হয় ?

ঈশানী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, এ আলোচনাও আমার কাছে ঘৃণ্য শিলভিয়া, অথচ এই কথা নিয়েই শান্তনুর সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। ছেলেমানুষ হোলো শান্তনু, একথা সে বোঝে না যে, মেয়েমানুষের কাছে সমাজনীতির চেয়ে প্রাণের নীতি অনেক বড়। ভালোবাসার জন্যে মেয়েমানুষ যে সংসারের সব ভালো জিনিস অত্যন্ত অবহেলায় ত্যাগ ক'রে যায়, একথা শান্তনুকে বোঝানো যায় না।

শিলভিয়া বললে, এ রকম কোনো সমস্যাই আমাদের দেশে নেই, সে জন্য এ নিয়ে আমাদের মনে কথাও ওঠে না। কিন্তু তুমি এখন কি করবে ভাবছো ?

ঈশানী বললে, আমার চারদিকে সমস্যার ভীড়, জানিনে এর থেকে মুক্তি কোন্ দিকে। এর ওপর তুমি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছো তোমার ছেলেটিকে নিয়ে। তবু যে দুদিন তুমি আছো, তোমাকে আমার সমস্যায় আর ভারাক্রান্ত করতে চাইনে, শিলভিয়া। শুধু একটা কথা আমাকে বলো, ভারতবর্ষ ছেড়ে না গেলেই কি তোমার চলবে না ?

শিলভিয়া বললে, আঠারো বছরের বেশি আছি এই কলকাতায়। মা মারা গেলেন, কত ঝড়ঝাপটা ব'য়ে গেল এদেশের ওপর দিয়ে, বাবা চ'লে গেলেন বিলেতে, আমি তবু নড়িনি। এ দেশকে ভালোবাসি ব'লেই আছি। কিন্তু ওরা আমাকে আর থাকতে দেবে না। প্রথমত 'আত্মোৎসর্গ' করিনি, দ্বিতীয়ত— তোমাকে বলতে বাধা নেই, ভিক্টরের সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতিত্ব ওরা পছন্দ করলো না। ওরা দয়া বোঝে, স্নেহ-ভালোবাসা বোঝে না। তাই আমাকে চ'লে যেতে হচ্ছে।

শেষের কথাটা ঈশানী চমৎকৃত হয়ে শুনলো। কফির পেয়ালাটা শেষ ক'রে সে বললে, তুমি যদি ভিক্টরের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে এদেশেই 'সিটিজেনশিপ' নিয়ে থেকে যাও, তোমার আপত্তি আছে কিছু ?

শিলভিয়া বললে, কোন্ অবলম্বন নিয়ে থাকবো? আমি তোমার, কাঁধে চড়বো না, এ তুমি নিশ্চয় জানো।

জানি বৈ কি শিলভিয়া, তোমার নিজের গৌরব নিয়েই তুমি থাকবে। এ কথা তুমিও জানো, যে-ঋণ তোমার কাছে আমার আছে, সমস্ত জীবন দিয়েও সে-ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। সাহেববাগানের সেই বাড়ীতে সেই দুর্দিনে তোমার দেখা না পেলে আমার জীবন কি ধ্বংস হয়ে যেতো না? শোনো, আমার একটি অনুরোধ রাখো, কোথাও তুমি যেয়ো না। কন্‌ভেণ্ট থেকে বেরিয়ে তুমি দিল্লী চ'লে যাও, সেখানে ভিক্টরকে নিয়ে একটা থাকার বন্দোবস্ত করো। আমার বিশ্বাস, তুমি গিয়ে দাঁড়ালে শান্তনু তোমাদের সব গুছিয়ে দেবে। ওখানে বেশ ভালো ইস্কুলে পড়বে ভিক্টর, তুমি তার সব দায়িত্ব নেবে! আর খরচপত্রের কথা? কন্‌ভেণ্টে টাকা না দিয়ে তোমার হাতেই দেবো?

শিলভিয়া বললে, তুমি কি করবে?

আমি!—ঈশানী বললে, আমার ভাসমান জীবন ভেসেই বেড়াবে! তবে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের নাচগানের স্কুল যেভাবে চলছে, এভাবে বেশিদিন আর নয়। বোধ হয় ওর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনেও একটা বড় রকমের অদল-বদল আসতে পারে।

শিলভিয়া বললে, সেটা কি ধরনের?

ঠিক বলা কঠিন। কিন্তু রমেনবাবু শেষ পর্যন্ত কি প্রকার ব্যবস্থা করেন, এটা না জানলে বলতে পারবো না।

শিলভিয়া কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর একটু হাসলো। বললে, দত্তচৌধুরীর কথাটা ভেবে ভারি মজা লাগছে। লোকটা তোমাকে একেবারেই চিনতে পারেনি, কি বলো?

ঈশানী বললে, চিনতেও পারেনি, সন্দেহও করেনি। আমার মুখখানা ছিল রং করা, তার ওপর মাথায় মুকুট, পরনে ঘাগরা! কিন্তু ওর মধ্যে শান্তনুর দুষ্টুমি ছিল। ফন্দি ক'রে ও এনেছে লোকটাকে আমার সামনে, আমার ভাবান্তর দেখার জন্যে। কিন্তু অত পরিশ্রমের পর হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি জ্ঞান

্যারাই ? শান্তনু বাঁশী বাজিয়ে জানিয়ে দিল, ওটাই নাকি আমার প্রেমের লক্ষণ। এমনি দুষ্ট শান্তনু।

শিলভিয়া প্রশ্ন করলো, কমলা কিংবা ভিক্টর কিছু জানে ?

বিন্দুমাত্রও না।

দত্তচৌধুরী ?

ঈশানী খুব হাসলো। বললে, স্বপ্নেও সন্দেহ করে না। তুমি, আমি আর শান্তনু—এ ছাড়া দুনিয়ায় কেউ জানে না।

তুমি কি ভাবছো, সব কথা প্রকাশ করবে একদিন ?

আমার কোনো স্বার্থ থাকলে করতুম বৈ কি!—ঈশানী বললে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো উদ্বেগ আমার নেই। লোকটাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম, যেন নতুন আবিষ্কার। দশ বছর আগে লোকটা আমাকে সেই পড়োবাড়ীর ভগ্নস্তূপের পাশে গিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিল, সে যেন স্বপ্নের কাহিনী,—বিন্দুমাত্র সত্য যেন তার মধ্যে নেই !

শিলভিয়া বললে, এ রকম মনোভাব তোমার হোলো কেন ? শান্তনুকে পেয়েছ ব'লে ?

ঈশানী বললে, না শিলভিয়া, এর মধ্যে ভালোবাসাটাই যে ছিল না, তাই দেহের আঁচড় মনে হ'লেই গা ঘিন ঘিন করে ! তা ছাড়া তুমি ভেবে দেখো, ঝড় এসে সেদিন আমার সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিল ! বাবাকে খুন করলো, পিসিমা জলে ডুবলো, বাড়ীতে আগুন ধরালো। চারদিকে দুর্ভিক্ষ আর অরাজকতা। সেই বিপ্লবের মধ্যে প'ড়ে একটা ক্লাস টেন্-এর মেয়ের সমস্তটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল !

শিলভিয়া বললে, কিন্তু লোকে যে বলে, জীবনের প্রথম রোমান্স কেউ ভোলে না ?

ওটা ত' রোমান্স নয়, শিলভিয়া ? ওটা অপঘাত, যাকে বলে দুর্ঘটনা ! অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে খানায় প'ড়ে যাওয়া। মনের মধ্যে কোনো চেতনা জন্মাবার আগে কোনো শিশুর মা ম'রে যায়, তবে সেই শিশুর শোক হয় না।

অভাবের জন্ত সে কাঁদে, অভাব মিটলে সব ভুলে যায়। সেদিন দত্তচৌধুরী কোনো রোমান্স রেখে গেল না,—শুধু ঘৃণা রেখে গেল আমার আপাদমস্তক। অজ্ঞানকৃত বীভৎস নোংরামির মধ্যে যেন আমার নতুন জন্ম হোলো। তোমাদের ওখানে যখন এসে পৌছলুম, তখন কেবল কোনোমতে বাঁচবার কথাটাই মনে ছিল। তারপর পড়াশুনো করেছি অনেক, নাচ-গান শিখে পাঁচটা লোকের সাহায্যে একটা প্রতিষ্ঠানও গড়েছি, অবস্থাও ফিরেছে অনেকটা, অভাবও তেমন কিছু নেই। কিন্তু আজ শান্তনু যখন সামনে এসে দাঁড়ালো,—তখন মনে হচ্ছে, এ জীবনে আরেকটা অর্থ আছে, আরেকটা আনন্দ আছে, আমি সেটায় বঞ্চিত। আমার বিশ্বাস, জীবনে এই প্রথম পুরুষ দেখলুম! একথা তুমি জানো, অসংযমের মধ্যে যার জীবন আরম্ভ, পরবর্তী কালে সংযমের শ্রী দেখলে সে সহজে মুগ্ধ হয়। শান্তনুর নির্লোভ সংযমের মধ্যে আমি দেখলুম তার প্রাণরশ্মির উত্তাপ, যে তুষার আমার মধ্যে জমে-জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, সেই বরফ গ'লে স্রোতস্বিনী হয়ে নামছে। মিলনের কথা এখানে বড় নয়, শিলভিয়া—কিন্তু শান্তনুকে পাবার জন্যে যদি বাকি জীবন আমাকে কাঁদতেও হয়, তাতেও আমার আনন্দ!

ঈশানীর চোখ দুটো আবার ঝাপসা হয়ে এলো। বেলা গড়িয়ে এসেছিল, শিলভিয়া এবার ছুটি নিতে চাইলো। ঈশানী কলিং বেল বাজিয়ে নন্দকে ডাকলো, এবং ব'লে দিল তেওয়ারীকে গাড়ী বা'র করতে।

শিলভিয়া বললে, আজকের রাতটা তোমার প্রস্তাব নিয়ে ভাবতে দাও। কাল সকালে গির্জা ফেরত তোমার কথার জবাব দেবো। তবে ভিক্টরকে আজই আমি চিঠি পাঠাচ্ছি।

দু'জনে উঠে এলো বাইরে। বিদায় নিয়ে শিলভিয়া নীচে নেমে গেল।

শিলভিয়ার গাড়ী বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো। ঈশানী এসে রিসিভার কানে তুলতেই রমেনবাবুর সাড়া পাওয়া গেল। ঈশানী বললে, হ্যাঁ আমি।—

রমেনবাবু বললেন, তোমার দাবী যদি মেটাতে হয়, তবে আমাকে সর্বস্বান্ত হ'তে হবে, ঈশানী।

ঈশানী বললে, এ সব আমার বিবেচনা করার কথা নয়, রমেনবাবু।

তুমি কি পুলিসে ডায়েরী লিখিয়েছ আমার সম্বন্ধে ?

এ আলোচনাও এখন থাক।

কতদিন তুমি আমাকে সময় দিতে পারো ?

আমার বিশ্বাস, পুলিসকে আমি মাসখানেক থামিয়ে রাখতে পারবো!

রমেনবাবু বললেন, আমার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান, ঈশানী।

ঈশানী বললে, বেশ ত', আনন্দের কথা। তবে আপনি সম্পূর্ণ টাকা শোধ ক'রে দিলে তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করার স্থবিধে হবে, তার আগে নয়।

রমেনবাবু বললেন, তুমি যদি অনুমতি করো তাহ'লে আমি একবার দিল্লী গিয়ে শান্তনুবাবুকে তোমার ওখানে ডেকে আনতে পারি।

কেন ? শান্তনুবাবু এর মধ্যে আসবেন কি জন্যে ?

রমেনবাবু সঠিক জবাব দিতে পারলেন না। ঈশানী বললে, আমার অনুরোধ, আপনি কোনো নোংরা কৌশলে যাবেন না। বরং সময় নষ্ট না ক'রে আপনি বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা পান। এবার ছেড়ে দিচ্ছি,—নমস্কার।

রিসিভার রেখে ঈশানী কতক্ষণ সেখানে ব'সে রইলো, তারপর আবার ফোন তুলে নম্বর দিয়ে ডাকলো পুলিসের থানায়,—মিত্র সাহেব আছেন ? ঈশানী রায় বলছি।

মিত্র সাহেব ফোন ধরলেন। ঈশানী নমস্কার জানিয়ে বললে, ব্যাঙ্ক একাউন্ট সীজ্ করেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রলোককে এখন হয়রান করবেন না। উনি এক মাসের সময় নিয়েছেন। এক বুড়ির কাছে সস্তায় সম্পত্তি কিনেছেন খবর পেলুম। ওটা বেচলে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা হবে। আমার বিশ্বাস, আপনারা হুমকি দিলে সব টাকাই উনি ফেরত দেবেন।

মিত্র বললেন, কিন্তু এত বড় একজন জালিয়াৎকে আপনি ছেড়ে দিতে চান

ঈশানী বললে, পুলিসও ত' ঘুষ খায়, মিষ্টার মিত্র? লোভ থেকেই ত' অসাধুতা আসে।

টেলিফোনের দুই পার থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল।

পরদিন যথাসময়ে শিলভিয়া ফোন করলো। বললে, ঈশানী, তোমার প্রস্তাব আমি পুরোপুরি এখন মেনে নিতে অসুবিধা বোধ করছি! কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিনে, কারণ দিলেই সেটা পালন করতে হবে। তবে তোমার প্রস্তাবমতো দিল্লী যেতে আমি প্রস্তুত হচ্ছি। কিছুদিন ভিক্টরকে নিয়ে দেখা-শোনা করবো।

ঈশানী বললে, তোমার কোনো সিদ্ধান্তের ওপর আমি কখনও কথা বলিনি, শিলভিয়া। ভিক্টর তোমার ছেলে, আমার নয়! তুমি তার অভিভাবক, তার সব ভালো-মন্দ তোমার হাতে। সুতরাং তুমি দিল্লী যেতে চাচ্ছ, এ আনন্দের কথা। আমি জানি, তোমার মানসিক সংগ্রাম! তুমি যাকে ছেড়ে পালাতে চাচ্ছ, সে তোমার সব পথ অবরোধ করছে। তোমার সব পথ খোলা, কিন্তু মনের মধ্যে মুক্তি নেই।—যাই হোক, যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আগের দিন তুমি আমার এখানে আসবে, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো। টাকাকড়িও সব প্রস্তুত থাকবে!

আচ্ছা।—ব'লে শিলভিয়া ফোন ছেড়ে দিল।

প্লেন-এ যেতে শিলভিয়া রাজি হোলো না। তাড়া ত' কিছু নেই, ধীরে-সুস্থে যাবে। তা ছাড়া ভিক্টরের অনেক জিনিসপত্র, তার খেলনার আসবাব, তার লাইব্রেরী, তার পোষাক-পরিচ্ছদ,—তা'র যত রকমের সংগ্রহ। শিলভিয়া বোধ হয় সাত জন্মে কারো মা হয়নি, এ জন্মে পেয়ে গেছে ভিক্টরকে। যতদূর মনে হচ্ছে, পরের বোঝা বইবার জন্যই ওর জন্ম। শিলভিয়া ইংরেজ জাতির মান রেখেছে। ঈশানী তার জন্য সব গুছিয়ে দিয়ে ট্রেনের বার্থ রিজার্ভ ক'রে দিল। কনভেন্টের চলতি পোষাক শিলভিয়াকে ছাড়তে হোলো। ঈশানী তাকে উপহার দিল এক জোড়া ভালো গাউন, এক জোড়া জুতো, একটি নরম চামড়ার সুটকেস এবং টয়লেটের বাক্স। নিজের আঙুলের হীরের আংটি খুলে

শিলভিয়ার আঙুলে পরিয়ে দিল। শিলভিয়া হাসিমুখে বললে, বুঝেছি তোমার মতলব, এ সব আমাকে দেওয়া হচ্ছে ঘটকালির বকশিস!

ঈশানী তার গাল টিপে আদর ক'রে বললে, পোড়ারমুখী, তুই যদি আমার সতীন হতিস তাহ'লে দুঃখ ছিল না!

ভিক্টরের কাছে চিঠি ও টেলিগ্রাম আগেই চ'লে গেছে। সুতরাং ওদিকটা নিশ্চিন্ত। শান্তনুর সুটকেসটা ঈশানী দিল শিলভিয়ার সঙ্গে, চিঠি একখানা দিল সুটকেসের মধ্যে। অতঃপর শিলভিয়াকে গাড়ীতে নিয়ে ঈশানী হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো।

কিন্তু তার নিজের মুক্তির পথটা কই? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সে প্রকাণ্ড জাল বিস্তার করেছে, তার থেকে বা'র হবার পথ নেই। ফ্ল্যাট ভরা তার আসবাব, নিজের মোটর, অত বড় এক প্রতিষ্ঠান,—বৈষয়িক জীবনের অসংখ্য বন্ধন, এতগুলি লোকজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। এর উপরে শান্তনু, ভিক্টর, শিলভিয়া! এদের উপরেও তার নিজের প্রাণসমস্যা।

ঈশানীর বন্ধনজর্জর মন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অস্থির হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শ্রাবণের বর্ষা পেরিয়ে গেল তার চোখের উপর দিয়ে। ধীরে ধীরে আকাশে ফুটলো ঘন নীলাভা, ছিন্ন মেঘের দল শ্বেত উত্তরীয় উড়িয়ে ভেসে চললো মানস সরোবরের দিকে। শরৎ এসে পৌঁছলো।

শিলভিয়ার চিঠি এসেছে দিল্লী থেকে যথাসময়ে। হোটেল থেকে সে একটি ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছে। ভিক্টর ভালো স্কুলে ভর্তি হয়েছে। দত্তচৌধুরী আর কমলা এর মধ্যে এসেছেন দু'একবার। অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও শান্তনু এখানে থাকেনি, তবে সে প্রায়ই আসে ভিক্টরকে দেখতে। শিলভিয়া লিখেছে, কলকাতায় ফিরে যেতে শান্তনুর বিশেষ উৎসাহ দেখিনে। মুস্কিল এই, আমার কোনো কথার জবাব দিতে সে অত্যন্ত লজ্জা পায়। সেদিন সে আমাদের এখানে ব'সে গুটিপোকা আর মৌমাছির চাষ সম্বন্ধে মস্ত বক্তৃতা দিয়ে গেল। বুঝতে পারলুম, তার মনটা এখন বন-জঙ্গলের দিকে, কোনো মানুষের

দিকে নয়। শান্তনু তার অমায়িক এবং মধুর আচরণে আমাকে মুগ্ধ ক'রে গেছে। তোমার কথা তুলে তাকে প্রশ্ন করলেই সে খুব হাসে। বলে, উনি ত' নাচ-গান নিয়েই জীবন কাটাবেন, উনি হলেন জনসাধারণের হিরোইন। গুটিপোকা আর মৌমাছি নিয়ে উনি মাথা ঘামাবেন কেন? তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের আরও উন্নতি হোক, এইটি শান্তনুর একমাত্র কাম্য। তোমার সুটকেস ও চিঠি সে নিয়ে গেছে, কিন্তু তার ঠিকানা সে আমার কাছে বলতে ইচ্ছুক নয়। ভিক্টর পর্যন্ত জানে না।

গুটিপোকা কেমন!—ঈশানী মাঠের ধারে তার গাড়ীখানা রেখে অনেক দূর যেতে যেতে ভাবে। গুটিপোকার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে ফেনার মতো। ওরই সাহায্যে নিজের চারদিকে সে নিজেরই অবরোধ রচনা করে। সেই অবরোধের মধ্যেই তার সমস্ত জীবনযাত্রার সীমা, তারই মধ্যে তার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। আপন মৃত্যুর দ্বারা অবশেষে আপনারই ঐশ্বর্য রচনা ক'রে যায়।

ঈশানী হাঁটতে হাঁটতে ঘোরে দূর থেকে দূরে। এক সময়ে ক্লান্ত পা টেনে টেনে আবার ফিরে এসে গাড়ীতে উঠে নিজেই চালায়। সন্দেহ নেই, নিজের চতুর্দিকে নিজেই সে মৃত্যু রচনা করেছে। এর চেয়ে মৌমাছি ভালো বৈ কি। মধু সংগ্রহ করে সে নিজের জন্য। মক্ষীরাণী থাকে ঠিক মাঝখানে, তাকে ঘিরে যত মধুসঞ্চয়। তারপর কবে যেন দেখা দেবে ভরা শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না, তখন মৌমাছির দল সমস্ত মধু পান ক'রে উড়ে যাবে দূর থেকে দূরে আপন মদমত্ততায়!

কোন্‌টা ভালো ঈশানী বোঝে না। গাড়ীখানা নিয়ে সে ঘোরে এপথ থেকে ওপথে, এক অঞ্চল থেকে ভিন্ন অঞ্চলে। কিন্তু নিজের কাছে এ দাসত্ব চলবে তার কতদিন। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর সম্ভারে তার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত। নিজের হাতে এতদিন ধ'রে সে যা রচনা করেছে, এ সব কি তার একান্তই কাম্য ছিল? তার মধ্যে যে-অধীর প্রাণ, যে-অস্থির প্রতিভা সৃজনচাঞ্চল্যের নেশায় একটির পর একটি বস্তু রচনা ক'রে এসেছে এতদিন, তার এই গুরুভার বোঝা কেমন ক'রে সে বহন করবে? প্রস্ফীত তরঙ্গ আপনার ভারে কি আপনি চুরমার হয়ে যায় না? রূপ, স্বাস্থ্য, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি—যা কিছু তার কাম্য

ছিল, সমস্ত পাবার পরেও কেন তার এমন ভয়াবহ শূন্য মনে হচ্ছে? সমস্ত কাম্যবস্তু লাভের পরেও কেন তার এই প্রশ্ন ওঠে, কাম্যবস্তুর বাইরেও প'ড়ে আছে একটা বড় জীবন,—একটা মহৎ কিছু,—যেটার পরম আস্বাদ আজও তার জানা নেই।

গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে সে বাড়ী ফিরে এলো। চোখ দুটো জ্বালা করছিল, আঁচল দিয়ে মুছে সে উপরে উঠে গেল। বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে আসবার পথে সে দেখলো একজন চাপরাশি তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে সেলাম জানিয়ে চাপরাশি একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা এসেছে এটর্নীর বাড়ী থেকে। ঈশানী খুশী হয়ে বললে, আচ্ছা, তুমি যাও।

লোকটা চ'লে যাবার পর ঈশানী ঘরে এসে শান্তনুর পাঠানো সেই বাণ্ডিলটা খুলে অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপরে খুললো আলমারি, এবং দু'তিনটে ড্রয়ার। তার ভিতর থেকে বার করলো অনেক-গুলো দলিলপত্রের বাণ্ডিল এবং বহুপ্রকার চুক্তিপত্র। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে যখন সমস্তগুলো গুছিয়ে তুলছে, সেই সময়ে বাইরের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো! রামতীরথ এসে জানালো, রমেনবাবু।

ঈশানী উঠে গিয়ে রিসিভার ধরলো। রমেনবাবু ফোনে বললেন, প্রায় এক মাসের চেষ্টায় টাকা আমি যোগাড় করেছি, কিন্তু সে টাকা আমি নিজে গিয়ে তোমার হাতে তুলে দিতে চাই।

ঈশানী একটুখানি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। বললে, আমার হাতে দেবার এই আগ্রহ কেন আপনার? আপনি সোজা ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিন।

রমেনবাবু মিনতি ক'রে বললেন, পুলিস আমাকে আজ তিন সপ্তাহ ধ'রে হয়রান করছে। তোমার টাকা তোমার হাতে দিতে পারলেই ওদের কাছে আমার মান রক্ষে হয়।

বেশ আপনি অপেক্ষা করুন, আমি এখনই যাচ্ছি। তবে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাঙ্কে জমা দেবেন, আমি উপস্থিত থাকবো।

রিসিভার রেখে দিয়ে ঈশানী এ ঘরে এলো, এবং মিনিট দশেকের মধ্যে

সমস্ত কাগজপত্র এবং ফাইলগুলি একটির পর একটি গুছিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। ফটকের সামনে তেওয়ারী গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত ছিল।

বেলা দুটো বাজে। এ রকম সময়ে ওদের প্রতিষ্ঠানের চাকর-বাকর ছাড়া আর বিশেষ কেউ থাকে না। শুধু আপিস ঘরে থাকেন নান্টুবাবু আর রমেনবাবু। ঈশানী সোজা উপরে উঠে এসে আপিস ঘরে ঢুকতেই রমেনবাবু শান্তভাবে বললেন, তোমার কাছে অকপটে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করছি, ঈশানী। কিন্তু—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও আমি তোমার টাকার একটা মোটা অংশ যোগাড় করতে পারিনি।

ঈশানী মুখ ফিরিয়ে তাকালো। রমেনবাবুর চোখ দুটো রাঙা,—বুঝতে পারা যায় বহু বিনিদ্র রাত্রি তাঁকে অত্যন্ত উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে।

তিনি বললেন, লোভে প'ড়ে ছেলে তিনটের নামে বর্ধমানের ওদিকে একটা সম্পত্তি কিনেছিলুম হাজার পঁচিশেক টাকার,—বাগান, বাড়ী, পুকুর আর খানিকটা ধানজমি নিয়ে সম্পত্তি। কিন্তু তার পেছনে যে দু' তিনটে মামলা ঝুলছিল, তাড়াতাড়িতে সেটা বুঝতে পারিনি। ঈশানী, সেই সম্পত্তির সমস্ত কাগজপত্র তুমি নিয়ে আমাকে রেহাই দাও, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা। আমি জানি এ প্রার্থনা জানালে পুলিস আমাকে ক্ষমা করবে না, কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ আবেদন।

রমেনবাবুর চোখে জল এল। পুনরায় তিনি বললেন, গেল কাল মোট পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আমি আমার একাউণ্টে জমা দিয়েছি, সেই টাকার ওপরেই তোমাকে মোট পঁয়ষট্টি হাজার টাকার চেক্ দিচ্ছি, তুমি আমাকে মুক্তি দাও, ঈশানী।

ঈশানী চুপ ক'রে সমস্তটা অনুধাবন করলো। তারপর শুধু বললে, ব্যাপারটা পুলিস আর এটর্নীর বাড়ী পর্যন্ত যখন গেছে, তখন নিজের হাতে আর চেক্ আমি নেবো না। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

পোষমানা জন্তুর মতো ঈশানীর পিছনে পিছনে রমেনবাবু সেই চেকটি নিয়ে অগ্রসর হলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পুনরায় বললেন, ঈশানী, তুমি

জানো, আমি ছা-পোষা লোক, পুলিস যদি কোনো ছুতোয় আমাকে গারদে টেনে নিয়ে যায়, তাহ'লে গেরস্থটা একেবারে শুকিয়ে মরবে।

ঈশানী কেবল বললে, আসুন, আমি ত' সঙ্গেই রইলুম।

তুমি ভরসা দিচ্ছ?

হ্যাঁ, আসুন।

ওরা দুজন এসে গাড়ীতে উঠলো। তেওয়ারীর পাশে ব'সে রয়েছে আর একটি লোক। ঈশানী কেবল বললে, উনি থানা থেকে এসেছেন, পুলিসের লোক। আপনার সঙ্গে মিটমাটটা উনি দেখে-শুনে রিপোর্ট নিতে চান্। কেসটা খারাপ কিনা!

রমেনবাবু কেবল কাঠ হয়ে ব'সে রইলেন।

এরপর আনুপূর্বিক খুঁটিনাটিগুলো অত্যন্ত জটিল। ঘণ্টা তিনেক লাগলো সমস্ত ব্যাপার মিটতে। ঈশানী এই সঙ্গে তার নিজের কাজগুলোও মিটিয়ে নিল। কাগজপত্রাদি এটর্নী আপিসেই প্রস্তুত ছিল। ওদের প্রতিষ্ঠান ট্রাষ্টিতে পরিণত হয়ে গেল। লভ্যাংশের এক-চতুর্থাংশ প্রতি বছরে শান্তনু চৌধুরী পাবে—যেখানেই সে থাক্। ঈশানী তার সমস্ত টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের সমস্ত স্বার্থ শান্তনুর নামে স্বেচ্ছায় দান ক'রে দিল। শান্তনুর একাউণ্টে জমা পড়লো অনেক টাকা।

রমেনবাবু শিউরে উঠলেন বৈ কি। এটর্নী তাকালেন ঈশানীর দিকে। মেয়েটা জাত আর্টিষ্ট কিনা, তাই এমন ভয়ানক খেয়ালী! প্রতিভা কখনও চল্‌তি ধারণার পথ ধ'রে চলে না। রমেনবাবুর প্রতি বক্রদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে এটর্নী মিষ্টার বাসু বললেন, আপনিও হাজার পঁচিশেক টাকার সম্পত্তি পেলেন বটে, তবে সেটি উদ্ধার করতে হয়ত লাগবে হাজার পঞ্চাশেক টাকা।

রমেনবাবুর গলা শুকিয়ে উঠেছিল।

প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টির মধ্যে রইলেন এই এটর্নী, এবং রমেনবাবুও তাঁর অভিশপ্ত চাকরিতে বহাল রইলেন। তাঁর সামনেই আজ অশরীরী শান্তনু লক্ষপতি হয়ে গেল। স্বয়ং এটর্নী ঈশানীকে দিয়ে সর্বপ্রকার সই-সাবুদ করিয়ে নিলেন।

কাল সকালে সমস্তটা রেজেষ্টারী হবে, এবং শান্তনু যেখানেই থাক,—কাল সকালে সে অতুল সম্পদের অধিকারী হবে। শান্তনুর আশ্রিত রইল তিনটি প্রাণী,—ঈশানী, ভিক্টর এবং শিলভিয়া। ওই আপিসে ব'সেই ঈশানী আরেকবার শান্তনুর সেই কাগজপত্রগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি ক'রে ফেলে দিল। আজ সে বাঁচলো। সম্পূর্ণ রিক্ত হবার উল্লাসে ঈশানীর মন যেন নেচে উঠছিল।

আপিসের ভিতরে এক কোণে ব'সে একটি লোক এতক্ষণ যেন উসখুস করছিল। এবার সে উঠে এসে হাসিমুখে ঈশানীকে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ালো,—আমাকে চিনতে পারেন? সেই মিহিজামে—।

ঈশানী সহাস্যে বললে, পারি বৈ কি, আপনি ত শান্তনুর দাদা! যাক্, আপনাকে দেখে ভারি আনন্দ হোলো। বৌদিদিকে বলবেন, শান্তনুবাবু এখন মস্ত বড়লোক। তিনি দিল্লীতে থাকেন এখন।

এই এত টাকা আপনি তাকে দিলেন?

ঈশানী হাসলো। বললে, মোটেই না। এ সমস্ত তারই টাকা, আমার কাছে গচ্ছিত ছিল! যাক্গে, আপনি যে এখানে?

গলা পরিষ্কার ক'রে ভদ্রলোক বললে, আমি এই এটর্নীর আপিসে চাকরি করি!

তাহ'লে ভালোই হলো। ছোট ভাইয়ের ফাইলটা বেশ যত্ন ক'রে রাখবেন, এই অনুরোধ রইলো। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কর্তব্য পালন করবেন।

দাদা একেবারে স্তব্ধ। ঈশানীরা বিদায় নিয়ে উঠলো। পুলিসের ভদ্রলোকটি এখান থেকেই বিদায় নিলেন। গাড়ীতে ওঠবার আগে রমেনবাবু বললেন,—শান্তনুকে সর্বস্ব দিয়ে গেলে, আজ থেকে তোমার কেমন ক'রে চলবে, ঈশানী?

ঈশানী সহাস্যে বললে, একমুঠো অন্ন কি শান্তনু আমাকে দেবে না?

১৪

কান্না পাচ্ছিল ঈশানীর। কিন্তু তার ধারণা, এই যে অবাধ্য চোখের জল—এ কান্না সুখের। নিবিড় সুখ বোধ হয় বেদনারই মতো। পার্থক্যটা সূক্ষ্ম। সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরকে পাবার জন্য বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে চোখের জল নিয়ে। অনুরাগের আনন্দ আর বিচ্ছেদের বেদনা—দুই মিলে অশ্রু। সব পেয়েছিল ঈশানী আপন প্রতিভার শক্তিতে, কিন্তু তবু ব'সে ব'সে তাকে হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে হোলো। যা পেয়েছে তা অল্প, অল্পে তার সুখ নেই। শিশুকে ভোলানো হয়েছিল খেল্‌না দিয়ে,—শিশু আবদার ধরলে সেই আনন্দের খেলনাগুলোকেই লাথি মেরে সরিয়ে দেয়!

ঈশানী তার বড় সাধের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রগুলো নিলাম ব্যবসায়ীকে ডেকে বিক্রি ক'রে দিল। দুঃখ কিছু নেই, কেন না প্রতি সামগ্রীর আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি প্রশ্ন,—কেন! কেন এই আড়ম্বর? কেন এই সম্ভোগ? কেন চারদিকে এই জঞ্জাল জড়ো ক'রে মাথা ছাপিয়ে তোলা? এরা বাহ্যিক অলঙ্কার, এরা প্রসাধন, এরা অঙ্গাবরণ,—কিন্তু দেহটার মধ্যে প্রাণ কই? মন্দির নির্মাণ করেছ অভ্রভেদী বিরাট, চূড়ায় তার শত সহস্র মণিমাণিক্যের সমাবেশ,—ভিতরে নারায়ণ কই? ঈশানীর সমস্তটা ছিল দৈহিক, সমস্তটাই তার যৌবন-বিলাস,—কিন্তু অন্তর্যামী রয়ে গেল নিত্য উপবাসী। অহঙ্কার ছিল ব'লেই অলঙ্কার ছিল, আত্মাভিমান ছিল ব'লেই আসবাবপত্র ছিল ঘরভরা, বস্তুর অভাব ছিল ব'লেই বাস্তবের এত বাহুল্য,—আজ তার আপন স্বরূপ সম্পূর্ণ নিরাবরণ হোক। আজ নিঃস্ব না হ'লে নিজেকে আর চেনা যাবে না। নিজেকে চেনা, কিন্তু নিজকে চেনানোও বটে। আমি প্রকাশ করি, কিংবা প্রকাশিত হই,—কোন্‌টা? একটির পর একটি আবরণ চড়িয়েছে ঈশানী, কিন্তু সে নিজে কোথায়?

কোথায় সে হারালো? আজ সব পেয়েও সে কাঁদছে কেন? এমন অবারিত স্বাধীনতার মধ্যেও বাঁধনে কেন তার জরোজরো মন? বনস্পতির মতো চারদিকে সে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, কিন্তু তার মর্মমূলে প্রাণরস কই? সুখের অজস্র উপকরণের ভারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আনন্দ ম'রে গেছে,—এর খোঁজ কি সে নিয়েছিল?

একটি বিস্ময় থেকে গেছে বরাবর। ঈশানীর পারিবারিক জীবনে কেউ কোথাও নেই। আত্মীয় বলতে কেউ কোনোদিন ছিল না, স্বজনকুটুম্বের সাক্ষাত মেলেনি এ জীবনে। ফুলকাঠির পুরনো জমিদারগোষ্ঠীর একটি তৃণফলকও কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। সুতরাং এক শিলভিয়া ছাড়া বন্ধু বলতে কোথাও কারোকে সে পায়নি। নিজেকে নিয়েই সে থেকেছে, নিজের জন্যেই ভেবেছে, এবং নিজের ওপরেই সে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য ঈশানী যখন আজকে তার ঘরকন্নার পাট তুলে দিতে চাইছে, তখন কোথাও তার টান পড়ছে না, কোনোদিক থেকে তার প্রতিবাদ উঠছে না, বাধা দিচ্ছে না কেউ। তার সমস্ত খেয়াল-খুশি নিয়ে একা সে দাঁড়িয়ে।

বাহুল্য সামগ্রীগুলি সে যখন নন্দ, রামতীরথ, বুড়ি-ঝি এবং তেওয়ারীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে বসেছে, সেই সময়ে কোনো একদিন অপরাহ্নের দিকে নন্দ এসে জানালো, একটি ভদ্রলোক জনৈক মহিলাকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। যেমন-তেমন একখানা শাড়ী জড়িয়ে ঈশানী বসেছিল তার রান্নাবান্নার মহলে। কোনও প্রকার সজ্জা পারিপাট্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সে একটু কৌতূহল নিয়েই বারান্দার দিকে বেরিয়ে এলো।

একটি তরুণী মেয়ে তাকে দেখেই নমস্কার ক'রে বললে, আমাকে চিনতে পারেন?

ঈশানী সহাস্যে বললে, কেন চিনবো না? তুমি সুষমা! এসো ভাই।

সুষমা বললে, ইনি আমার স্বামী ধীরেন সেন।

স্বামী শুনেই ঈশানী একবার তাকালো। নমস্কার বিনিময় হয়ে গেল। একটি কাঠের বেঞ্চে তিনজনেই গিয়ে বসলো। সুষমা এদিক-ওদিক

াকিয়ে বললে, আপনি কি এ বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন? জিনিসপত্র কোথাও খছিনে?

ঈশানী হাসলো। বললে, হ্যাঁ ভাই, এ খেলার পাট তুলে দিলুম। বেশ, ারি খুশী হলুম সুষমা, তুমি বিয়ে করেছ। চাকরি আছে ত'?

সুষমা হাসিমুখে বললে, হ্যাঁ, আছে। এ চাকরি ত' আপনারই অনুগ্রহে। নেক দিন ধ'রেই আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে। আপনার কাছেই আমার বচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা!

ধীরেন বললে, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। তবে এঁর কাছে ায়ই আপনার সুখ্যাতি শুনি। আমরা দু'জন একই আপিসে চাকরি করি।

সুষমা বললে, আপনি এ বাড়ী ছেড়ে কোন্ ঠিকানায় যাচ্ছেন, ঈশানীদি?

ঈশানী বললে, জিনিসপত্র সরিয়ে দিলুম, কিন্তু বাড়ী কবে ছাড়বো তার খনও ঠিক নেই। এই চ'লে যাচ্ছে আর কি! যাই হোক্, তোমার কথা বলো, বার তুমি বেশ আনন্দে আছ ত'?

সুষমা বললে, আনন্দে আছি, সেও আপনারই কল্যাণে। সেই দুঃসময়ে াপনি সাহায্য না করলে আমার দাঁড়াবার কোনো উপায় ছিল না।

ঈশানী বললে, সাহায্য হয়ত কেউ না কেউ করেই, তবে তুমি দাঁড়িয়েছ তোমার যোগ্যতার ওপরে। তোমার কৃতিত্ব সেইখানে।

ধীরেন বললে, ওঁর মাইনেও কিছু বেড়েছে।

খুব আনন্দের কথা। আমার কি মনে হয় জানো, সুষমা?—ঈশানী বললে, সব চেয়ে কম পেয়ে যে-ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আনন্দে থাকে, সেই সুখী।

চুপ ক'রে গেল স্বামী-স্ত্রী। একসময়ে সুষমা বললে, কই, শান্তনুদাকে এখানে দেখছিনে ত'?

শান্তনুর আলোচনাটা সুষমা তুলবে না, ঈশানীর এই ধারণা হচ্ছিল। কিন্তু তার উল্লেখ শুনে এবার ঈশানী বললে, তিনি ত' এখানকার মানুষ নন, কেমন ক'রে দেখবে?

কোথায় আছেন তিনি? কি করছেন আজকাল?

কি করছেন তিনি ঠিক জানিনে, তবে দিল্লীতে আছেন।

সুষমা বললে, যদি কখনও আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, আমাদের নমস্কার জানাবেন। আচ্ছা, এবার আমরা উঠি।

ঈশানী বললে, এর মধ্যেই উঠবে?

ধীরেন বললে, আজ ছুটির বার, সেই জন্যে কয়েকটি জায়গায় যাবো ব'লে স্থির ক'রে বেরিয়েছি।

সুষমা বললে, সব প্রথমে এসেছি আপনার এখানে।

মিষ্ট হাস্যে ঈশানী বললে, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা—

ধীরেনের সঙ্গে সুষমা উঠলো। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এলো ঈশানী। ওরা পুনরায় সহাস্য নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। রাস্তায় নেমে স্বামী-স্ত্রীতে বলাবলি করলো, চমৎকার দেখতে, না? সুষমা সোৎসাহে বললে, শান্তনু চৌধুরীকে দেখাতে পারলুম না। সেও খুব চমৎকার দেখতে! কিন্তু এমন নির্বিকার লোক দেখা যায় না।

মনের কথাগুলো মনেই চাপা র'য়ে গেল বৈ কি।

ওদের বিদায় দিয়ে এসে ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো। আর কিছু নয়, বেঁচে গেছে মেয়েটা যে, শান্তনুর হাতে পড়েনি। সুষমা বিয়ে করার জন্য জন্মেছিল, কিন্তু শান্তনু ঘরকন্না করার জন্য জন্মায়নি। প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি শান্তনুর কাছে অপরিচিত। তার সমগ্র এলোমেলো ইতিহাসের মাঝখানে যদি সহসা এক সিন্দুরশোভিত মেয়ে এসে বসতো, শান্তনু সইতে পারতো না সেই বন্দীদশা। বাঁধনের গন্ধ পেলেই শান্তনুর মধ্যে বিপ্লব বাধে। সে বশ্যতা বোঝে, দাসত্ব বোঝে না। যাওয়া-আসার পথ খোলা যদি না থাকে, তবে সে ভালোবাসারও ধার ধারে না। তাকে ডাকলে পাবে, কিন্তু টেনে ধ'রে রাখতে গেলেই সে পালাবে। স্বচ্ছন্দ অবারিত মুক্তি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তার মন আকৃষ্ট নয়।

সেই জন্য ঈশানী এতদিন অবধি তার যোগ্য হয়ে ওঠেনি। নিজের কাছে সত্য হবার জন্য ঈশানীকে সংগ্রাম করতে হয়েছে নিঃশব্দে। ঈশানীর অনেক

াছে,—তবু আসল বস্তুর থেকে সে বাঞ্চিত। কিন্তু ঋতুরাজ এসে দাঁড়ায়, তুমি থন সম্পূর্ণ রিক্ত। তোমার নিঃশেষ নগ্নতার উপরে সে তার বাসন্তী উত্তরীয়ের াবরণ টেনে দেয়। সর্বস্ব হারাবার ভয় যেন মনে না থাকে, কেন না সে আসছে রিপূর্ণতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ঈশানীর মনে আজ কোনো খেদ নেই, কোনো ববাদে সে আচ্ছন্ন নয়। একটির পর একটি শূন্যঘরে পরিপূর্ণ আনন্দে সে ঘুরে বড়াতে লাগলো। কেউ বুঝবে না, কেন সে রিক্ত হচ্ছে। তাকে দাঁড়াতে বে সহজ সত্য স্বরূপকে নিয়ে। সামনে পিছনে কোনো পরিচয় তার থাকবে না, স দাঁড়াবে একটি পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির মতো। জীবনের বৃন্তে ফুটে উঠেছে একটি উর্ধ্বমুখী শতদল, প্রার্থনাটা তার সূর্যের দিকে। ওই তার একমাত্র আগ্নেয় াসনা, হে সূর্য, তুমি আমার মধ্যে প্রতিভাত হও। আমার মধ্যে তেজ আনো, তাপ আনো, প্রাণ আনো,—আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও, তোমার মধ্যে আমি বিলীন হই!

রাত্রির পর রাত্রি ঈশানী আপন বিহ্বল বাসনা নিয়ে ঝরঝরিয়ে কাঁদলো। এ কান্নার সাক্ষী কেউ নেই। ওই জনসাধারণ, যাদের সুলভ প্রশস্তির রসতরঙ্গে ভেসেছিল সে, ওরা কেউ দেখলো না এ কান্না। সাজঘরে ব'সে যারা ওর চন্দ্রবদনে রং মাখিয়ে চতুর সজ্জা পারিপাট্যের সঙ্গে লোভনীয় ইঙ্গিত চড়িয়ে ওকে নাচের আসরে পাঠিয়েছিল,—আজ এই নিভৃত রাত্রির একাকিনী কান্নার পাশে তারা কেউ নেই। ওর ওই অশ্রুর বিহ্বলতার সঙ্গে মিলে গেছে পরম বেদনা মাধুর্য, নিবিড় দুঃখের অসহনীয় রোমাঞ্চ। ও চাইছে একটা প্রবলতর যন্ত্রণা,—যেটা ওকে বিদীর্ণ করবে, যার মহৎ বিস্ফোরণে ওর সমগ্র সত্তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে চারদিকে। সেই পরম সর্বনাশের মধ্যে ও চাইছে একান্ত আত্মবিলোপ।

শূন্যঘরের দরিদ্র শয্যায় প'ড়ে ঈশানী ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কিছুদিন পরে শিলভিয়ার সর্বশেষ চিঠি এলো। টাকা পেয়ে সে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছে, তুমি যে আমার দিকটা স্নেহের সঙ্গে বিবেচনা করেছ এজন্য

ধন্যবাদ। কিছুদিনের জন্য বিলেত না গেলে আমার চলছে না। যদি ভারতবর্ষে আমাকে স্থায়ীভাবে থাকতে হয় তাহ'লে সেখান থেকে 'ডাডির' সম্মতি নিয়ে আসবো। ভিক্টর আমার সঙ্গে যাচ্ছে, সেজন্য তুমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হোয়ো না,—আমি তাকে একটি দিনের জন্যও কাছছাড়া করবো না। আমার সঙ্গে যাবে ব'লে ভিক্টর আনন্দে নাচছে। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়বে সতেরোই তারিখে। তবে আমরা আগামী দশ তারিখে এখান থেকে বোম্বাই রওনা হবো। ভিক্টর বিলেতে যাচ্ছে শুনে শান্তনু খুবই বিমর্ষ। সেদিন সে একরাশি পোষাক-পরিচ্ছদ এনে ভিক্টরকে উপহার দিয়ে আদর ক'রে গেল। পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীন বালকের প্রতি শান্তনুর এই পিতৃপ্রতিম ব্যবহার দেখলে যে-কোনো লোক অভিভূত হয়। তুমি নিজের কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত মনে হচ্ছে। বিলেত যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে বেশ আনন্দ হোতো। বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে আমরা দিন চারেকের জন্য উঠবো। শান্তনু মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নৈনিতালের দিকে গিয়েছিল তার নতুন চাকরি উপলক্ষে। সেখানেই সে থাকবে। আমরা বোম্বাই রওনা হয়ে গেলে শান্তনু আবার চ'লে যাবে।

সেদিন রামতীরথ, বুড়ি-ঝি এবং তেওয়ারী বিদায় নিল। ওরা পেয়ে গেল অনেক কাপড়-চোপড় এবং তৈজসপত্রাদি। ওর ওপর প্রত্যেকে ছয় মাসের বেতন বকশিস। আশার অতিরিক্ত ওরা পেলো ব'লেই কৃতজ্ঞতায় ওদের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। ওরা বিদায় নিয়ে গেল ভারাক্রান্ত মনে। বাকি রইলে নন্দ, সে যাবে সব শেষে। এ বাড়ীর সুখ বুঝি নন্দরও সইলো না।

দিদিমণির আহারাদি দেখলে নন্দর চোখে জল আসে। বাজার থেকে তাকে কলাপাতা কিনে আনতে হয়েছে। মেঝের উপর ব'সে দিদিমণি কলাপাতায় ভাত খায় সামান্য এটা ওটা দিয়ে। টেলিফোনটা কোম্পানীর লোক এসে নিয়ে গেছে, দিদিমণিকে আর কেউ ডাকে না। উপরের মহলে প্রত্যেকটি ঘর শূন্য কেবল কাপড়জামা-কাগজপত্র সমেত আছে একটি পোর্টমাণ্টো। এ বাড়ী শীঘ্রই দিদিমণি ছেড়ে যাবে, কিন্তু কোথায় যাবে তার কোনো হদিস নন্দ জানে না

রান্নাবান্না নন্দ শেখেনি কোনোদিন, কিন্তু সে যা কিছু সিদ্ধপক্ক ক'রে দেয়, অম্লানবদনে দিদিমণি তাই মুখে তোলে। রুচি অরুচি ব'লে কিছু নেই।

ঈশানী সেদিন গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল সকাল বেলায়, কিন্তু সে যখন ফিরে এলো তখন অপরাহ্ণ। নিজের গাড়ীর বদলে ঈশানী এলো ট্যাক্সিতে। ভাড়া চুকিয়ে সে যখন ভিতরে আসছিল, দেখলো সেই বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ভদ্রোলোকটিকে ঘিরে দু'তিনজন মহিলা উড়ানীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন। সিঁড়িতে ওঠবার আগে ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো। একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে হাত তুলে বললে, নমস্তে রাজরতনজী, ফিন ক্যা কুচ খবর মিলা ?

জি।—ব'লে মেয়েটি এগিয়ে এলো। অশ্রুগলিত চক্ষে বললে, তুমি ত' জানো আমার স্বামী গত কয়েকমাস যাবৎ কঠিন রোগে ভুগছিলেন, তাঁকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। আমার মা-বাবা তাঁকে দেখা-শোনা করছিলেন। একটু আগে টেলিগ্রাম এসেছে, তাঁর বাঁচার আশা কম।

ঈশানী বললে, তুমি আজই চ'লে যাও।

হ্যাঁ, আজকের রাত্রের মেলেই যাবো, কিন্তু পরশু সকালের আগে পৌঁছতে পারবো না। তাঁকে দেখার আশা দুরাশা, বহিনজী।

ঈশানী বললে, তুমি ত' প্লেনে যেতে পারো, রাজরতন !

রাজরতন বললে, চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু টিকিট পাওয়া যায়নি। ওকে দেখা আর আমার কপালে নেই।

মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

চুপ ক'রে দাঁড়ালো ঈশানী একবার। তারপর বললে, আচ্ছা, একটু সবুর করো, আমি আসছি।

উপরের বারান্দায় নন্দ সামনেই দাঁড়িয়েছিল, ঈশানী ছুটতে ছুটতে এসে বললে, নন্দ, এ সব গুছিয়ে নে, একটু বাদেই আমি চলে যাবো। গাড়ীখানা আমি বিক্রি ক'রে এলুম রে। বাড়ীওয়ালাকে খবর দিয়েছি, আজই এ ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছি। তুই অনেক করেছিস নন্দ, আমার জন্যে। তোর কথা ভুলবো না কোনোদিন।

হঠাৎ নন্দ কেঁদে ফেললো। তারপর ঈশানীর পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে বললে, আপনি সব ছেড়ে কোথায় চললেন জানিনে। কিন্তু আমাকে আপনি সঙ্গে নিন্, আপনার পায়ে পড়ি। আমার আর কেউ নেই।

ঈশানী বললে, চুপ, চুপ, তুই না পুরুষ মানুষ? অমনি ক'রে কাঁদে? আমি যাচ্ছি দিল্লীতে,—কিন্তু তোকে ত' আমার দরকার নেই, নন্দ?

নন্দর কান্না থামলো না। বললে, আপনি আমার মা-বাপ। আমি মাইনে চাইনে, কিচ্ছু চাইনে। শুধু আপনার পায়ের কাছে থাকতে চাই। আমি ছ' বছর আপনার কাছে আছি, আমাকে পায়ে ঠেলবেন না।

ঈশানী চিন্তিত হয়ে বললে, আমি যে ভেবেছিলুম, রাত্রে প্লেনে উঠে তোকে দমদমা থেকে ছুটি দেবো। তুই যে কান্নাকাটি করবি, এ ত' ভাবিনি, নন্দ!

ঈশানী চুপ ক'রে একবার দাঁড়ালো। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। তারপর বললে, তাহ'লে গোছগাছ ক'রে নে। এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে হবে। আমি আসছি—

দিল্লী যাবার কথা শুনে নন্দ চোখের জল মুছে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ছোটবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হবে, এ আনন্দ তার কম নয়।

ঈশানী নীচে এসে রাজরতনদের ঘরে ঢুকলো। সেই বৃদ্ধ এবং মেয়েরা অভ্যর্থনা ক'রে তাকে বারান্দায় বসালো। ঈশানী বললে, আপনারা ত' জানেন আজ থেকে আমার ফ্ল্যাট আমি ছেড়ে যাচ্ছি। আজই রাত্রে প্লেনে আমার দিল্লী যাবার কথা, সেখানে তিন চারদিনের কাজ সেরে আবার যাবো অন্যদিকে। দুপুরবেলা আমি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি দিল্লীতে, তাঁরা হয়ত বিমান-ঘাঁটিতে আমাকে নিতেও আসবেন। তবে আপনাদের যদি সুবিধা হয়, আমার টিকিটখানা নিয়ে রাজরতন আজ প্লেনে দিল্লী যেতে পারে, আমি না হয় ট্রেনেই যাবো।

বৃদ্ধ সহসা আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, মা, তোমার এই উপকারের জন্য আমাদের গুরু তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

ঈশানী বললে, সদারাজ, রাজরতনকে কিন্তু বেনামী হয়ে বেআইনীভাবে যেতে হবে। আমার নামে সীট্ বুক্ করা আছে। অবিশ্যি আজকাল কেউ কেউ এ রকম করে শুনতে পাই—

বৃদ্ধ বললেন, বিপদে পড়লে এ রকম না ক'রে উপায় নেই, মা। আমরা কারোকে ঠকাচ্ছিনে, শুধু একটু অদল-বদল হয়ে যাচ্ছে মাত্র। তোমার এই উপকার আমাদের পরিবার চিরকাল মনে রাখবে। রাজরতন আমার পুত্রবধূ, আর এঁরা হলেন আমাদের দেশের লোক। আমরা কারবারের সূত্রে এখানে থাকি, রাজরতন আমার সেবা করে। আমার ছেলে যদি বাঁচে, রাজরতন চিরদিন তোমার গোলাম হয়ে থাকবে, মা।

বৃদ্ধ চোখের জল মুছলেন। রাজরতন ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। ঈশানী তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে প্লেনের টিকিটখানা খামসুদ্ধ বা'র ক'রে দিল এবং ওরাও বা'র ক'রে দিল দিল্লী-কাল্কা মেল-এর বার্থ রিসার্ভ করা টিকিটখানা। রাজরতন আনন্দে অধীর হ'য়ে ঈশানীকে সাশ্রুনেত্রে জড়িয়ে ধ'রে তার অসীম কৃতজ্ঞতা জানালো। ঈশানী ব'লে দিল, দমদমা থেকে প্লেন্ ছাড়বে রাত দশটার পর। তুমি বাঙ্গালীর পোষাক প'রে যেয়ো, রাজরতন। আমিও তোমার মতো শালোয়ার আর উড়ানী নিয়ে যাবো।

ঈশানী উপরে এসে তার একখানা ভালো শাড়ী আর জামা নন্দকে দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দিল, এবং তার অল্পক্ষণ পরেই রাজরতন নিজে এসে শিখনারীর একটি সজ্জা দিয়ে গেল ঈশানীর হাতে। পোষাকের বৈচিত্র্যে জাতি পরিবর্তন চেনা যায়। শালোয়ার, পাঞ্জাবী আর ঘোমটা ঢাকা উড়ানী চড়িয়ে অভিনব চেহারায় ঈশানী সন্ধ্যার সময় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোলো, এবং পাজামা ও টুপিপরা নন্দ সঙের নাচ নাচতে-নাচতে গিয়ে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনলো।

নীচে নামতেই বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে আরেকবার বিদায় আশীর্বাদ জানালেন। ঈশানী নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। ট্যাক্সি চললো হাওড়া ষ্টেশনে।

* * * *

আগের দিন সন্ধ্যায় জরুরী টেলিগ্রামখানা শিলভিয়া পেয়েছিল। টেলিগ্রামের

উদ্বিগ্ন ভাষা প'ড়ে তার মুখে হাসি আর ধরে না। শান্তনুকে দেখবার জন্য সে ছটফট করতে লাগলো, কিন্তু পোড়াকপালী ঈশানীর ভাগ্যে এমনই প্রণয়ী জুটেছে যে, তার ভাবভঙ্গীর মধ্যে যেন ষ্টিল-ফ্রেমে আঁটা সংযমটাই চোখে পড়ে। নিরুদ্বেগে শান্তনুর দেখাও পাওয়া যায়নি আজ দিনতিনেক। কে জানে, ছোকরা হয়ত এ যাত্রায় ভিক্টরের সঙ্গে শেষবার দেখা না ক'রেই নৈনীতালের পথে পাড়ি দেবে।

আনন্দে শিলভিয়া ছুটে এলো ভিক্টরের ঘরে। ভিক্টর তখন সবেমাত্র বেড়িয়ে এসে তার বইখাতা নিয়ে পড়তে বসেছে। শিলভিয়া সেই তারবার্তাটি ভিক্টরকে দেখিয়ে সোৎসাহে বললে, তোমার আনন্দ হচ্ছে না ?

হচ্ছে ত'।—ভিক্টর তার উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়ে যেন একটু কুণ্ঠিত হোলো। বললে, কিন্তু মাম্মি এসে আমাদের বিলেতে যেতে দেবে ত' ?

নিশ্চয়ই দেবে, ভিক্টর। তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, মাম্মি তোমাকে কত ভালোবাসে।

ভিক্টরের খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। শুধু বললে, বাসলেই বা !

শিলভিয়া উত্তেজিত হয়ে বললে, Why can't you imagine she is your real mother ?

ভিক্টর হেসে ফেললো। বললে, It matters very little, mummy।

ভিক্টরের নিশ্চিত ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে শিলভিয়াও হেসে ফেললো। শুধু বললে, impossible boy you are. তুমি জানো মাম্মি আমাদের সমস্ত খরচ দিচ্ছে ?

বা, দেবে না কেন ? অনেক টাকা আছে ত'।

শিলভিয়া থমকে দাঁড়িয়ে ভিক্টরের স্বভাব-সারল্যের দিকে একবার তাকালে তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠে শিলভিয়া একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বিমান-ঘাটিতে গিয়ে হাজির হোলো। দিল্লীতে শরৎকাল আকাশে বাতাসে তার মাধুর্য বিস্তার করেছে। স্নিগ্ধ বাতাস প্রভাতের দিকে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ট্যাক্সি মোতায়েন রেখে এনক্লোজারের ভেতরে ঢুকে শিলভিয়া লক্ষ্য করলো, এখানে ওখানে কেমন যেন ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন ভাব, কোনো কোনো স্ত্রীলোক কান্না জুড়েছে। কোথাও কোথাও লোকজনের জটলা। শিলভিয়া ভীতমুখে গিয়ে জনৈক অফিসারকে ধরলো,—ব্যাপার কি বলুন ত' ?

তিনি বললেন, নাগপুর থেকে উঠতে গিয়ে নাইট্ প্লেন প'ড়ে গেছে! দিল্লীর দিকে ষ্টার্ট নিয়েছিল।

ব্যাকুলকণ্ঠে শিলভিয়া ব'লে উঠলো, তারপর।

অফিসার ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, কেউ বাঁচেনি। পেট্রল ট্যাঙ্কে আগুন লেগে গিয়েছিল। Bodies beyond recognition!

শিলভিয়া ছুটে গিয়ে প্রভাতের প্রথম সংবাদপত্রখানায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো। খবরটা এর মধ্যে ছাপা হয়ে গেছে। দুর্ঘটনা ঘটে রাত তখন প্রায় তিনটে। মৃত ব্যক্তিগণের নামের তালিকায় যথারীতি ঈশানী রায়ের নাম ছাপা হয়েছে!

অনেকক্ষণ অচেতনভাবে কাগজখানার ওপর চোখ রেখে এক সময় শিলভিয়া বাইরের দিকে তাকালো। নিজের মনেই সে ঘাড় নাড়লো। না, বিলেত থেকে তারা আর ফিরবে না। ভারতবর্ষের আকাশ বড় বিশ্বাসঘাতক!

কান্নার রোল উঠেছে সর্বত্র। সাহেব মেমরা কাঁদছে, মাড়োয়ারী ভাটিয়া দক্ষিণী পাঞ্জাবী—সবাই কাঁদছে। কিন্তু একটি প্রাণীর জন্য এখানে কাঁদবার কেউ নেই। একটি বাঙ্গালী নেই যে, বাঙ্গালীর জন্য কাঁদবে।

ঈশানীর ভাগ্যবিপর্যস্ত জীবনের যবনিকাপাত ঘটলো কোনো এক অন্ধকার বনচ্ছায়াতলে। মেয়েটা জ্বলে-পু'ড়ে ম'রে গেল।

এলোমেলোভাবে খানিকটা এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি ক'রে অবশেষে এক কোণে গিয়ে ব'সে শিলভিয়া কতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে চোখের জল ফেলতে লাগলো। কিন্তু কান্নার কৈফিয়ৎ কেউ চাইলে তার পক্ষে জবাব দেওয়া কঠিন হোতো। অনেকগুলি ইউরোপীয় মেয়েপুরুষ এখানে ওখানে ছুটোছুটি করছে। পাছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ এগিয়ে এসে হঠাৎ তাকে কোনো প্রশ্ন করে, এজন্য শিলভিয়া এক সময় আবার উঠে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চললো।

বাড়ী ফিরতে শিলভিয়ার কিছু দেরি হোলো। একখণ্ড পাথর যেন গড়াতে গড়াতে এসে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। কি করবে, কি ভাববে, কাকে বলবে—কিচ্ছু বুঝতে না পেরে সে স্তব্ধভাবে এক জায়গায় ব'সে রইলো। ঈশানীর সঙ্গে তা'র প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে সমস্ত ছবিগুলো একে একে তার চোখের সামনে দিয়ে স'রে যেতে লাগলো।

ভিক্টর সামনে এসে দাঁড়ালো। শিলভিয়ার হাতের কাছে খবরের কাগজখানা খোলা,—শিলভিয়ার চোখ বেয়ে অশ্রু নামছে।

মাম্মি!

শিলভিয়া মুখ তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঈশানীর খবরটি ভিক্টরকে বুঝিয়ে দিল। ভিক্টর চুপ ক'রে রইলো,—কিন্তু শিলভিয়ার চোখে এই প্রথম দরদর ধারায় অশ্রু দেখে ভিক্টরের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। দু'পা এগিয়ে সে শিলভিয়ার পিছন দিকে দাঁড়ালো, এবং পিছন দিক থেকে রুমাল বাড়িয়ে শিলভিয়ার চোখ মোছাতে গিয়ে নিজেই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো শিলভিয়ার পিঠের পাশে।

আন্দাজ বেলা এগারোটার সময় শান্তনু এসে শিলভিয়ার সামনে দাঁড়ালো। কিন্তু মুখ তুলে শান্তনুর রাঙা চোখের দিকে তাকাবামাত্রই শিলভিয়া আর স্থির থাকতে পারলো না, ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ থুবড়ে ডুকরে ডুকরে সে কাঁদতে লাগলো। একটু আগে ভিক্টর স্কুলে চ'লে গেছে।

দেওয়াল ধরে শান্তনু কতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে সে চুপ ক'রে গিয়ে বসলো একস্থানে। খবরটি সে ভোর বেলাতেই পেয়েছে। গাড়ী নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল বিমান-ঘাঁটিতে। সেখানে শেষ সংবাদ পাওয়া গেল এই যে, প্রত্যেকটি যাত্রীর দেহ একেবারে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে গেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যও বোঝা যায়নি। দিল্লীতে ঈশানী খ্যাতিলাভ করেছিল, সুতরাং কোনো কোনো কাগজে নৃত্যরতা ঈশানীর ফটোও ছাপা হয়ে গেছে। অতঃপর অনেক চেষ্টা ক'রে শান্তনু রমেনবাবুকে ট্রাঙ্ক কল্‌-এ ধরতে পারে। অসীম বিরক্তি সহকারে রমেনবাবু বলেন, হাঁ, মৃত্যুসংবাদ সত্য। তবে কিছুদিন আগে এ ঘটনা ঘটলে

তিনি আর সপরিবারে পথে বসতেন না! যাই হোক, ঈশানী সব জিনিসপত্র বেচে, এমন কি গাড়ীখানাও বিক্রি ক'রে তার এ জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, সমস্তই শান্তনুর নামে ব্যাঙ্কে রেখে গেছে। রাজকন্যাটাকে শান্তনু পেলো না বটে, তবে রাজত্বটা যখন আলটপকা পেয়ে গেল,—আরেকটি উৎকৃষ্টতর রাজকন্যা অবশ্যই জুটবে। তবে আর যাই করো ভাই, অসতী মেয়েকে নিয়ে যেন কারবার করো না! ভূতের নাচ নেচে গেল আমাদের কাঁধের ওপর।

ছয় মিনিটের মধ্যে গলগল ক'রে রমেনবাবু রিসিভারের গর্তটার মধ্যে মারাত্মক গরল উদ্‌গার ক'রে দিলেন। তবু ওরই মধ্যে শান্তকণ্ঠে শান্তনু একবার সমস্ত অবস্থাটা জানবার জন্য বললে, আমাকে সে ভারাক্রান্ত ক'রে গেল বটে, কিন্তু আপনাকে কি কিছুই দিয়ে যেতে পারলো না?

টেলিফোনের কড়কড়ে আওয়াজের ভিতর দিয়ে কেবল শোনা গেল, হ্যাঁ, আমাকেও হাজার পঁচিশেক টাকার সম্পত্তি দান ক'রে গেছে বটে, তবে সেই সম্পত্তি ভোগ করতে গেলে যে হাজার পঞ্চাশেক টাকা মামলায় খরচ করতে হবে, সেটা অবিশ্যি দিয়ে যাবার সময় সে পেলো না! তুমি যখন ট্রাষ্টির একজন মেম্বার হিসেবে কলকাতায় এসে দাঁড়াবে, ওই সম্পত্তিটি তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি গঙ্গাস্নান করবো।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে শান্তনু সোজা এসেছে শিলভিয়ার এখানে। ঈশানী নিজের ইতিহাস নিজেই মুছে দিয়ে চ'লে গেছে।

অন্তিম মুহূর্তগুলির ছবির দিকে শান্তনুর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। হয়ত অন্ধকার কোনো বনময় প্রান্তর। লেলিহান শিখায় সেখানে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। একটা ধাতব সিন্ধুকের মধ্যে প'ড়ে জীবন্ত ঈশানী অগ্নিদাহনের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। অগ্নিশ্বাসে রুদ্ধ হচ্ছে সেই কণ্ঠ, অঙ্গারে পরিণত হচ্ছে সেই তনুলতা, তারপর দেখতে দেখতে সমস্ত যন্ত্রণা আগুনের আবরণে শান্ত হয়ে এলো! মৃত্যু সমস্তটা লেহন ক'রে নিল!

মুখ তুলে তাকালো শান্তনু কতক্ষণ পরে। শিলভিয়া যেন কখন এসে ব'সে রয়েছে চেয়ারখানায়, অন্যমনস্ক সে লক্ষ্য করেনি। ভাবনাটা ছোলো

পুরুষের, কান্নাটা মেয়ের। পুরুষ কাঁদে আপন অন্তরে, সাক্ষী তার কেউ থাকে না।

প্রথমে শিলভিয়াই কথা বললে।—কিছু ভেবে উঠতে পাচ্ছিনে, চৌধুরী,—কিন্তু জাহাজের সীট্ কি বাতিল করা সম্ভব হবে?

গলাটা পরিষ্কার ক'রে শান্তনু বললে, তোমরা কি যাবে না ভাবছো?

শিলভিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বললে, এর পর কি ভিক্টরকে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত হবে?

কিন্তু ভিক্টরের শেষ অবলম্বন তুমি! তোমাকে ছেড়ে সে থাকবে কেন?

আমি আর ভারতবর্ষে ফিরতে চাইনে, চৌধুরী।—শিলভিয়ার অবাধ্য চোখে আবার জল এলো।

নতমুখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো শান্তনু। একসময়ে সে নতমুখেই বললে, ভিক্টরের সমস্ত ভার তুমিই নাও, শিলভিয়া,—ও ছেলে তোমারই, তুমি ওর প্রকৃত মা। তবে আমার একটা অনুরোধ আমি জানিয়ে রাখি—

শান্তনুকে বার বার গলা পরিষ্কার করতে হচ্ছিল। সে আবার বললে, ছেলেমানুষের মতন ঈশানী আমার ঘাড়ে যে টাকার বোঝা চাপিয়ে গেছে, সে বোঝা আমার নয়,—ভিক্টরের। তোমরা যাবার আগে সেই বোঝার থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে যাও, শিলভিয়া।

শিলভিয়া বললে, তার অন্তিম ইচ্ছা তুমি পালন করবে না, এ কেমন ক'রে সম্ভব, চৌধুরী? আমি তাকে জানতুম। সে তার নাম, পরিচয়, আত্মাভিমান,—সমস্ত মুছে দিয়ে তোমারই কাছে ছুটে আসছিল, তোমার কাছে সত্য হয়ে ওঠার জন্যই সে প্রাণপণে সংগ্রাম করছিল,—তোমার কাছে তার শেষ মিনতি আমি ছাড়া আর কেউ জানে না, চৌধুরী! সে তার জীবনকালে তোমার অনেক অবহেলা স'য়ে গেছে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর এ অবিচার কেন তুমি করবে?

শান্তনু তার আপন হৃৎপিণ্ডের আর্তস্বর সংযত করলো। কিন্তু উত্তপ্ত কম্পিত কণ্ঠ তার ওষ্ঠাধর বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে এলো,—তাই ব'লে সেই প্রেতিনীর অভিসম্পাত চিরদিন আমি ব'য়ে বেড়াবো, শিলভিয়া? সে আমা[illegible]

প্রশ্নের শেষ জবাব দেব ব'লেই আমি প্রতীক্ষা করছিলুম, কিন্তু সে যে এসে পৌঁছতে পারলো না সে কি আমার অপরাধ ?

গলাটা তার ধ'রে এলো ব'লেই শিলভিয়ার জবাবটা তার শোনা হোলো না। শান্তনু উঠে দাঁড়ালো। আরপর সংযত কণ্ঠে বললে, আমার উত্তেজনা ক্ষমা করো, শিলভিয়া। অন্য কোনো সময়ে এসে আমার সিদ্ধান্ত তোমাকে জানিয়ে যাবো। এখন আমি যাই—

শিলভিয়া প্রশ্ন করলো, তোমার নতুন চাকরিস্থলে কবে নাগাৎ যাবে ?

শান্তনু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, শীঘ্রই যাবার কথা, কেন না সেখানে কোয়ার্টার তৈরী হয়ে গেছে। তবে এরপর আমার গতিবিধি সঠিক বলা কঠিন। অবশ্য তোমাদের ট্রেনে তুলে দেবার দিন পর্যন্ত আমি থাকবো। আর এর মধ্যে যদি কোনো দরকার পড়ে, আমাকে খবর দিয়ো,—এই আমার ঠিকানা।

পাহাড়গঞ্জের একটা জনবহুল অঞ্চলের একটি বাড়ীর ঠিকানা লিখে রেখে শান্তনু তখনকার মতো নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

আকস্মিক অপমৃত্যু তার পদচিহ্ন কোথাও রেখে যায়নি ব'লেই আগাগোড়া ইন্দ্রজাল মনে হচ্ছে। যে-মৃত্যু অতি প্রত্যক্ষ, তার শোক-সন্তাপও স্পষ্ট। মহানগরীর পথের এই রূঢ় বাস্তব কোলাহলের মাঝখানে ওই মৃত্যুটাকে মনে হচ্ছে অবাস্তব ; কিংবা মৃত্যু ছাড়া জীবনের ব্যাখ্যায় আর কোনো সত্য নেই, সেই কারণে এমন হ'তে পারে এই বাস্তবটাই হোলো একটা অর্থহীন অপ্রাকৃত স্বপ্ন। অপরাহ্ণকাল পেরিয়ে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত শান্তনু ঘুরে বেড়ালো দিল্লীর পথে-পথে, চা খেয়ে বেড়ালো এখানে ওখানে, বিশ্রাম নিয়ে গড়ালো রামলীলার মাঠে মাঠে,—কিন্তু ওই জটিলতাটা তার মন থেকে ঘুচলো না। কানে কানে ডাক দিচ্ছে সেই ডাকিনী নিরন্তর—শান্তনুর অণুপরমাণুতে জড়িয়ে গেছে ঈশানী। ওদিকে সন্ধ্যার আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি নামলো মুষলধারায়। শান্তনু স্থির হয়ে ব'সে রইলো অনেকটা যেন বুদ্ধমূর্তির মতো।

ট্রেন এক ঘণ্টা লেট্! দিল্লী ষ্টেশনে যখন গাড়ী এসে পৌছলো, তখন প্রায় সওয়া দশটা। ক্লান্তদেহে নামলো ঈশানী শিখনারীর সেই পোষাকে। বোধ করি রাজরতনের জন্য সে কেঁদেছে অনেকবার, চোখের কোলে ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে খবরটা সে পায়, রাজরতন তার স্বামীর কাছে কোনমতেই পৌছতে পারলো না। মৃত্যুমুখী স্বামী যেখানে যাচ্ছে, রাজরতন আগে-ভাগে সেখানে পৌছে স্বামীর অপেক্ষায় রইলো।

নন্দ তাড়াতাড়ি এসে পোর্টম্যাণ্টোটা তুলে নিল, কুলীর দরকার আর হোলো না। ওয়েটিং রুমে গিয়ে পরিচ্ছদটা হয়ত বদল নেওয়া যেতো, কিন্তু থাক্, যদি কোনো সন্দিগ্ধ চক্ষু অনুসরণ করে, সুতরাং দরকার নেই। নন্দর আগে থেকেই অনেকটা চেনাশোনা আছে, অতএব দুজনে বেরিয়ে এসে ষ্টেশনের সামনে একখানা ট্যাক্সি ধরলো। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে শিলভিয়ার ঠিকানা বা'র ক'রে ঈশানী ড্রাইভারকে একবার দেখালো। গাড়ী ছেড়ে দিল।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় অবসাদটা যেন আরও বেড়ে উঠলো। ক্লান্তিতে ঘুম আসছে ঈশানীর চোখে। নূতন দিল্লীর দোকানপাট প্রায় সব বন্ধ হয়ে গেছে, কনট্ প্লেসে নিশুতি। কোনো কোনো অঞ্চল পরিচিত মনে হচ্ছে, ঈশানী এদিকে অনেকবার ঘুরে গেছে। সমস্ত দিন আজ বড় কষ্টে কেটেছে ট্রেনে। পাছে কারো চোখে কৌতূহল দেখা যায়, পাছে কেউ সন্দেহক্রমে প্রশ্ন ক'রে বসে, পাছে বা তার ছদ্মবেশ আচমকা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার পথ নিষ্কণ্টক হয়ে গেল।

ঘুম জড়িয়ে আসছে ঈশানীর চোখে। অনেকদিন পরে সে যেন ঘুমিয়ে পড়ছে আজ। দুর্গম পথের তীর্থযাত্রী এতদিন অসীম অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর

চ্ছিল দুরন্ত উদ্দীপনায়, আজ যেন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়া, অসীম াশ্বাসের সঙ্গে অপরিসীম অবসাদ দুই চক্ষুকে যেন জড়িয়ে ধরেছে।

অবশেষে ঠিক জায়গাটিতে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। এ-পাড়াটা একটু যেন াকবহুল। কাছেই একটা ট্যাক্সির ষ্ট্যাণ্ড, তার পিছনে কয়েকখানা টাঙ্গা ড়িয়ে। বোধ করি কিছু একটা 'পরব' চলছে, আশে পাশে কতকগুলো াকান খোলা। অনেক লোকজনের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে।

পোর্টমাণ্টোটা নামিয়ে নন্দ নিজের পকেট থেকে ভাড়াটা দিয়ে দিল। াটটা দেখিয়ে দিল ট্যাক্সিওলা নিজে। তারপর সে গাড়ী চালিয়ে দিল।

ওরা থাকে দোতলায় পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে করিডর। াখানে একটা আলো জ্বলছে। ঈশানী একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ াকে কলম আর কাগজ বা'র করে কি যেন লিখে নন্দর হাতে দিয়ে বললে, রা আমাকে দেখলে হয়ত বড্ড চমকে উঠবে রে। তুই বরং আগে যা, ালভিয়াকে ডেকে এই চিঠিখানা দে। তারপর আমি যাচ্ছি।

আচ্ছা, দিদিমণি—পোর্টমাণ্টোটো এবং নিজের পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে ঠিখানি নিয়ে নন্দ অগ্রসর হোলো। পাঁচ নম্বরের এইটিই একমাত্র করিডর, দিকে কেউ নেই। বারান্দার পাঁচিলে হেলান দিয়ে ঈশানী দাঁড়ালো।

নন্দ এগিয়ে ডান দিকে কয়েক পা ঘুরে একটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার বোতাম টিপতেই একজন চাকর বেরিয়ে এলো। নন্দ বুঝিয়ে দিল, লকাতা থেকে মাইজি এসেছে, তুমি মেম সাহেবকে খবর দাও।

তিনি 'নিদ' যাচ্ছেন।

তা হোক্, ডাকো। এ চিঠি দেখালে ছুটে আসবেন।

লোকটা ভিতরে চ'লে গেল, এবং মিনিট তিনেক পরে শিলভিয়া ছুটে ারিয়ে এলো ঘুমচোখে উন্মত্তের মতো। নন্দ ইংরেজি জানে না, কিন্তু দিদিমণির থানে আসার কথাটা শিলভিয়াকে বুঝিয়ে দিতেই শিলভিয়া দৌড়ে আসছিল, বং আলোর নীচে ঈশানীকে সহসা দেখে সেই কাঁচা ঘুমের আবিলতার মধ্যে াউরে উঠে টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল। নন্দ এবং সেই চাকরটা,

হাঁ হাঁ ক'রে তার দিকে অগ্রসর হোলো বটে, কিন্তু ঈশানী ততক্ষণে ছুটে এসে কোলের মধ্যে শিলভিয়াকে তুলে নিয়েছে।

* * * *

ঘণ্টাখানেক পরে ঈশানী বেরিয়ে এলো শিলভিয়ার চাকর দেওয়ানচন্দকে সঙ্গে নিয়ে। শান্তনুর ঠিকানা আছে চাকরটার কাছে। পোষাকটা বদলে শাড়ী প'রে এলো ঈশানী। স্নান ক'রে আসতে বললে শিলভিয়া, কিন্তু মন্দিরের সামনে এসে ধুলো-পায়ে দর্শন না করলে পথশ্রম সার্থক হয় না। সমস্ত মন তার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঈশানী ছুটে চললো নীচের তলায় নেমে।

রাত বারোটা বাজে। ট্যাক্সি কোনমতেই আর পাওয়া গেল না। দেওয়ানচন্দ বললে, একখানা টাঙ্গা নেবো, মাইজি ?

এখান থেকে কতদূর, দেওয়ানচন্দ ?

বেশী দূর নয়, এই কাছেই—

তাহ'লে হেঁটেই চলো। টাঙ্গা বড্ড আস্তে চলে—।

ঈশানী ছুটতে ছুটতে চললো। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা যাবৎ সে হাঁটেনি, মধ্যরাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় অতি দ্রুত পা চালানো তার ভালো লাগছে। পেরিয়ে গেল সে অনেক দূর, ক্রমশ বাজারের পথটা একেবারে নিশুতি হয়ে এলো। কিন্তু ঈশানীর পায়ে পায়ে এসেছে চাঞ্চল্য, দুরন্ত জোয়ার লেগেছে তার গতিতে। তার বুকের মধ্যে একটা আর্তস্বর যেন ডানা ঝটাপটি করছে।

অনেক দূর গিয়ে সহসা সভয় সঙ্কোচে ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো। এই উদ্দাম উত্তেজনা নিয়ে শান্তনুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে যদি নিজেকে সে আয়ত্তের মধ্যে ধ'রে রাখতে না পারে ? যদি তার এই অবসন্ন বিহ্বলতা এই মধ্যরাত্রে শান্তনুর ঘরে পৌঁছে এতদিনের কঠিন বাঁধনকে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ে অন্ধকারে ?

আইয়ে, মাইজি—

মুখ তুলে ঈশানী ডাকলো, শোনো, দেওয়ানচন্দ ?

দেওয়ানচন্দ কাছে এসে দাঁড়ালো। ঈশানী শান্তকণ্ঠে বললে, আমার

শরীরটা ভালো লাগছে না, আমি ফিরে যাচ্ছি। তুমি বাবুকে গিয়ে বলো, যদি তিনি আসতে চান। না, দরকার নেই, তুমি কেবল খবরটা পৌঁছে দাও।

আপনি একা ফিরে যেতে পারবেন, মাইজি?

হ্যাঁ, পারবো—। ঈশানী ফিরে গেল।

পথ আর বেশি বাকি ছিল না। ঠিকানাটা একবার দেখে নিয়ে দেওয়ানচন্দ একটা পানের দোকানের পাশ কাটিয়ে একটি বাড়ীর সিঁড়ি ধ'রে সোজা উপরে উঠে গেল। বাঁ দিকে বেঁকেই বেশ নিরিবিলি একটি ঘর এবং তার কোলে ছোট্ট একটি বারান্দা। এদিক-ওদিকে কেউ কোথাও নেই। দেওয়ানচন্দ এগিয়ে এসে ঘরের দরজার কড়া নাড়লো। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ভিতরে আলো জ্বলছে।

কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে শান্তনু বসেছিল একমনে। অত রাত্রে কড়া নাড়া শুনে সে একবার সচকিত হয়ে তাকালো, তারপর উঠে এসে দরজা খুলে সহসা দেওয়ানচন্দকে দেখে বললে, কি ব্যাপার?

দেওয়ানচন্দ সেলাম ঠুকে বললে, বহুৎ জরুরী সাব, একজন নতুন মেম সাহেব এসেছেন কলকাতা থেকে একটি 'নোকর' সঙ্গে নিয়ে, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!

মেম সাহেব?—শান্তনু একটু বিস্মিত হোলো, কিন্তু হঠাৎ বহুদিন আগেকার সুষমার কথা স্মরণ ক'রে সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, কে তিনি? কি নাম? আমার সঙ্গে কি দরকার? এত রাত্রে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, দেওয়ানচন্দ!

দেওয়ানচন্দ একটু বিব্রতভাবে বললে, তিনি এসেছিলেন আমার সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত, কিন্তু নিজেই আবার ফিরে গেলেন।

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে শান্তনু বললে, নতুন মেমসাব ফর্সা, না শ্যামবর্ণ? দাঁত কি একটু উঁচু?

নহি সাব, বহুৎ 'ধওলা' লড়কী আছে। আমাদের মেমসাহেবের বন্ধু। মেম সাহেব ওকে দেখে কাঁদতে গিয়ে ঝটসে 'বেহুঁস' হয়ে পড়েছিলেন।

শিলভিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল? আশ্চর্য বটে। কিন্তু শিলভিয়ার সঙ্গে সুষমার ত' কখনো আলাপ হয়নি! তবে?

আচ্ছা, তুমি যাও দেওয়ানচন্দ। আমি দেখছি ততক্ষণ···

দেওয়ানচন্দ চ'লে যাবার পর শান্তনু আবার এসে কাগজপত্র নিয়ে বসলো। সমস্ত সন্ধ্যা রাতটা রামলীলার মাঠে বৃষ্টিতে ভিজে তার বোধ হয় একটু জ্বরভাব হয়েছে। মাথাটা ভার। কিন্তু সে মন দিতে পারলো না কাগজপত্রে। এক সময় উঠে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল, তারপর বালিশের তলা থেকে সকালের পাটকরা খবরের কাগজখানা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলাতে লাগলো। কিন্তু অত্যন্ত জরুরী না হ'লে শিলভিয়া কখনও লোক পাঠাতো না এই রাত্রে। সুতরাং এক সময় শান্তনুকে উঠতেই হোলো। জামাটা গায়ে চড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দরজায় শিকল টেনে সে পথে নেমে এলো।

শিলভিয়া দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। ঈশানী স্নানে গিয়েছে। ভিক্টর তার নিজের ঘরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। দেওয়ানচন্দ ফিরে এসে নন্দকে সঙ্গে নিয়ে গেছে নিজেদের মহলে। বোধ হয় পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনো তিথি হবে, বারান্দার বাইরে সমগ্র নিদ্রিত দিল্লীর উপরে শরৎ-শেষের জ্যোৎস্না রাত্রি আপন নির্মল সৌন্দর্যে একটি মোহমদির স্বপ্নলোকের দ্বার খুলেছে।

পায়ের মৃদু শব্দ হোলো সিঁড়ির দিকে। ধীরে ধীরে ছায়ামূর্তির মতো শান্তনু উঠে এসে শিলভিয়ার পাশে দাঁড়ালো। শিলভিয়া মুখ ফিরালো, দুই চোখ তার জলে ভরা। কিন্তু এই ইংরাজ যুবতী কোনোদিন যা করেনি আজ তাই ক'রে বসলো। হঠাৎ শান্তনুর হাতখানা ধ'রে ডুকরে উঠলো, চৌধুরী!

কি শিলভিয়া?

তুমি কি বিশ্বাস করো, মহৎ ভালোবাসার কখনও মৃত্যু নেই?

শান্তনু অনুভব করছিল, শিলভিয়ার ঠাণ্ডা কঠিনমুষ্টি হাতখানা থরথর ক'রে কাঁপছে। সংযত কণ্ঠে শান্তনু শুধু বললে, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, শিলভিয়া!

তবে যাও এই ঘরে!—এই ব'লে শিলভিয়া এ-পাশ দিয়ে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শান্তনু ঘরের দিকে তাকালো। ভিতরে আলো জ্বলছে। কোনো এক ব্যক্তি নড়াচড়া করছে ঘরের মধ্যে। কিছু বুঝতে পারলো না শান্তনু। এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে সে ভিতরে এলো। ঈশানী তাকাল শান্তনুর প্রতি।

ও-পাশের ঘরে নিদ্রিত ভিক্টরের শিয়রের কাছে অশ্রুবিগলিত চক্ষে শিলভিয়া উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল। তার কানে এলো শান্তনুর একটা আর্তস্বর,—অসহনীয় হৃদয়াবেগ দমন করতে না পেরে কঠিন সংযত প্রকৃতির পুরুষ যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আজ ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার পর এই পরদেশিনীর কানে ঈশানীর চাপা-চাপা কণ্ঠের যে অশ্রু উদ্বেলিত ভাষাটা এসে পৌঁছচ্ছিল, সেই দুর্বোধ্য ভারতীয় ভাষার মাধুর্যটার থেকে সে বঞ্চিত রইলো। বেদনার প্রলাপের মধ্যে আজ ঈশানীর কোনো আগল ছিল না। আজ তার ভয় কিছু নেই। হারাবার ভয় নেই, না পাবার ভয় নেই, দুঃখ ও দুর্যোগেরও কোনো ভয় নেই। কিন্তু তার আড়ষ্ট লজ্জার মধ্যে এতদিন ধ'রে যে অনির্বচনীয় অমৃত যক্ষের ধনের মতো গুপ্ত হয়ে ছিল, শান্তনু যেন আজ তার পরম আস্বাদ লাভ করে!

মিনিট পনেরো পরে শিলভিয়া একখানা ট্রে-তে তিন পেয়ালা গরম গরম কফি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো. তারপর বললে, আজ কিন্তু তোমাকে আর ফিরে যেতে দেবো না শান্তনু। সমস্ত রাত ব'সে আমরা ঈশানীর গল্প শুনবো!

চোখের জল মুছে ধরা গলায় ঈশানী বললে, ঈশানী ম'রে গেছে শিলভিয়া, বিমান দুর্ঘটনায়। আমি মাধবী। ঈশানীর সব ইতিহাস মুছে যাক।

ঈশানী এসে দাঁড়ালো ভিক্টরের ঘরে। একটি ফুলের তোড়া যেন বালিশের ধারে শোয়ানো। ঈশানী ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে নিদ্রিত ভিক্টরের গলা জড়িয়ে পরম স্নেহে তার ললাটে একটি চুম্বন করলো।

দক্ষিণের বারান্দায় ওরা গিয়ে ব'সে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল। ভোর ছটায় দেওয়ানচন্দ চা নিয়ে এলো এবং বেলা সাতটার সময় সবাই মিলে যখন ভিক্টরকে নিয়ে সমাদর করতে ব্যস্ত, সেই সময় নন্দ এসে জানালো, একটি

ভদ্রলোক শিলভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই সুযোগে ঈশানী গেল স্নান করতে। ভিক্টরকে স্কুলে পাঠিয়ে শাস্তনুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি তাকে বেরোতে হবে।

শিলভিয়া গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়ালো। মিঃ দত্তচৌধুরী অত্যন্ত বিমর্ষ ও শোকমলিন মুখে দেখা করতে এসেছেন। শিলভিয়া তাঁর সঙ্গে করমর্দন ক'রে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন ক'রে বললেন, ঈশানী রায়ের মৃত্যুসংবাদে দিল্লীতে সকলেই শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। বহু কাগজে তাঁর ছবি বেরিয়েছে। কিন্তু তাঁকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনতুম ব'লেই আমাদের শোকসন্তাপ বেশী।

শিলভিয়া প্রশ্ন করলো, আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ?

তাঁকে নিয়েই কাল সারাদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, সেইজন্যই আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। রাত প্রায় একটার সময় তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। কিন্তু আপনাদের শোকতাপের কাছে আমাদের এই সুসংবাদ চাপা প'ড়ে গেছে।

শিলভিয়া নতমুখে চুপ ক'রে রইলো। এক সময়ে বললে, আপনি কবে দেখেছেন ঈশানী রায়কে ?

দত্তচৌধুরী বললেন, তাঁকে দেখেছিলাম রীগল্ সিনেমার ষ্টেজে। তখন তিনি 'চিত্রাঙ্গদার' সাজে ছিলেন।

আপনার সঙ্গে আলাপ হয় নি ?

খুব সামান্যই আলাপ হয়েছিল, তবে আমার স্ত্রী গিয়ে পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তাঁর মতো প্রতিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলো না, জীবনে এই দুঃখ রয়ে গেল।

দেওয়ানচন্দ এক পেয়ালা চা এনে দিল। দত্তচৌধুরী পুনরায় বললেন, বোম্বাই যাবার তারিখ কি আপনাদের স্থিরই আছে ?

শিলভিয়া বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই তারিখেই আমরা রওনা হবো।

সমবেদনাজ্ঞাপক কণ্ঠে দত্তচৌধুরী বলতে লাগলেন, ভিক্টরকে আমাদের

ড় ভালো লেগেছিল। মা-বাপ মরা অমন সুন্দর ছেলেটিকে আমরা কেউ লতে পারবো না। বিলেত থেকে মধ্যে-মাঝে খবর পেলে আমরা খুবই খুশী বো। আজ ঈশানী রায় বেঁচে নেই, কিন্তু আমার স্ত্রীর কেমন একটা গোপন রণা যে, ভিক্টর ঈশানী রায়েরই ছেলে! হয়ত তাঁর জীবনকালে একথা প্রকাশ রার কোনো পথ ছিল না। সংসারে এ রকম অদ্ভুত ঘটনা আছে বৈ কি।

স্নান ক'রে ঈশানী বেরিয়ে আসতেই হাসিমুখে শান্তনু বললে, ও ঘরে দত্ত-চৌধুরী এসেছেন, তুই দেখা করবি?

ঈশানী শান্তনুর প্রশান্ত স্মিত মুখখানার দিকে একবার তাকালো। বললে, দখা করলে ক্ষতি কি? তোরা গিয়ে ব'স, আমি যাচ্ছি।

শান্তনু বাইরে গেল। ভিক্টর পাশের ঘরে পড়া করছিল, মুখ ফিরিয়ে পর্দার াক দিয়ে সদ্যঃস্নাত ঈশানীর দিকে একবার তাকালো। তারপর ছুটে এসে তার জ্ঞাত জননীকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, মাম্মি আমাকে একটা কথা দেবে?

ভিক্টরের গালে চুম্বন ক'রে ঈশানী সহাস্যে বললে, কি বলো?

তুমি কিন্তু আর মরতে পাবে না।—এই ব'লে দৌড়ে গিয়ে ভিক্টর আবার নিজের পড়া নিয়ে ব'সে গেল। তার এই লুকোচুরিটা কেউ না দেখে এই তার তলব ছিল।

একটুকু প্রসাধন কোথাও নেই ঈশানীর সর্বাঙ্গে। ভিজা চুল সে ফিরিয়ে াখলো। অতি সাধারণ শাড়ী আর ভদ্র জামা। দু'গাছা কাচের চুড়ি দু'হাতে। লায় অথবা কানে, কোথাও কিছু নেই। পায়ে চটি জোড়াটা দিয়ে সে এ-ঘরে লো দত্তচৌধুরীর পিছন দিক দিয়ে। শিলভিয়া আর শান্তনু সামনে ব'সে য়েছে।

শিলভিয়া বললে, আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, উনি কাল রাত্রে সে পৌঁছেছেন কলকাতা থেকে।

দত্ত চৌধুরী হঠাৎ চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, এবং নমস্কার বিনিময় করতে ার ভুল হয়ে গেল। কিন্তু সেই ভয়ানক নিস্তব্ধতায় শুধু তাঁরই অস্বস্তি•

প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি শান্তনুর দিকে চেয়ে বললেন, ওঁকে আমি চিনি মনে হচ্ছে।

শান্তনু বললে, ও, চেনেন নাকি?

ঈশানী প্রশ্ন করলো, কোথায় দেখেছেন বলুন ত?

কপালের ঘাম মুছে দত্তচৌধুরী বললেন, আপনার নাম কি মাধব, ডাক নাম মাধু?

শান্ত ভদ্র হাস্যে ঈশানী বললে, হ্যাঁ, আপনার নামটাও আমি ভুলিনি।—এই ব'লে সে আঁচলের তলা থেকে একখানা ছোট নোটবই বা'র ক'রে পুনরায় বললে, এ বইখানা আপনি আমাদের সেই ফুলকাঠির বাড়ীতে ফেলে এসেছিলেন। আপনার বুক-পকেটে ছিল। আপনার স্ত্রী কি আমার কথা জানেন?

দত্তচৌধুরী বললেন, না।

শিলভিয়া এবং শান্তনু দু'জনেই নীরব। ঈশানী পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বললে, কিন্তু তাঁকে জানানো দরকার, আমি আপনার প্রথম সন্তানের জননী!

দত্তচৌধুরী মুখ তুললেন! বললেন, আপনার এ রকম ধারণার মানে আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। আমাকে ক্ষমা করবেন।

শিলভিয়া এবার মিষ্টকণ্ঠে বললে, আপনার স্ত্রীর ধারণাই যথার্থ সত্য, মিষ্টার দত্তচৌধুরী। ইনিই ভিক্টরের মা!

ভিক্টরের মা! মানে,—যে ভিক্টর আমাদের কাছে ছিল?

আজ্ঞে, হ্যাঁ!

দত্তচৌধুরী মাথা নীচু ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর মাথা তুলে বললেন সকালবেলায় এসেছিলুম ঈশানী রায়ের অকালমৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে। হ্যাঁ একথা সত্যি, ওঁকে আমি চিনি, এক সময়ে আলাপও হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের সকলের মনে এ রকম একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে, এটা আমার জানা ছিল না। আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

ঈশানী বললে, আপনি কি সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করতে চান?

ভিক্টর আমার সন্তান, এ আমি কোনো মতে স্বীকারই করবো না।

স্বীকার না করুন, বিশ্বাস করেন ত?

দত্তচৌধুরী বললেন, স্বীকার যখন করিনে, বিশ্বাসের কথাও তখন ওঠে না।

ঈশানী বললে, বিশ্বাস করেন না কেন?

যেটা জানার বাইরে জ্ঞানের অতীত, যেটা ধারণাতেও নেই, সেটা আমার কাঁধে চাপলে অস্বীকারও করবো, অবিশ্বাসও করবো।

কিন্তু আপনার এবং আমার দশ বছর আগেকার সমস্ত রেকর্ড হাসপাতালে আছে, এ বইয়ের নকল এবং ফটোগ্রাফ সবই সেখানে পাওয়া যাবে। আপনি কি আদালতের হাকিমের সামনে দাঁড়িয়েও এ সমস্ত অস্বীকার করবেন? এই নোট বইতে আপনার যে ছবিখানা লটকানো রয়েছে, হাকিম কি এটা নিয়েও বিচার করবেন না?

রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে দত্তচৌধুরী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আপনারা কি চান্ আমার পারিবারিক জীবনের সমস্ত সুখশান্তি জ্ব'লে পু'ড়ে ছারখার হোক? আমার স্ত্রীর ঘৃণা আর সন্দেহ ব'য়ে বেড়াবো চিরদিন, এই কি আপনাদের কাম্য?

শান্তমুখে ঈশানী তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। এবার শিলভিয়া বললে, আপনি আশ্বস্ত হোন্, মিষ্টার দত্ত চৌধুরী,—মাধবীর কোনও দুষ্ট মতলব নেই আপনার সম্বন্ধে! আপনি ওঁর স্বামীও নন, এমন কি ভালোবাসার পাত্রও নন। আমি বুঝতে পারি, পুরুষের সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ আপনি পাননি। বিবাদ-বিতর্কে কিংবা আদালতে গিয়ে এ সমস্যার প্রতিকার হবে না। আপনি যদি আমাদের পরামর্শ মেনে নেন, তাহ'লে আপনার স্ত্রীর কানেও একথা কোনোদিন উঠবে না।

নিরুপায় বিবর্ণ মুখে দত্তচৌধুরী বললেন, বলুন, কি আমাকে করতে হবে?

ভিক্টরকে নিয়ে আমার বিলেত যাবার আগে আপনি একটি দলিল রেজিষ্টারী ক'রে দেবেন এই মর্মে যে, ভিক্টর আপনার প্রথম সন্তান, কিন্তু তার জননী মাধবী রায়ের সঙ্গে আপনার কোনো বৈবাহিক যোগসূত্র নেই। মাধবী সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই দলিলের সাক্ষী থাকবো আমি আর শান্তনু, এবং সই করবেন মাধবী রায়।

এ ধরনের দলিল প্রস্তুত করে দিলে কি সুবিধে হবে ?

এবার শান্তনু গলা পরিষ্কার ক'রে তার অভিমত ব্যক্ত করলো। বললে, আপনি সম্ভবত জানেন না, মাধবীকে আমি আমার স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেছি, কিন্তু বাধা হয়ে আছেন আপনি। ওই দলিল সেই বাধা ঘোচাবে !

বটে ! তাহ'লে সবটাই ব্ল্যাক-মেইল ?—দত্তচৌধুরী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, এবার বুঝেছি সব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন্। ভিক্টর যে শান্তনু চৌধুরীর ছেলে নয়, তার প্রমাণ কি ?

চোপ রও, শূয়োর ! ঈশানী লাফিয়ে উঠলো চেয়ার ছেড়ে, মরিয়া হয়ে চেঁচালো,—নন্দ ! দেওয়ানচন্দ !

চক্ষের পলকে উঠে গিয়ে শিলভিয়া ঈশানীকে জাপটে ধরলো,—ছি মাধবী, উনি না আমাদের অতিথি। সংযম হারিয়ো না !

শান্তনু একটু হাসলো। বললে, মিষ্টার দত্তচৌধুরী, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। ভিক্টর আমারই সন্তান, ভালোবাসি ব'লেই আমার। সত্যি বলতে কি ভালোবাসাই ত' পিতৃত্ব। কিন্তু আমি ভাবছি আমার স্নেহের ভগ্নী কমলার কথা। অমন সাধ্বী স্ত্রী যার, সে কেন কাপুরুষ হয়, অরুণবাবু ?

দত্তচৌধুরী শান্ত হলেন। বললেন, আমার অবস্থায় পড়লে পুরুষমাত্রই কাপুরুষ হয়, শান্তনুবাবু।

হয় স্বীকার করলুম। কিন্তু যে নিরপরাধ মেয়ে তা'র জীবন ধ'রে আপনার জন্য সমস্ত কলঙ্ক আর উৎপীড়ন মেনে নিয়েছে, তার প্রতি পুরুষের বিচার করুন ! উনি আপনার স্ত্রী হ'লে হয়ত আপনার বিপদ ঘটতো, কিন্তু তা উনি নন। আপনি কেবল আপনার সন্তানকে স্বীকার করে নিলেই উনি সুখী হবেন। মেয়ে আর পুরুষের জীবনে অনেক স্খলন-পতন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, কিন্তু মনুষ্যত্ববোধ এদের সব কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নির্মল ক'রে তোলে, মিষ্টার দত্তচৌধুরী !

শিলভিয়া বললে, আমরা কথা দিচ্ছি, আপনার স্ত্রীর কাছে এ সব ঘটনা কোনোদিন প্রকাশ পাবে না।

দত্তচৌধুরী বললেন, তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখাশুনো যদি হয় কখনও ?

শান্তনু বললে, না, আমরা সবাই শীঘ্র দিল্লী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।

কিন্তু ভবিষ্যতে যদি ভিক্টর ফিরে এসে আমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর অধিকার দাবী করে ?

খুব স্বাভাবিক—শান্তনু বললে, সে আপনার সন্তান, দাবী তার আছে বৈ কি। তবে আপনাকে এটুকু জানিয়ে রাখি, ওদের বিলেত যাবার আগে আমি লেখাপড়া ক'রে আপনার কাছ থেকে ভিক্টরকে 'দত্তক' ব'লে গ্রহণ করবো। আশা করি এতে আপনার অমত নেই !

অরুণবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এসে শান্তনুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আপনার কাছে চিরকাল আমি কৃতজ্ঞ রইলুম। আপনাকে তখন আঘাত করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

শান্তনু বললে, আঘাত আমার লাগেনি, অরুণবাবু। মাধবীর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় এখনও এর বছর হয়নি। কিন্তু আমি স্ত্রী ব'লে যাঁকে গ্রহণ করেছি, তাঁর পায়ের তলাকার সমস্ত কাঁটা একটি একটি ক'রে আমি নিজের হাতে সরিয়ে দিতে চাই। আমার জীবনের সেইটিই সার্থকতা !

ঈশানী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। দত্তচৌধুরী এবার উঠে দাঁড়ালেন। ঈশানী রায়ের কোনো রহস্য তাঁকে জানানো হোলো না, এবং তাঁর স্ত্রী কমলা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার আগেই সকলে দিল্লী ত্যাগের মনস্থ ক'রে নিল।

দত্তচৌধুরী বললেন, বেশ, আমিও কথা দিয়ে যাচ্ছি, এ সপ্তাহের মধ্যেই আপনাদের দরকার মতো সমস্ত দলিলপত্র নিঃসঙ্কোচে রেজেষ্টারী ক'রে দেবো। আজ বিদায় নিচ্ছি।

টুপিটা নিয়ে নমস্কার জানিয়ে নতমস্তকে তিনি বিদায় নিলেন। শিলভিয়া তাঁকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

ঈশানী হেঁট হয়ে একেবারে লুটিয়ে পড়লো শান্তনুর পায়ের কাছে। অধীর কান্নায় সে শান্তনুর পা জড়িয়ে ধরলো। ভিজা চুলের রাশি ভেঙ্গে পড়লো

শান্তনুর দুই পায়ের ওপর। মহত্ত্বের শেষ মূল্য দেবার জন্য চোখের জল ছাড়া ঈশানীর আর কোনো সম্বল ছিল না।

চুপ ক'রে রইলো শান্তনু, বাধা দিল না। অশ্রুজড়িত মৃদুস্বরে ঈশানী বললে, আমাকে তুই শুধু কাঁদতে দে, শান্তনু,—আমার সব পরিচয় ঘুচিয়ে এসেছি—তোর পায়ের তলায় যেন আমি জীবন-মরণের জায়গা খুঁজে পাই।

শান্তনুও চোখ মুছলো। বললে, দুঃখের ভেতর দিয়ে তোকে পাইনি, তোর জন্যে চোখের জলও ফেলতে হয়নি। তুই সহজে এসেছিলি ব'লেই আমি অহঙ্কারে জরোজরো ছিলুম। সেই অহঙ্কারে তুই আঘাত করলিনে, তাই শোচনীয় চিত্তবিকারে আমার দিন গেছে। যাক, সে-ঈশানী ম'রে গেছে, সে-আমিও বেঁচে নেই। চল এবার নতুন জীবনে, সহজ সাধারণ স্বাভাবিক জীবনে। অখ্যাত অজ্ঞাত অজানা জনেদের মাঝখানে গিয়ে নিজেদের নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলি—চল···

ঈশানী বললে, তাই চল শান্তনু,—যেখানে কেউ চিনবে না, কেউ খুঁজবে না···

* * * *

কৌশল্যা নদীর গতিপথ ধ'রে মাইল তিরিশ উত্তরে গেলে পাহাড়ের পাশ দিয়ে খরতর স্রোতস্বিনী একটু বাঁক নেয়। এই পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে একটি অধিত্যকায়। প্রথম হেমন্তের রঙীন পাখীরা এসেছে আশেপাশের অরণ্যলোকে। এখনও অজস্র হয়ে রয়েছে বনমল্লিকার ঝোপঝাড়; আপেলের বনে পাক ধরেছে। কাঁচা ডালিম আর কমলার বনে পতঙ্গের দল এখন থেকেই আনাগোনা করছে। নীল নির্মল আকাশে রাজহংসদলের পাখার মতো মেঘেরা ভেসে চলেছে। সভ্যতার থেকে অনেক দূরে।

কাঠের ছোট্ট বাড়ীটি টিলা পাহাড়ের ঠিক কোলে। লতানে গোলাপ আর অপরাজিতার ঝাড় অনেক আগে থেকে মালী লাগিয়ে রেখেছে। ফুলগাছে বারান্দাটা যেন ভ'রে আছে। পতঙ্গ-গুঞ্জনের সঙ্গে কৌশল্যার প্রবাহ-কল্লোল মধুর সুরের মতো মিলে গেছে।

শিলভিয়ার অনুরোধে শান্তনু জ্যোৎস্নারাত্রে দিন দুই সবাইকে বাঁশী শুনিয়েছিল।

আজ ওরা এখান থেকে বোম্বাই রওনা হচ্ছে,—শিলভিয়া আর ভিক্টর। নন্দ বাজার থেকে এনেছে শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, ঈশানী নিজের হাতে রান্না প্রস্তুত করেছে। ওরা রামনগর-লক্ষ্ণৌ হয়ে বোম্বাই যাবে। দু'জনকে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাচ্ছে শিলভিয়া। সে ইংরেজ, তা'কে চ'লে যেতেই হবে।

হাটের নীচে দিয়ে দুপুরবেলায় যাবে রামনগরের মোটর বাস। সন্ধ্যার দিকে রামনগর থেকে গাড়ী ছাড়বে লক্ষ্ণৌর দিকে। কাল প্রভাতে লক্ষ্ণৌ।

নন্দর সঙ্গে ভিক্টর কোথায় যেন গিয়েছে। দেরী হয়ে যাচ্ছিল। যাবার জন্য সব প্রস্তুত। ওরা যখন সবাই এসে বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়ালো, ভিক্টর ছুটতে ছুটতে নিয়ে এলো এক গোছা তোড়াবাঁধা নানা রঙের ফুল। অদূরে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছিল শান্তনু। অজ্ঞান বালক ছুটে গিয়ে বললে, বাবা, তুমি বলেছিলে মার জন্যে ফুল আনতে, আমি কিন্তু ভুলিনি।

ঈশানী ছুটে গিয়ে ভিক্টরকে জড়িয়ে ধরলো। শান্তনু বললে, না, এরকম কথা ছিল না। 'রেডি-মেড ফাদারের' দাবী সকলের আগে।

শিলভিয়া খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বাস এসে পড়েছে ততক্ষণে। চরম দুর্দিনের বন্ধু শিলভিয়া শান্তস্নিগ্ধ প্রসন্ন হাস্যে শেষ সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিল।

ভিক্টরকে কোলে তুলে নিয়ে শান্তনু বাসে তুলে দিল। জিনিসপত্রাদি আগেই নন্দ গাড়ীতে তুলে দিয়েছে।

শান্তনুর পাশে সজলচক্ষে ঈশানী দাঁড়িয়ে ছিল দূরের দিকে তাকিয়ে। পাহাড়ের বাঁকে মোটর বাস অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে শান্তনু স্ত্রীর হাত ধ'রে বললে, চল, মাধু।

চলো, যাই।—চোখ মুছে ঈশানী ঘরের দিকে চললো।—

টেলিফোন করেছিলেন রমেনবাবু একটু আগে। অতঃপর আধঘণ্টার মধ্যেই তনি ঈশানীর ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। নন্দ তাঁকে বাইরের ঘরে বসিয়ে শানীকে এসে খবর দিয়ে গেল।

ইজিচেয়ারে বসেছিল শান্তনু। দুজনের আলাপ চলছিল নিরিবিলি। নন্দ র থেকে বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তে ঈশানী বিছানা থেকে নেমে বললে, লক্ষ্মীটি, তামার সম্বন্ধে রমেনবাবুকে যা বলবো তুমি যেন তার প্রতিবাদ ক'রো না।

শান্তনু বললে, বেয়াড়া কিছু বলবে নাকি?

না, সেজন্য নয়। তোমার এখানে থাকা নিয়ে ওঁর মনে প্রশ্ন উঠতে পারে ত'? টা আমি মুছে দেবো—উনি একটু সেকেলে লোক কিনা! তুমি যেন আবার য়ে বেমক্কার মতন কথা ব'লো না!

ঈশানী দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। বাইরের ঘরে এসে রমেনবাবুর কাছাকাছি লো। বললে, এমন অসময়ে?

রমেনবাবু বললেন, চারিদিক থেকে তাগাদা আসছে, কিন্তু আমাদের 'শো' বে দেবো সে-তারিখটা কই তুমি ত' ঠিক করলে না? টিকিট বিক্রির আবার টা সময় দিতে হবে ত! তাছাড়া আমার জানা দরকার, তুমি নিজে নামবে না।

ঈশানী একটু গম্ভীরভাবে বললে, সেবারের কথা মনে ক'রে দেখুন। পনাদের 'শো'র মধ্যে আমি নামলে হিসেবপত্র নিয়ে বড্ড গণ্ডগোল বাধে। আমাকে নামতেই হয় তাহ'লে অন্য তারিখ নেবো।

রমেনবাবু হাসলেন। বললেন, এ প্রতিষ্ঠান তুমিই গ'ড়ে তুলেছ তোমার র্জনের টাকায়। আমাদের 'শো' দিয়ে যে টাকা আসবে সেও একপক্ষে

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো। একটু পরে বললে, শিলভিয়ার মতো মাকে ওর পাশে বেশ মানায়, না?

কিন্তু ভিক্টর ত' ওর ছেলে নয়?

ঈশানী কিয়ৎক্ষণ থেমে বললে, কনভেণ্টের অনেক শিশু জন্ম-রহস্যে বাঁধা, এ কি তুমি জানতে না?

শান্তনু বললে, ওটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। জন্মরহস্য যদি থাকে থাক, পৃথিবীর সব শিশু নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ। প্রাকৃতিক কারণে প্রত্যেক সন্তানই কামজ, কিন্তু প্রেমের দ্বারা সেই সন্তান যদি অভিষিক্ত না হয়, তবে সে দোষ তার পিতামাতার,—তার নয়!

টেলিফোন করেছিলেন রমেনবাবু একটু আগে। অতঃপর আধঘণ্টার মধ্যেই ানি ঈশানীর ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। নন্দ তাঁকে বাইরের ঘরে বসিয়ে শানীকে এসে খবর দিয়ে গেল।

ইজিচেয়ারে বসেছিল শান্তনু। দুজনের আলাপ চলছিল নিরিবিলি। নন্দ । থেকে বেরিয়ে যাবার পরমূহূর্তে ঈশানী বিছানা থেকে নেমে বললে, লক্ষ্মীটি, ামার সম্বন্ধে রমেনবাবুকে যা বলবো তুমি যেন তার প্রতিবাদ ক'রো না।

শান্তনু বললে, বেয়াড়া কিছু বলবে নাকি ?

না, সেজন্য নয়। তোমার এখানে থাকা নিয়ে ওঁর মনে প্রশ্ন উঠতে পারে ত' ? টা আমি মুছে দেবো—উনি একটু সেকেলে লোক কিনা! তুমি যেন আবার য়ে বেমক্কার মতন কথা ব'লো না!

ঈশানী দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। বাইরের ঘরে এসে রমেনবাবুর কাছাকাছি ালো। বললে, এমন অসময়ে ?

রমেনবাবু বললেন, চারিদিক থেকে তাগাদা আসছে, কিন্তু আমাদের 'শো' ব দেবো সে-তারিখটা কই তুমি ত' ঠিক করলে না ? টিকিট বিক্রির আবার কটা সময় দিতে হবে ত! তাছাড়া আমার জানা দরকার, তুমি নিজে নামবে না।

ঈশানী একটু গম্ভীরভাবে বললে, সেবারের কথা মনে ক'রে দেখুন। পনাদের 'শো'র মধ্যে আমি নামলে হিসেবপত্র নিয়ে বড্ড গণ্ডগোল বাধে। । আমাকে নামতেই হয় তাহ'লে অন্য তারিখ নেবো।

রমেনবাবু হাসলেন। বললেন, এ প্রতিষ্ঠান তুমিই গ'ড়ে তুলেছ তোমার ার্জনের টাকায়। আমাদের 'শো' দিয়ে যে টাকা আসবে সেও একপক্ষে

তোমারই টাকা। তুমি যদি তোমার হিসেব সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে চাও, কারে কোনো আপত্তি নেই!

সেই ভালো, রমেনবাবু। প্রতিষ্ঠানের একাউণ্টে টিকিট বিক্রি হ'লে তা থেকে নিজের জন্য টাকা নিতে আমার বাধে, মনে হয় দিয়ে আবার কেড়ে নিচ্ছি —ঈশানী পুনরায় বললে, তার চেয়ে এই ভালো, এতে আমার নিজের হা খোলা থাকে।

রমেনবাবু বললেন, তা হ'লে 'শো' আমরা কবে দেবো?

অন্তত সপ্তাহ তিনেক হাতে রেখে টিকিট বিক্রি আরম্ভ করুন। বাকিটা সাজানো গোছানোই আছে।

কাষ্টিং তুমি যা রেখেছিলে তাই থাকবে ত'?

হ্যাঁ, তাই রেখে দিন্।

রমেনবাবু বললেন, তবে তোমার কথামতোই ডবল কাষ্টিং ক'রে রেখেছি কি জানি কখন কলেরা-বসন্তের মহামারী লাগে!

ঈশানী বললে, এবারেও কি মহামারী লাগার ভয় আছে?

রমেনবাবু বললেন, আমার বয়স ষাট বছর হ'তে চললো। গত সাইত্রি বছরে এমন এক বছরও বাদ যায়নি, যে বছরে এই পোড়া শহরে এই সময়ট মড়ক লাগে নি। সুতরাং ওটা মনে রেখেই ডবল কাষ্টিং করেছি। সে যা হোক, তোমার 'শো'র তারিখটা তুমি কবে দিতে চাও?

সেটা এখন অনির্দিষ্ট থাক। যদি নামি তবে 'চিত্রাঙ্গদা' করবো।

রমেনবাবুর মুখে হাসি ফুটলো। বললেন, প্রস্তাবটা আমিই করবো ম করেছিলুম। তোমার মুখে শুনে ভারি আনন্দ পেলুম। 'চিত্রাঙ্গদা' করলে তু সবচেয়ে ভালো হাউস পাবে। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, দুদিনে তোমাকে অন্ত দশ হাজার টাকা এনে দেবো। তুল-কালাম ক'রে দেবো কলকাতা!

রমেনবাবু গলার আওয়াজটা মোটা। এ ঘরে পর্যন্ত তার প্রতিধ্বনি হচ্ছিল শান্তনু আর হাসি চাপতে পারলো না, সে গুটি গুটি এ ঘরে এসে দাঁড়ালে রমেনবাবু বললেন, বাহবা, সাবাস,—আমি ত' খবর পাইনি আপনি এখানে

আরে মশাই, আপনার জন্যেই তো আমাকে আসতে হোলো। ভাবছিলুম কোথায় গেলে আপনার ঠিকানাটা পাওয়া যায়!

ঈশানী বললে, আপনি এখনও খবর পাননি, শান্তনু আমার খুব নিকট আত্মীয়। আমার মায়ের যিনি সাক্ষাৎ বৈমাত্রেয় ভাই, ও হোলো তারই শ্যালীর দেওরপো।

রমেনবাবু সোল্লাসে ব'লে উঠলেন, ওই যথেষ্ট, আর না বললেও চলবে! তাই ত' বলি এমন রাজপুত্তুর এলো কোথেকে,—হবেই ত, বংশের ধারা যাবে কোথায়? এতদিনে তোমার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি লোক পেলে! মিঃ চৌধুরী, বিশ্বাস করুন, মিহিজামের চেয়ে আপনার এখনকার চেহারা অনেক ভালো হয়েছে। ওঁকে অর্জুনের পার্টটা দিলে কেমন হয়? উনি কবি, শিল্পী, সুরসিক। কথাটা একবার ভেবে দেখো।

ঈশানী বললে, উনি বাড়ী ছেড়ে এসেছেন, এখানেই এখন থাকবেন। ওঁর দাদার সঙ্গে মামলার একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন। ওঁর পক্ষে এসব নিয়ে মাথা ঘামানো বোধ হয় সম্ভব নয়।

রমেনবাবু বললেন, কিন্তু সব জায়গায় রটে গেছে যে ওঁর মত বাঁশী নাকি আর কেউ বাজায় না। আমার ঘরে ফোনের পর ফোন। কাগজওলারা এসে চেপে ধরেছে।

শান্তনু হাসলো। বললে, মনে হচ্ছে প্রচার চক্রান্তে প'ড়ে গেছি।

ঈশানী চকিত কটাক্ষে একবার রমেনবাবুকে লক্ষ্য ক'রে হেসে বললে, তুই বাঁশী বাজাতে পারিস একথা স্বীকার ক'রেই যে মাটি করেছিস।

তুই! পলকের মধ্যেই শান্তনুর চোখের তারা উভয়ের উপর দিয়ে ঘুরে গেলো। অতি নিকট অন্তরঙ্গতাটা রমেনবাবুর কানে বাজুক, এটা ঈশানীর ইচ্ছা। শান্তনু বললে, আমি কি জানি তোদের প্রতিষ্ঠানের লোকেরা আমাকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলবে?

তুই সম্ভাষণটা শুনে ঈশানী পুলকিত হ'য়ে উঠলো। তুই চোখের টেলিগ্রাফের ভাষাটা শান্তনু বুঝেছে। ওকে ধন্যবাদ।

রমেনবাবু বললেন, কাজ হয়ে গেল, এবার আমি উঠবো, তাড়া আছে। ইং আরেক কথা।

রমেনবাবু উঠছিলেন, আবার বসলেন। উভয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালো তিনি বললেন, পুঁটুর মা'র সঙ্গে একটি মেয়ে আমার আপিসে তিন চারদিন ধ'রে আনাগোনা করছে,—ওদের ওই মুখুজ্যেপাড়ারই মেয়ে। নাম হোলো সুষমা।

ঈশানী বললে, আপনার ওখানে কেন?

তোমার সঙ্গে দেখা করবার ভয়ানক আগ্রহ তার। কিন্তু তোমার অনুমতি হ'লে ত' এখানকার ঠিকানা দিতে পারিনে। আজও আমার অপেক্ষায় সে বসে আছে, আমিই বসিয়ে রেখে এসেছি। গরীবের মেয়ে, লেখাপড়া মোটামুটি বে জানে। আই-এ পরীক্ষায় ফিজ দিতে পারেনি, সেজন্য পাসও করেনি!

ঈশানী বললে, আমার এখানে তিনি আসতে চান কি জন্য?

শান্তনু জবাবটা দিল, বোধ হয় প্রাণের দায়ে!

ভুল বুঝলেন রমেনবাবু। ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন, না না, চৌধুরী মশাই প্রাণের দায়ে নয়। তা যদি হোতো, তাহ'লে আমার মাসতুতো ভাইদের ব্যাঙ্ক আপিসে মেয়েটির একটি চাকরী জুটিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু মেয়েটির বোধহ অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।

শান্তনু প্রশ্ন করলো, বিবাহিত মেয়ে?

ঈশানী তামাসা ক'রে বললে, অবিবাহিত হ'লে বুঝি তুই তার মাথায় সিঁ চড়াতে বলতিস?

হো হো ক'রে রমেনবাবু হেসে উঠলেন। পরে বললেন, বয়েসটা আমার এ বেশী হয়েছে যে, মেয়েছেলের কপালের দিকে আর চোখ পড়ে না।

ঈশানী খুব হেসে উঠলো। শান্তনু একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

রমেনবাবু পুনরায় বললেন, আর তাছাড়া আজকাল ওদের আর চেনাও যা না। বিয়েওলা মেয়ে সিঁদূরের চিহ্নটুকু আজকাল চুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং মাথার ঘোমটাও ফেলে দিচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী সিনেমায় যায়, যেন তরুণী শ্যা আর নব্য ভগ্নীপতি। ঠিক যাকে বলে, ভগ্নীপতিব্রতা।

তার ঠোঁট ওলটানো দেখে শান্তনু এবার হৈ হৈ ক'রে হেসে উঠলো।

রমেনবাবু থামলেন না, এক নিশ্বাসেই ব'লে গেলেন, আর ওই ছাখো নতুন বিধবাদের। সিঁদুর নেই বটে, কিন্তু পরনে শাড়ী আর জামা, পায়ে চমৎকার জুতো, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। এক হাতে রিষ্টওয়াচ, অন্য হাতখানা কুমারী মেয়েদের মতন। ফলে, হয়েছে কি জানো? মেয়ে জগতে ভয়ানক কমপিটিশন! এর ন্যায্য পাওনা ও কেড়ে নিচ্ছে! তবে ওরই মধ্যে আবার একটু পার্থক্য! সেটা হোলো মুখে রং মাখানো।

দুজনে হেসে একেবারে লুটোপুটি। রমেনবাবু বললেন, আমাদের কিন্তু ওসব দেখতে নেই,—তবে চোখে পড়ে কিনা! সধবারা রং মাখে না, তবে একটু পাউডার ঘষে, কেননা তাদের ত' কাজ হাসিল হয়ে গেছে। বিধবারা পাঁচ রকম রং মাখতে এখনও একটু লজ্জা পায়। সুতরাং কুমারীরাই এখন আষ্টে-পৃষ্ঠে মুখের ওপর রংয়ের পোঁচড়া বুলোয়!

ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত হাসি ওদের ফেনিয়ে উঠলো। রমেনবাবু এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহ'লে সুষমাকে কি বলবো?

অপাঙ্গে ঈশানী একবার শান্তনুর দিকে তাকালো। তারপর বললে, বেশ ত,' আলাপ করতে দোষ কি, কেমন শান্তনু?

শান্তনু বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তাঁর যখন অত আগ্রহ!

ঈশানী বললে, আপনি তাকে পাঠিয়ে দিন এখানে।

রমেনবাবু সম্মতি জানিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

ওরা দুজনে চুপ ক'রে ব'সে রইলো কতক্ষণ। এক সময় ঈশানী বললে, যাক, বাঁচলুম আমি।

শান্তনু তাকালো। ঈশানী বললে, হঠাৎ তোকে এখানে দেখলে ওদের খটকা লাগতো। একটা কৈফিয়ৎ রইলো মাঝখানে, ভালোই হোলো।

শান্তনু বললে, তোর কোনও ভয় কি নেই?

ঈশানী হাসলো। বললে, পিঁপড়েকে কেউ ভয় পায় না, কিন্তু কামড়ের ভয়ে পা সরিয়ে নেয়: ওরা একবার যখন শুনলো তখন আর কখনো কৌতূহলী

হবে না। তা ছাড়া যে কারণেই হোক, আমার ওপর ওদের বিশ্বাসও আছে। তোর দিক থেকেও আড়ষ্টতা না থাকে, এও আমার ইচ্ছে।

শান্তনু বললে, এ সব চোখ টেপাটিপির জন্যে মনের মধ্যে যদি গ্লানি জ'মে ওঠে?

সেটা মনের দোষ, শান্তনু।

শান্তনু বললে, ধর্ আমি যদি তোর সম্বন্ধে অন্যত্র চোখ টিপে রাখি, সেটা কি আমার নোংরামির পরিচয় হবে না?

একথা ওঠে না।—ঈশানী বললে, মানুষ সবচেয়ে অন্তরঙ্গর কাছে সবচেয়ে বেশী দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে রাখে, কেননা উভয়ের মধ্যে একটা বিশ্বাসের ক্ষেত্র পাকা হয়ে আছে। কেউ কারুকে কখনও প্রতারণা করবে না। এখানেই মনের শুচিতার কথা ওঠে, শান্তনু। তুই কখনও নোংরায় নামবিনে, তোর চেয়ে আমি একথা বেশী ক'রে জানি ব'লেই তোর হাতে নিজেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, তা' জানিস?

হাসিমুখে শান্তনু বললে, এটা কিন্তু শাসনের মতন শোনাচ্ছে।

শাসন! তোকে? আবার আমাকে জন্মাতে হবে।

নন্দ ঘরের মধ্যে এলো। বাইরে চৈত্র মাসের রোদ দেখে রামতীরথ ওর হাতে অরেঞ্জ-জুস পাঠিয়েছে দু'গেলাস। নন্দ হেঁট হয়ে ট্রে থেকে গেলাস দুটো নামিয়ে রেখে চ'লে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে তেওয়ারী এসে জানালো, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ওপরে ডেকে আনো।—ঈশানী জবাব দিল।

তেওয়ারী যাবার পর চুপ ক'রে গেল ওরা দুজন। ঠিক যেমনটি বসেছিল ঈশানী, ঠিক তেমনিভাবেই ব'সে রইলো, এতটুকু তার চাঞ্চল্য দেখা গেল না। শান্তনুর মুখখানা গম্ভীর। আজ সে তার জীবনের একটা অত্যন্ত বিরক্তিকর সমস্যার নিষ্পত্তি দেখতে চায়। শুধু বললে, আমি কি ওধারে যাবো?

ঈশানী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, মনের অগোচরেও যদি অন্যায় বোধ থাকে াহ'লে যেতে পারিস।

শান্তনু গেল না, স্থির হয়ে একই ভাবে ব'সে রইলো।

সিঁড়ি দিয়ে সটান উঠে এলো সুষমা। এদিক ওদিক তাকালো, চটিজুতোটা াইরে ছেড়ে রাখলো, তারপর পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলো।

এ কি! থমকে দাঁড়ালো সুষমা। শান্তনুর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললে, মি এখানে?

শান্তনু বললে, এ বাড়ীটা প্রায় আমার নিজের, আমিই তোমাকে এখানে াকতে পাঠিয়েছিলুম। বসো।

হাসিমুখে তাকালো ঈশানী। বললে, তোমারই নাম সুষমা?

সুষমা নমস্কার জানালো। তারপর বেতের সোফায় বসলো। ব'সে বললে, াপনার সঙ্গেই দেখা করবার চেষ্টা করছিলুম। ওঁকে এখানে দেখবো ভাবিনি।

ঈশানী বললে, ওর সঙ্গে কবে থেকে তোমার চেনাশোনা হোলো?

তা পাঁচ ছ'মাস হবে। কিন্তু ওঁর মুখ থেকে একবারও আপনার কথা নিনি।

শোনবার মতন নয় ব'লেই বোধহয় শোনোনি।

এ কি বলছেন?—সুষমা অনুযোগ করলো, আপনার দেশজোড়া নাম, কত াক মাথা খোঁড়ে আপনাকে দেখবার জন্যে। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া ত' াভাগ্য!

ঈশানী বললে, কে কে আছেন তোমার বাড়ীতে?

আমার বাবা বেঁচে নেই, তবে মা দাদা বৌদি,—এঁরা আছেন। আমাদের বস্থা মোটেই ভালো নয়।

শান্তনু একটু হাসলো। বললে, গরীবের ওপর দয়া করা ঈশানীর একটা ? অভ্যেস, তুমি সব কথা বলতে পারো, সুষমা।

থাম্—ঈশানী তাকে ধমক দিল। তারপর বললে, এ হতভাগার সঙ্গে তামার কোথায় আলাপ হোলো, সুষমা?

সুষমা মাস ছয়েক আগেকার একটি বিশেষ দিনের কথা স্মরণ ক'রে এক সলজ্জ হাসি হাসলো। বললে, একজিবিশনে গিয়েছিলুম দাদা আর বৌদি সঙ্গে। উনি প্রত্যেক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এমন তামাসা করছিলেন উপস্থিত সকলেই খুব আনন্দ পাচ্ছিল। সেখানেই ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ওঁকে আমরা নেমন্তন্ন করেছিলুম।

শান্তনু বললে, প্রথম থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেল আমি লোভী।

ঈশানী বললে, পুরুষমাত্রেই তাই! তোমাকে বুঝি অনেক রকম মিষ্টি ক শোনাতো!

সুষমা বললে, একদিনও না। ওঁর তামাসাই বলুন, আর চেহারাই বলু সবই বাইরের, ভেতর একদম ফাঁপা!

ঈশানী বললে, আমারও তাই বিশ্বাস। আরো একটা উপসর্গ আছে ভা হয়ত তুমি বুঝতে পারোনি। জ্ঞানের ভান করে, কিন্তু আসলে অজ্ঞান। মন ব' কোনো পদার্থই নেই। ওর ওপর নির্ভর ক'রে আমি এতবার ঠকেছি, কি বলবে

শান্তনু বললে, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ঈশানী।

হোক না কেন, তোর কীর্তির কথা শুনুক সবাই। আমার এক ব শিলভিয়াকে এমন গাছে তুলে দিয়ে এলো যে, সে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জ পাগল। মেয়েরা বড্ড ঠকে ওর হাতে!

সুষমা একটু যেন হতচকিত হয়ে গেল। কিন্তু শান্তনু আর এখানে তিষ্ঠ পারলো না। বললে, নাঃ এবার দেখছি আমার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে টানাটা চলছে। আমি ওঘরে যাচ্ছি, দরকার হ'লে ডেকো।—এই ব'লে সে উ চ'লে গেল।

সুষমা এবার বললে, আপনার কাছে ভয়ে ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু আপ যে এত চমৎকার, আমার জানা ছিল না। শান্তনুর সম্বন্ধে আপনি যা বললে এসব আমার কখনও মনেই আসেনি।

দুই নারী এবার মুখোমুখি বসলো। ঈশানী প্রশ্ন করলো, ওর সম্ব তোমার মনে কি কোনো কথা আছে, সুষমা?

এমন ক'রে জিজ্ঞেস করলে আমি মিছে কথা বলতে পারবো না।

ঈশানী কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, তাহ'লে ওকে তুমি বিয়ে করো না কেন?

নতমুখে সুষমা বললে, আমার মাও সেজন্যে খুব ব্যস্ত, কিন্তু শান্তনু বিয়ে করতে চায় না।

কেন? তুমি ওর প্রিয় হ'তে পারোনি?

আমার দুর্ভাগ্য সেটা।

ঈশানী প্রশ্ন করলো, শান্তনু কি কোনোদিন কোনো আশ্বাস তোমাকে দিয়েছে?

সুষমা বললে, না।

তোমার বাড়ীর আশেপাশের লোক তাহ'লে শান্তনুকে পাড়ার জামাই ব'লে মনে করে কেন? শান্তনু কি মধ্যে মাঝে থাকে তোমাদের ওখানে?

না না, সেদিকে ওঁর একেবারেই মন নেই। তবে আমাকে নানা লোকে টিটকারি দেয়, নিন্দে রটায়, তাই দু'চার দিন মাথায় সিঁদূর দিয়ে ওঁর বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়েছিলুম। উনি তখন মিহিজামে।

ঈশানী বললে, তারপর?

সুষমা বললে, এই নিয়ে ওঁর বাড়ীতে খুব গণ্ডগোল ঘটে। আমি সেজন্যে খুবই লজ্জা পেয়েছি।

ছেলেমানুষ তুমি, এখানে মস্ত ভুল করে ফেলেছ। সিঁদূর হোলো একটা মস্ত সংস্কার। এটার সঙ্গে জীবনের একটা বিবর্তন জড়ানো। এ কাজটি তোমার পক্ষে ভালো হয়নি। এখন তুমি কি করতে চাও, সুষমা?

সুষমার দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল এলো। কম্পিত কণ্ঠে বললে, আপনি আমাকে ব'লে দিন।

ঈশানী অনেকক্ষণ পর্যন্ত কি যেন ভাবতে লাগলো। তারপর বললে, তোমার বয়স কত, ভাই?

উনিশ এখনো হয়নি।

তোমার বাড়ীর অবস্থা সত্যিই কি রকম?

সুষমা অকপটে বললে, খুবই শোচনীয়।

ঈশানী বললে, শান্তনুর সঙ্গে কথা ব'লে আমার যে সন্দেহে হয়েছিল, তোমার কথা শুনে সেটায় আমার বিশ্বাস হোলো। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করোনি, আমাদের দেশের বহু মেয়ে অভাব-অভিযোগের থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কোনো একটা অবলম্বন খোঁজে। যদি পায় তবে সেটাকেই আঁকড়ে ধরে। ভুল ক'রে নাম দেয়, ভালোবাসা! অনেক নির্বোধ ছেলে চাকরি না পেয়ে শাঁসালো শ্বশুর খোঁজে; অনেক মেয়ে দারিদ্র্য থেকে বাঁচবার জন্য বিয়ের লোভে প্রণয়াসক্ত হ'তে চেষ্টা পায়। কিন্তু এর সবগুলোই অস্বাভাবিক। ভালোবাসা এর ত্রিসীমানার মধ্যে নেই।

সুষমা বললে, শান্তনুকে দেখে কি আপনার মনে হয়, আমি ভুল করেছি?

ঈশানী বললে, এ আমার অনধিকার চর্চা, সুষমা। ওটা তোমাদের উভয়ের ভেতরের কথা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, শান্তনুর মনের খবর তুমি হয়ত ভালো ক'রে পাওনি। হয়ত একটা কোথাও ভুল থেকে যাচ্ছে।

সুষমা অনেকটা হতবুদ্ধির মতো ঈশানীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

এদিকে শান্তনুরও মনে স্বস্তি ছিল না। ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালো, সেটা জানা দরকার বৈকি। সুতরাং সে পুনরায় এঘরে এসে আগের চেয়ারখানতেই ব'সে পড়লো।

ঈশানী শান্তনুর দিকে ফিরে তাকালো। বললে—শান্তনু, যে কারণেই হোক না কেন, মেয়েরা তোর কাছাকাছি এলে দুঃখ পায়।

শান্তনু বললে, সেইজন্যেই ত' পালিয়ে বেড়াই।

কিন্তু এরকম অবস্থা যদি দাঁড়ায়, এর একমাত্র প্রতিকার কি জানিস?

সুষমা এবং শান্তনু দুজনেই ঈশানীর দিকে চেয়ে রইলো। ঈশানী বললে, আমার একান্ত অনুরোধ, সুষমাকে তুই বিয়ে কর।

শান্তনু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তার স্বভাব-সংযম সে-উত্তেজনাকে প্রকাশ করতে দিল না। শুধু শান্তকণ্ঠে সে বললে, সুষমা, এই

ছ'মাসের মধ্যে আমার ব্যবহারে আচরণে এমন কি কিছু ছিল, যার জন্ম আমাদের বিয়ে হওয়া উচিত তুমি মনে করো?

প্রথমটা সুষমা চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, আমার মা তোমাকে প্রথম অনুরোধ করেন। তুমি তার উত্তরে বলেছিলে, আপনার মেয়ের জন্য কিছু ভাবতে হবে না।

শান্তনু বললে, সেদিন থেকে কি আমি তোমার চাকরির চেষ্টা করিনি? তোমার দাদার চিঠির উত্তরে আমি কি লিখেছিলুম? আমার কথায় কি কোনো আশ্বাস ছিল? আমি বারম্বার বলেছি যে, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো, আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা হওয়া আর বাঞ্ছনীয় নয়।

ঈশানী মাঝখানে বললে, চাকরী একটা পেলে তুমি করবে, সুষমা?

সুষমা বললে, আমাকে কে চাকরি দেবে?

শান্তনু বললে, চাকরি করবে কি না তাই বলো।

হ্যাঁ, করবো।

ঈশানী বললে, তুমি সকলের আগে একটা চাকরিই নাও ভাই। পৃথিবী তোমার চোখে আরো স্পষ্ট হোক, রং ধুয়ে মুছে যাক। উপার্জনের মানেই হোলো, জীবন সম্বন্ধে রূঢ় অভিজ্ঞতা। তুমি ছেলেমানুষ, পড়াশুনো করেছ বটে, কিন্তু জীবনের পাঠ তুলে নাও এই কলকাতার পথঘাট থেকে। দেখবে আরেকটা নতুন কল্পনা উঠেছে তোমার মনে। তুমি বড় হ'তে চাইবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জোর পাবে, নিজেকে কঠিন ক'রে জানতে শিখবে। সেটা কি সম্মানের নয়, সুষমা?

সুষমার মুখে উদ্দীপনা ফুটে উঠলো। শান্তনু যোগ ক'রে দিল, তোমার মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন, সেটা কি ভালো না? তোমার দাদা আর ভারাক্রান্ত বোধ করবেন না, বৌদিদির মুখে হাসি ফুটবে, আত্মীয়স্বজন লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাবে। প্রথম থেকেই একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকবে। এটা কেমন লাগে তোমার?

উদ্দীপ্ত মুখে সুষমা বললে, কিন্তু চাকরি পেলে ত!

দাঁড়াও—ব'লে ঈশানী উঠলো। ও পাশের টেবলে গিয়ে ব'সে টেলিফোনের রিসিভারটা সে কানে তুলে নিল। তারপর একটা নম্বর চাইলো।

সুষমা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো তার দিকে।

হ্যালো, রমেনবাবু?

রমেনবাবুর সাড়া এলো ফোনে। ঈশানী বললে, হ্যাঁ, আমি। শুনুন, সুষমার সঙ্গে কথা বললুম। আপনাদের ওই ব্যাঙ্কের আপিসে ওর কাজটা ক'রে দিন্। কিন্তু ওদের অভাব-অভিযোগের সংসার, মাইনেটা একটু ভালো হয় যেন। প্রথমটা শ' দেড়েক টাকার কম না হয়। মেয়েছেলের খরচ বেশী মনে রাখবেন। সামনের সোমবার থেকে সুষমা জয়েন্ করতে চায়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আরেক কথা, পুঁটুর মাকে আপনি একটু সতর্ক ক'রে দেবেন। সুষমার সম্বন্ধে কোনো কানাকানি কিম্বা আজে-বাজে কথা নিয়ে সে যেন মাথা না ঘামায়।—যাক, আমি তাহ'লে সুষমাকে পাঠিয়ে দেবো, কেমন? ধন্যবাদ।

রামতীরথ এবার বিকালের চা এবং গরম গরম শিঙ্গাড়া এনে হাজির করলো। ঈশানী নিজের হাতে সযত্নে এক প্লেট সাজিয়ে সুষমার দিকে এগিয়ে দিল। এমন অযাচিত স্নেহের আস্বাদ সুষমা এ জীবনে কখনও পায়নি। সেও উঠে দাঁড়ালো এবং এক পা এগিয়ে বললে, আপনি বসুন, আমি আপনাদের চা ঢেলে দিই।

ওর মুখ-চোখের চেহারায় কোনো বিমর্ষতা নেই লক্ষ্য ক'রে শান্তনু এতদিন পরে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হোলো। ঈশানী উভয়ের দিকে একবার তাকিয়ে সকৌতুকে একবার বললে, শান্তনুর একটা ভালো ক্যামেরা ছিল, তুমি জানো, সুষমা?

সুষমা বললে, জানি, ওটা দিয়ে উনি রোজগার করেন।

কিন্তু ওটা কিছুদিন আগে ও আমার কাছে বিক্রি করেছে। আমার ধারণা আমি ঠকেছি। সে যাই হোক, তার থেকে কিছু টাকা তোমার নিশ্চয় পাওয়া দরকার।

আমি পাবো কেন বলছেন?

ঈশানী হাসলো। বললে, তোমার নতুন চাকরি হোলো, সেই আনন্দে

শান্তনু তোমাকে কিছু উপহার দিতে চায়। একটু আগেই ও আমাকে ব'লে রেখেছে। বসো, আসছি।

ঈশানী উঠে গেল। পিছন দিকে একবার তাকিয়ে শান্তনু এবার বললে, আমার বিশ্বাস চাকরি পেলে তোমার বর্তমান সমস্যা অনেকটা ঘুচবে। অন্তত দৈনিক দুর্ভাবনাটার লাঘব হবে।

সুষমা বললে, তুমি এখন কি করবে?

ঠিক জানিনে, তবে এঁর এখানে হয়ত কিছু কাজের ভার আমাকে নিতে হবে। অবিশ্যি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে।

তোমার সঙ্গে কি আমার দেখাও হবে না?

নিশ্চয় হবে। শান্তনু বললে, কিন্তু দেখাশোনার ফলে যদি একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে দেখাশোনা অল্পই হওয়া ভালো, সুষমা!

সুষমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, ও পাড়ায় অন্তত আমাদের পক্ষে আর থাকা চলবে না, অন্যত্র ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে যেতে হবে। সে আমি ব্যবস্থা করতে পারবো, তবে ঈশানীদিকে ব'লো,—আমি তাঁর কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ রইলুম। তাঁর ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।

তোমার কাছে আমারও ঋণ রয়ে গেল, সুষমা।

আমার কাছে? কিসের ঋণ?

তুমি আমার ব্যবহারের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি অনায়াসে ক্ষমা ক'রে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেলে, এর জন্য আমিও তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখলুম।

সুষমা চুপ ক'রে রইলো। ছেলেমানুষের দুটো চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। কিন্তু কিছু বলবার আগেই ঈশানী এসে ঘরে ঢুকলো। তার হাতে মাঝারি বড় রকমের একটা সুটকেস।

আহারাদি ও চা পান সেরে এক সময়ে সুষমা উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমি যাই।

ঈশানী বললে, এর মধ্যে?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বাইরে আছি, মা হয়ত ভাবছেন। সন্ধ্যের আগে না ফিরলে তিনি ভারি ব্যস্ত হন্।

স্মিষ্টকণ্ঠে ঈশানী বললে, ভারি আনন্দ হোলো তোমাকে দেখে। তোমার যে একটুখানি সুবিধে হোলো, এটা আরো আনন্দের কথা।—নন্দ ?

ডাক শুনে নন্দ এসে দাঁড়ালো। ঈশানী বললে এটা গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়। তেওয়ারীকে বল্ দিদিমণিকে পৌঁছে দিতে।—সুষমার দিকে ফিরে সে পুনরায় বললে, এ সুটকেস তোমার, সুষমা। ওর মধ্যে তোমার দিদির সামান্য কিছু উপহার এবং কিছু টাকা আছে, তুমি গ্রহণ ক'রো। তোমার চাকরি হোলো বটে, কিন্তু মেয়েমানুষের কত যে অসুবিধে, সে আমি জানি। তুমি যদি কোনোদিন কোনো বিপদে পড়ো, আমাকে ডেকো. আমার যথাসাধ্য সাহায্য তুমি পাবে।

শান্তনু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পিছনে।

ঈশানী পুনরায় বললে, হ্যাঁ, আরেক কথা। শান্তনু যে তোমার সঙ্গে এতটুকু বিশ্বাসঘাতকতা কি প্রতারণা করেনি, এটা আমার জানা দরকার ছিল। আচ্ছা, এসো ভাই।

শান্তনু পিছনে পিছনে গেল সুষমাকে গাড়ীতে তুলে দিতে।

বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে অপলক চক্ষে ঈশানী ওদের দুজনকে লক্ষ্য করছিল, ওরা বুঝতে পারেনি। গাড়ীতে উঠলো সুষমা, নন্দ সুটকেসটা রেখে দিল তার পাশে। তেওয়ারী দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। শান্তনু একটি কথাও বললে না। সুষমা মুখ ফিরিয়ে নিল। গাড়ী বেরিয়ে গেল ফটক পার হ'য়ে।

ঈশানীর চোখ দুটো ছল ছল ক'রে এলো। কুঁড়িটা শুকিয়ে গেল, ফুল ফুটলো না। প্রথম প্রণয়-চেতনার অপমৃত্যু!

চন্দ্র তার আপন কক্ষপথে বার বার ঘুরে গেছে। আবার এসে পৌঁছলো শুক্লপক্ষ।

শান্তনু সকালের দিকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে হয়ত সন্ধ্যায়।

গাড়ী সঙ্গে নেয় না, ওটা বন্ধন দশার সঙ্কেত। মুক্তির পথটা অবারিত না থাকলে তার চলে না। তার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া চলবে না, কোনওপ্রকার শাসনে সে ধরা দেবে না। উগ্র আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে না পারলে শান্তনুর স্বস্তি নেই। নতুনের মধ্যে হোলো এই, শান্তনু মোটর ড্রাইভ করতে শিখেছে। আর কিছু না হোক, ঈশানীর সঙ্গে যদি তার বনিবনা না হয়, তবে মোটর ড্রাইভারি কাজ পাবে সে যেখানে-সেখানে। একশো টাকা মাইনে পাবে ফেলে-ছড়িয়ে। শান্তনু আর কাউকে পরোয়া করে না।

সুষমার চাকরি হয়েছে, রমেনবাবু এর মধ্যে কবে যেন জানিয়েছেন। প্রায় পৌনে দুশো টাকা মাইনে, পরে আরো বাড়বে। নতুন বাড়ীতে সুষমারা উঠে গেছে এবং বেশ মন দিয়ে চাকরি করছে। খবরটা সকলের পক্ষেই উৎসাহজনক।

রাত্রের দিকে রমেনবাবুর সঙ্গে ফোনে ঈশানীর আলাপ হচ্ছিল। কলকাতার 'শো'তে ঈশানী নামবে মাত্র এক দিনের জন্য। কিন্তু দিল্লী থেকে লোকেরা যে পীড়াপীড়ি করছে, তার উপায় কি? সেখানে একটি হাউস চারদিন ধ'রে 'শো' দিতে চায়,—পনেরো হাজার টাকা গ্যারান্টি। এ ছাড়া দিল্লীর সমস্ত খরচ, যায় রাহা খরচ পর্যন্ত। চারদিনে মোট চারটে পালা দিতে হবে। রমেনবাবু বললেন, তুমি রাজি হয়ে যাও। তুমি দেখে নিয়ো ব্ল্যাক মার্কেটে পর্যন্ত টিকিট বিক্রি হবে!

হঠাৎ বাঁশীর আওয়াজ শুনে ঈশানী টেলিফোন ধরেই একটু সজাগ হয়ে উঠলো। সন্দেহ নেই, শান্তনুর বাঁশী। আজ সারাদিন সে বাড়ী ছিল না, কখন ফিরেছে জানাও যায়নি। ঈশানী তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা, রমেনবাবু, কাল আপনাকে ফাইন্যাল বলবো। আজ ছেড়ে দিচ্ছি।

রিসিভার রেখে ঈশানী উঠে এলো সোজা জ্যোৎস্নাহসিত বারান্দায়। এখানে দাঁড়ালে বিস্তৃত গগনলোক চোখে পড়ে। নিস্তব্ধ নয়, কোনো কোনো গাছে পাখী ডাকছে,—যাদের চোখে এখনও ঘুম আসেনি। নীচেকার পাঞ্জাবী পরিবার একটু আগে রেডিয়ো বন্ধ করে ঘুমোতে গেছে। নন্দ, রামতীরথ,

তেওয়ারী ইত্যাদি শুয়ে পড়েছে তাদের মহলে। ঈশানী চুপ ক'রে দাঁড়ালো। ঘর, বাড়ী, গাছপালা ছাড়িয়ে বাঁশীর মধুর তান ছুটে চলেছে দূরদূরান্তর পর্যন্ত। বাঁশী বাজাতে জানা এক বস্তু, কিন্তু তার সুরের ভিতর দিয়ে নিবিড় অনুরাগ প্রকাশ করা অন্য কথা। অন্তরের আদিম বেদনাকে প্রকাশ করার মীড়গুলি শান্তনু জানে। কিন্তু আশ্চর্য, ওর মধ্যে যেন বন্য অনুরাগ, ওটা যেন পরিচিত সুর-শ্রেণীর বাইরে। মাঝে মাঝে একটা ধুয়ো ধরছে, সেটা পার্বত্য। দুঃখের দহনে জ্বলে-পু'ড়ে না গেলে ওর বাঁশী বোঝা যায় না। অনেককালের অনেক কান্নাজর্জর হৃদয়ের হাহাকার না জানলে ওর বাঁশী ব্যর্থ।

ঈশানীর চোখে বাষ্প জমে উঠলো।

কিন্তু তার সজাগ মন, সে-মন ভাবস্রোতে ভাসা নয়। নিজের পদক্ষেপ সে গুণতে জানে,—ভ্রান্ত পা ফেলা নয়! তার নাচের অভ্যাস তাকে নিরাপদ এবং সঠিক পা ফেলতে শিখিয়েছে। পা শিথিল নয়, বরং অতি সতর্ক। নিজের হৃদয়াবেগ তার করায়ত্ত। এই পর্যন্ত, এর বেশী নয়,—এই তার মূলমন্ত্র। সুতরাং নিজের সম্বন্ধে তার যেমন ভয় নেই, অন্যকেও তেমনি সে ভয় পেতে দেয় না।

ঈশানী ধীরে ধীরে পা বাড়ালো—যেদিক থেকে শান্তনুর বাঁশী শোনা যাচ্ছিল। নীচের সকল ঘর শূন্য, কোথাও নেই শান্তনু। ঈশানী ছাদের সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে উঠে গেল। সংশয় শঙ্কা সঙ্কোচ,—কোনোটাই তার পা জড়িয়ে ধরে না। নির্ভয় সে, সে অভয়মন্ত্র জপ করেছে চিরদিন। ভয়কে সে দেখেছে, জেনে এসেছে। অপমৃত্যু কা'কে বলে সে জানে। আপন মৃত্যু দাঁড়িয়ে সে দেখেছে বারম্বার। এই জ্যোৎস্নার সোমরসধারা তার অস্থিমজ্জার মধ্যে নিবিড় বিহ্বলতা এনেছে কতবার; সুখের কান্নায়, দুঃখের আনন্দে তার এই বিবশ শিথিল তনুলতা লুটিয়েছে ভূমিতলে, বেদনা আর দুঃখের মধ্যেও শিহরণ লেগেছে পুলকের, বুকের মধ্যে তা'র কাঁপন লেগেছে ভূমিকম্পের। তার সমগ্র সত্তা দেহের বাঁধন ডিঙ্গিয়ে পাখীর মতো অপ্সরা লোকে উধাও হয়ে গেছে, নূপুরের মতো মৃত্যু নেচেছে তার দুই চরণে। দেখেছে সে নিজের সেই অপরূপ রূপ। দেখেছে সে নিজের অভিসম্পাত!

কতক্ষণ পরে শান্তনুর বাঁশী থামলো। যক্ষবিরহীর চোখের ওপর দিয়ে মেঘের দল ভেসে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, আকাশে এনে দিচ্ছে একটা ধূসরতা,—যেটা বিভ্রম লাগায় কাকজ্যোৎস্নার। রজনীগন্ধারা যার সন্ধান পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে জাগে। শান্তনু বাঁশী নিয়ে একবার চুপ ক'রে দাঁড়ালো।

এগিয়ে এলো ঈশানী। শান্তনু চমকে পাশ ফিরলো।

তুই ? এখনো জেগে ?

ঈশানী হেসে উঠলো। বললে, এমন ক'রে বাঁশী বাজালে বিছানায় কেমন ক'রে স্থির থাকি ?

শান্তনু সলজ্জভাবে বললে, অনেকদিন বাজাইনি। তোরা ত' নাচ গান বাজনা নিয়ে থাকিস, আমি কত সামান্য। আমার নিজের পরিচয় কিছু নেই।

ঈশানী বললে, আছে, কিন্তু তুই টের পাসনে।

শান্তনু মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

ঈশানী বললে, হৃদয় ব'লে তোর কোনো পদার্থ নেই। যেভাবে তুই সুষমাকে বিদায় দিয়েছিলি, পৃথিবীর কোনো পুরুষ তেমন ক'রে অনাঘ্রাত ফুলকে অবহেলায় সরিয়ে দেয়নি কোনোদিন। মেয়েমানুষের সব অহঙ্কার তোর সামনে ঘুচে গেল।

কিন্তু আমার এ পরিচয়টা কি ভালো ?—শান্তনু শুনতে চাইলো।

ভালো-মন্দ আমি জানিনে। তুই খেলতে ব'সে খেলা দেখিস শুধু, খেলায় মাতিসনে। তোর জন্যে যদি কারো বুক ভেঙ্গে যায়, তুই দেখতে পাস তার মধ্যে জীবনবিধাতার কৌতুক। তোর জন্যে কারো চোখের জল পড়লে তুই পাস একটা অদ্ভুত রস। কেউ ভালোবাসলে তুই সেটাকে বন্ধনদশা মনে করিস ; ভালোবাসা না পেলে তুই ছুটিস তার পিছু পিছু। তুই কেবল ভালোবাসিস নিজেকে, তাই পদে পদে আঘাত বাঁচিয়ে চলিস। আনন্দ গ্রহণ করিস শুধু, কিন্তু দান করিসনে। রসের কল্পনায় তুই অভিভূত হয়ে যাস, কিন্তু গা ভাসাতে ভয় পেয়ে যাস রসের প্লাবনে। তোকে নিয়ে কি করি বল্ ত' ?

মুখ তুললো ঈশানী। ধবধবে শাদা শাড়ী আর শাদা জামা তার পরনে, চুলের রাশি পিঠের দিকে হাওয়ায় উড়ছে, মুখখানা যেন মধুলাবণ্যের

মরণশয্যা,—আয়ত ছুটি নিমীলিত চোখ যেন অচেতন ছুটি ভ্রমরের মতো গভীরের দিকে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সেই দিকে অপলক চক্ষে তাকিয়ে শান্তনু মৃদুগলায় বললে, কি ইচ্ছে তোর? কেন আমাকে এমন ক'রে ধ'রে রেখেছিস, সত্যি ক'রে বল্ দেখি?

তোকে যেতে দেবো না।

কেন? কোন্ অধিকারে তোর এখানে থাকবো?

ঈশানী ব'সে পড়লো। বললে, অধিকার যদি না থাকে, তুই সৃষ্টি ক'রে নিতে পারবিনে?

শান্তনু একটু থেমে বললে, তোর একথার রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ঈশানী। আমাকে এমন ক'রে কাঁপিয়ে তুলিসনে। তোর সমস্ত জীবনের আবরণ সরিয়ে তুই বাইরে এসে দাঁড়া, তোকে ভালো ক'রে দেখতে দে, —আমাকে এমন ক'রে অস্থির করে তুলিসনে?

ধরা গলায় ঈশানী বললে, কি জানতে চাস তুই?

তোর অস্থিমজ্জা মেদ মাংস, তোর প্রতি রক্তকণা, প্রতি অণুপরমাণু,—ন জানলে আমি স্থির থাকতে পারছিনে। তুই নিজেকে প্রকাশ কর, সমস্ত আবর ঘুচিয়ে দে। অন্ধকার সরে' যাক, আলো জ্বলে উঠুক।

ঈশানীর গলার আওয়াজ এবার কেঁপে উঠলো। বললে, সব জানবার প তুই যখন কেবল ঘৃণা রেখে চ'লে যাবি, আমি সেই বোঝা বয়ে বেড়াবে চিরদিন?

শান্তনু ওর কাছে এসে বসলো। বললে, ছি ছি, এর চেয়ে আমাকে ধিক্কা দে তুই। আমার হাত থেকে এত বড় অবিচার পাবার আগে তোর যেন মৃত্যু হয়। এ সব তুই কি বলছিস্?

ঈশানী আঁচলে চোখ মুছলো। পুনরায় কান্নাজড়ানো কণ্ঠে সে বলে মানুষের অবিচার আমার মাথা ছাপিয়ে উঠেছে, কিন্তু দীন-দুঃখী হতভাগী রূপটাই কি শুধু তার পুঁজি, ওটাই কি তার শেষ কথা? আমার অনেক আছে তবে কেন উপবাস ক'রে মরতে বসলুম, একথার জবাব কেউ দেয় না।

শান্তনু বললে, আমি তোর কোন্ কাজে লাগতে পারি বল্?

ঈশানী বললে, তোকে এনে বসিয়েছি তোর পায়ে মাথা খুঁড়বো ব'লে। তুই ভেঙে দে সব—আমার আশ্রয়, সংস্কার, ধ্যান-ধারণা, আমার সব বাঁধন। আঘাত করতে যেন তোর হাত না কাঁপে, দয়া-মায়া বিবেচনা কোনো কিছু যেন তোর নির্দয় মনকে আচ্ছন্ন না করে। দড়িদড়া টান মেরে ছিঁড়ে তুই আমাকে অকূলে ভাসিয়ে দে, আমার মুক্তি হোক।

পুরুষের নৈতিক দায়িত্ব শান্তনু ভোলেনি। জ্যোৎস্নাজড়ানো এই মায়াকাননে অবলুণ্ঠিত এই অপ্সরার বিহ্বল তনুলতার দিকে চেয়ে সে নিজেকে সংযত ক'রে রাখলো কঠিন বাঁধনে। শুধু বললে, কিসের থেকে মুক্তি চাস তুই?

ছাদের মেঝের উপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে ঈশানী বললে, লোহার শেকলে আমি বাঁধা, তুই সে-বাঁধন খুলে দে। আমার বিশ্বাসের হাত থেকে আমি মুক্তি চাই, আমার অতীত জীবনের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলে পালাতে চাই।

শান্তনু চুপ ক'রে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললে, এবারে ওঠ্, ঈশানী, —অনেক রাত হয়েছে।

আগে তুই কথা দে?

দিলুম।

কথা দে আমি যেখানে তোকে নিয়ে যাবো, তুই যাবি?

শান্তনু বললে, সে আবার কোন্ চুলোয়?

ঈশানী বললে, যেখানে আমার মৃত্যু হয়েছে। যেখানকার চিতার আগুনে আমার ইহকাল পরকাল জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

শান্তনু এতক্ষণে হাসলো,—রাহা খরচ পেলে সেখানে যেতে রাজি আছি!

৬

কে না জানে মানব বংশপরম্পরায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনের কাহিনী প্রতি মুহূর্তে অতীতের অন্ধকার অবলুপ্তির পথে বিলীন হয়ে চলেছে! সভ্যতার ইতিহাস মানেই ত' মানুষের গল্প। সেকথা ঈশানী-শান্তনু জানে বৈ কি বিবর্তনে, ইতিহাসে, পুরাণ-মহাকাব্যে,—সর্বত্র জীবনেরই জালবোনা। মানুষেরই কাহিনী লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হাজার হাজার বছর ধ'রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। ঈশানী শান্তনু হোলো তারই ছোট ছোট ক্ষুদ্র অংশ।

কিন্তু বছর দশেক আগে বাঙ্গলার অতি দুর্গতি-দুর্দিনের মধ্যে কলকাতা থেকে মাইল কয়েক দূরে যে ভিন্‌দেশী তরুণ যুবকটিকে গ্রামের পথে প্রথম দেখা গিয়েছিল, সে শান্তনু নয়, ভিন্ন ব্যক্তি। ছেলেটি অতি প্রিয়দর্শন এবং স্বাস্থ্যবান সুকুমার। জাতিতে বাঙ্গালী, কিন্তু পশ্চিম প্রদেশে মানুষ, বাঙ্গলায় এসেছে এই প্রথম। ফলে, তার চোখে বাঙ্গলার গ্রামের শোভা অনন্ত বিস্ময় নিয়ে হাজির হয়। তাল-তেঁতুল-নারিকেল কুঞ্জ দেখে সে যেখানে সেখানে থমকে দাঁড়ায় স্থির হয়ে; বিস্তৃত দীঘি আর সরোবরের স্বচ্ছ শান্ত জলরাশির উপর শ্বেত ও রক্তিম পদ্মের অজস্র সৌন্দর্যের উপর দিয়ে রঙ্গীন প্রজাপতিরা যখন নৃত্য ক'রে বেড়ায় ছেলেটি হতবুদ্ধির মতো চেয়ে থাকে। গাঙ-চিল আর মাছরাঙ্গারা ঘুরে বেড়ায়, বাবুই পাখীরা বাসা বাঁধে, দোয়েল শ্যামা পাপিয়ার নিত্য কূজন গুঞ্জন, নৌকার মাঝির গান, বাউলের একতারায় ঝুমুর নাচ, মাঠে মাঠে তার সবুজ পশমের আস্তরণ, বন-বাগান-আম্রকুঞ্জ,—সমস্তটা মিলিয়ে ছেলেটি যেন বিস্ময়-বিমূঢ়। কিন্তু এই ছেলেটির সর্বাঙ্গে সামরিক পোষাক দেখে গ্রামের লোক কাছাকাছি আসতে চায় না। ওই পোষাকটাই ছিল গ্রামের সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার পরিচয়ের পক্ষে প্রধান বাধা। ছেলেটিও একথা বুঝতো ব'লেই সে দূরে-দূরে স'রে থাকতো।

প্রকাণ্ড মাঠের অপর প্রান্তে মিলিটারীর মস্ত তাঁবু পড়েছিল। গত যুদ্ধের কালে সীমান্ত প্রদেশ হিসাবে বাঙ্গলার সর্বত্র প্রতিরোধ রক্ষাব্যূহ সৃষ্টি করা হয়েছিল, বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-পূর্বে যেদিকে সুন্দরবনের পরিপার্শ্ব। এই তাঁবুটিও তারই একটি অংশ। মস্ত একটি মাঠ ঘেরাও ক'রে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল। এখানে থাকতো বড় রকমের একটি দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। রসদ সরবরাহ করা এবং বার্তাবহন—এই ছিল এদের প্রধান কাজ। সুতরাং যুদ্ধের গতি-প্রগতি ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার অন্যান্য নিত্যকর্ম নিয়ে এই তাঁবুর সামরিক লোকেরা নিয়ত কর্মব্যস্ত থাকতো। ওই ছেলেটি ছিল এই সামরিক তাঁবুরই একজন কর্মচারী; এখানকার কোম্পানীর ক্যাপ্টেনের একজন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌। কিছুদিন হোলো সে এখানে বদলি হয়ে এসেছে। খবরবার্তা নিয়ে ট্রাকে ক'রে তাকে অনেক সময়ে কলকাতা কেন্দ্রে যেতে হোতো, এবং ওই তাঁবু থেকে রসদ-সম্ভার সহ প্রকাণ্ড কন্‌ভয় তাকে ছাড়তেও হোতো। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ যুবকটি যে কারণেই হোক না কেন, প্রিয় ছিল সকলের।

সমগ্র বাঙ্গলা দেশের জীবনের উপর দিয়ে তখন অতিশয় দুঃসময় চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো অঞ্চল থেকে হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিক খা-কষাকষির সংবাদ শোনা যাচ্ছিল।

এমনি সময়টায় কয়েক দিনের জন্য ক্যাম্পে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। কলকাতায় মিলিটারী লরীব্যূহের উপর জনতার প্রবল আক্রমণের ফলে সরবরাহ ব্যবস্থাটা দিনকয়েকের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন গ্রামের উপরে এই তাঁবুর সামরিক লোকেরা হানা দিয়ে খাদ্যসম্ভারগুলি লুটপাট করতে থাকে। এ সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনবার অধিকার জনসাধারণের তখন ছিল না। ফলে, আশপাশের গ্রামে অরাজকতা দেখা দেয় এবং কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা ভয় পেয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। অবস্থা যখন চরমে ওঠে, সেই সময় একদিন কোম্পানীর ক্যাপ্টেন তাঁর সহকারীকে গ্রামের থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য আদেশ করেন। এই যুবকের প্রতি সেই কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হোলো। কিন্তু সামরিক পোষাকটা যে মস্ত বাধা। সুতরাং সেই পোষাক পরিত্যাগ ক'রে

সিভিল পোষাকে এই যুবকটি গেল মাঠ পেরিয়ে গ্রামের দিকে। যে-চণ্ডমূর্তির উগ্রতা ছিল তৎকালীন সামরিক পোষাকে, সেটি পোষাক পরিবর্তনের সঙ্গে সুকোমল হয়ে এলো। আল্‌গা পায়জামা এবং একটি ছিটের শার্ট প'রে এই প্রিয়দর্শন তরুণ গ্রামের চিত্তজয় করার জন্য এগিয়ে গেল। সমগ্র পল্লীজগতের অভিশপ্ত আবহাওয়ার মাঝখানে এই যুবক সেদিন এসে দাঁড়ালো যেন অনেকটা আশীর্বাদের মতো। মাঠের এ পারে এই অপরিচিত গ্রামটিতে সে আসেনি কোনোদিন। সে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলো একেবারে হাটতলায়।

আশেপাশে কাঁচা-পাকা বাড়ী, কোথাও একটি ছোট ডিস্‌পেনসারী, কোথাও মুদি-মনোহারীর দোকান, কোথাও দড়ি ও তামাকের আড়ৎ, কোথাও বা সরকারী রেশনের সাব-অফিস। অদূরে একটি খোলা মাঠে পুকুরের ওপারে ছোট একটি বালিকা-বিদ্যালয়। সেখানে মেয়েমহলে খুব কলরব চলছে। কি একটা প উপলক্ষে স্কুলের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কা'রো কা'রো কথায় বুঝতে পার গেল, এ গ্রামেও হিন্দু-মুসলমানের মন-কষাকষি চলছে। কবে আগুন জ্বলে' ওঠে তার ঠিক নেই।

ছেলেটির সঙ্গে ছিল জনচারেক মিলিটারী শ্রমিক। কিন্তু তারাও শা পোষাকে এসেছে। হাটতলায় ঘুরে ঘুরে এখান ওখান থেকে বহু পরিমাণ সব্জি ও অন্যান্য সামগ্রী তারা সংগ্রহ করলো। টাকা ছিল ওদের কাছে স্ সুতরাং চড়া দাম দিয়ে ওরা হাট থেকে যে সামগ্রী সম্ভার কিনলো, চল শ্রমিকের পক্ষে সেই বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। তখন শীতকাল। শী তরি-তরকারী ওরা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করলো।

হাটের লোকের সহায়তায় ওরা খানতিনেক গরুর গাড়ী মোতায়েন করলে ওরা নাকি মিলিটারীর ঠিকাদার, এসেছে কলকাতা থেকে। পেঁয়াজ আলু ক মুলা ছাগল মুরগী ঘি-মাখন লবণ—যা কিছু ছিল হাটতলায়, সমস্তই নিঃ হয়ে গেল। ওরা টাকা ছড়িয়ে গেল অজস্র।

গাড়ী ছাড়তে মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেল। ওরা গেল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি হাটতলায় এক ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু জলখাবার খেতে বসে' গে

চার পাঁচ মাইল হেঁটে তার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। জলযোগ সেরে সে আবার বেরিয়ে পড়লো।

একটি লোক তামাক কিনতে বেরিয়েছিল, ছেলেটিকে সে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল। সামনেই প্রাচীন রুদ্রেশ্বরের ভগ্ন মন্দির, সেখানে এক বাউলের গানের আশেপাশে কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছে। ছেলেটা থমকে সেখানে একবার দাঁড়ালো। যেখানে যা কিছু নতুন, ছেলেটার কাছে তাই যেন বিস্ময়। এমন সময় সেই লোকটি পাশে এসে দাঁড়িয়ে গায়ে প'ড়ে আলাপ করলো, কোথায় থাকা হয়, বাবা? বাড়ী কোথায়?

পাশ ফিরে ছেলেটি ওকে দেখে বললে, শাহারাণপুরের দিকে।

উচ্চারণটা একটু অবাঙ্গালীর মতো। কিন্তু কণ্ঠের এমনই মিষ্টতা যে লোকটি আকৃষ্ট হোলো। বললে, এ মন্দিরটি অনেককালের বাবা। রাজা দীপেন্দ্র-নারায়ণের আমলের, সিদ্ধপীঠের জায়গা। শিবরাত্তিরে এখানে মস্ত মেলা হয়। তুমি কি করো, বাবা? এদিকে কেন?

তরুণ ছোকরা সত্যভাষণ করতে পারলো না, কারণ এখানে আবার একটা আন্দোলন উঠতে পারে। বললে, আমি ঠিকাদারের লোক, ক্যাম্পে মাল সাপ্লাই করি।

বেশ ত, তা দুচার পয়সা পুজো দিয়ে যাও না বাবা রুদ্রেশ্বরের দরজায়? দাঁড়াও ঠাকুর মশাইকে ডেকে দিই।

লোকটা নিজের উৎসাহেই পুরোহিতকে ডেকে দিল। পুরোহিত মশাই বেশ ন্যকান্ত। চেহারাটা প্রৌঢ়। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, এসো বাবা এসো। এমন চেহারা এ তল্লাটে ত' কোথাও নেই? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

দু'চারজন এসে আশেপাশে জড়ো হোলো। ছেলেটির পরিচয়াদি নিল ই। পশ্চিমবঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের ছেলে, কিন্তু তার পিতৃপুরুষরা শো বছর আগে বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ ক'রে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে চ'লে। বাঙ্গলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একেবারেই নেই।

ছেলেটি যেমন লাজুক, তেমনি ভদ্র। মুখে মিষ্ট হাসি লেগেই আছে।

নাটমন্দিরের পাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধা, তিনি জপ আহ্নিক সেরে উঠে এ
দাঁড়ালেন। বললেন, বাবা, অত দূর থেকে এসেছো, আমাদের ওখানে ডাল-ভা
যা হয়েছে এক মুঠো খেয়ে যাও।

সকলেই একবাক্যে সায় দিলো। বৃদ্ধা হচ্ছেন রাজা দীপেন্দ্রনারায়ণের সম্পর্কে
নাতনী। সুতরাং তাঁর অনুরোধ অমান্য করা চলে না। অবশেষে ছেলেটিকে
এনে হাজির করা হোলো এক ভগ্ন জরাজীর্ণ অট্টালিকার এক প্রেতপুরীর
একাংশে।

একখানা ঘর আর একটু দরদালান, সেটি রান্নাবান্নার জায়গা। সামনে
পুরোনো ইটের স্তূপ, সাপখোপের কায়েমী আড্ডা। দালানের পাশ দিয়ে
পানাপুকুরের পথটা চ'লে গেছে! বৃদ্ধার সঙ্গে যুবকটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে
দেখলো, ভিতরে একখানা তক্তার বিছানায় এক ভদ্রলোক শুয়ে। বৃদ্ধা বললেন,
ওটি আমার ছোট ভাই, বুঝলে বাবা,—ওর নাম উপেন। বাপের বংশে একে
একে সবাই গেছে, আমরাই দু'জন আছি। আমার ভাইটি বাতের ব্যামোয়
উঠতে পারে না। তোমার নামটি কি, বাবা?

ছেলেটি মিষ্ট ভাষণ ক'রে বললে, আমার নাম অরুণ।

বেশ, বেশ, আমার রান্নাবান্না সব তৈরী। রোজই এমন সময় একটা ডুব
দিয়ে মন্দিরে গিয়ে জপ ক'রে আসি, তাই আজ তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল
বসো বাবা এই চৌকিখানার ওপর। বংশের নাম-ডাকই আছে, ঘর-দোর ত
তেমন নেই।

বাইরে এই সময় একটু সাড়াশব্দ শোনা গেল, এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই
একটি বালিকার দীর্ঘ মিষ্ট কণ্ঠ কানে এলো, পিসিমা?

একটি মেয়ে ছুটে আসছিল বনহরিণীর মতো। কিন্তু সামনে একটি রূপ-
কুমারকে দেখে হতচকিত হয়ে সে এদিক ওদিক তাকালো। এ কি স্বপ্ন, না
মায়া, না মতিভ্রম।

মেয়েটির বয়স আন্দাজ সতেরো, বড় সুশ্রী মেয়ে। রাজা দীপেন্দ্রনারায়ণের
এই জরাজীর্ণ ভগ্নাবশেষের সমস্ত বন্য গন্ধ নিয়ে তার স্বভাবটি তৈরী। চঞ্চল

চোখের অবাধ্য দুটি তারকা ছেলেটিকে দেখে স্থির হয়ে গেল। সর্বনাশীর প্রথম মৃত্যু হোলো প্রথম পলকে।

অরুণ বিস্ময়াহত চক্ষে মেয়েটির দিকে তাকালো।

পিসিমা বেরিয়ে এলেন। বললেন, পোড়ারমুখি, সেই কোন সকালে গেছিস ইস্কুলে, একেবারে বেলা কাবার ক'রে ফিরলি? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই,—আজ না ইতুসংক্রান্তি?—এই ছাখ্, নতুন অতিথি আমাদের বাড়ীতে।

কাছে এসে চাপাকণ্ঠে মেয়েটি বললে, ও কে, পিসিমা?

পিসিমা বললেন, ছেলেটিকে ডেকে এনেছি আমাদের এখানে। বাইরে থেকে এসেছে, রোদ্দুরে ঘুরে হয়রান। আমাদের এখানে দুটি খাবে। এই যে বাবা, এটি আমার ভাইঝি,—ওই উপেনের শেষকুড়ন্ত মেয়ে। আহা পর পর তিন চারটি গেল, এর মাকেও ধ'রে রাখতে পারলুম না,—সিঁথের সিঁদুর নিয়ে আমাদের ফেলে সেও চ'লে গেল। এই মেয়েটিকে নিয়েই আছি,—শিবরাত্রির শল্‌তে। এর নাম মাধু, বাবা।

ঘরের বিছানা থেকে উপেন বললেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও, দিদি।

এই যে, দিই—পিসিমা সজাগ হলেন,—আহা, ছেলে ত নয়, ময়ূরছাড়া কার্তিক! কোন্ ভাগ্যিধরী তোমাকে পেটে ধরেছে বাবা! আমাদের ঘর আলো হয়ে উঠেছে। নে মা, হাত-পা ধুয়ে একটু দেখাশুনা কর দিকি। আসন পেতে দে, জল দে।

মাধুর যেন হাত-পা আসছে না। সে ছুটে গেল পুকুরঘাটের ওদিকে, কিন্তু আড়ালে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালে। সমস্তটা যেন দুলছে, পা দুটো যেন কাঁপছে। অরুণ হতবুদ্ধির মতো তার প্রতি নিমেষনিহত চক্ষে তাকিয়েছিল, সে জন্য মাধুর সর্বশরীরে যেন যন্ত্রণা ধ'রে গেছে। এবার যেন কোনমতেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পা সরছে না। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেটাকে না দেখেও তার স্থির থাকার উপায় রইলো না। শান্ত নদীর উপর হঠাৎ উঠলো তুফান, হঠাৎ উঠলো ঝড়, হঠাৎ যেন ভূমিকম্প।

উপেনবাবু আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এলেন। মিষ্ট কণ্ঠে আলাপ করতে বসলেন অরুণের সঙ্গে। তাঁদেরই স্বশ্রেণী, একই ঘর, উভয়েই কুলীন। কিন্তু অরুণ অতশত জানে না। তার বাবা জীবিত, তিনি একজন বড় ডাক্তার, বাড়ীতে মা আছেন। ভাই-বোনেরা খুবই শিক্ষিত। বনেদী ঘর। অরুণ বললে, আমি বাঙ্গলা দেশে কখনও আসিনি, এই প্রথম। আপনাদের এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে।

কথার টানটা তার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, ভাষাটা তার দুরস্ত নয়। আড়াল থেকে মাধু হেসে একেবারে লুটোপুটি। ও না বাঙ্গালীর ছেলে, মাতৃভাষাও শেখেনি। কিন্তু ভাঙ্গা বাঙ্গলা হ'লেও গলাটি ভারি মিষ্টি! আশ্চর্য, পুরুষ মানুষ এত সুশ্রী হয়? অমন লম্বা-চওড়া সুন্দর স্বাস্থ্য, অমন বলিষ্ঠ, কিন্তু কী লাবণ্য সর্বাঙ্গে। মাধু যেন অভিভূত দৃষ্টিতে তাকালো।

উপেনবাবু বললেন, তুমি এতটুকু বয়সে ব্যবসায়ে নেমেছ, কিন্তু এ দেশের হাঙ্গর-কুমীরদের সঙ্গে পেরে উঠবে কি?

অরুণ তার স্বভাব সারল্যের জন্য এবার আর কোনমতেই নিজের পরিচয় গোপন রাখতে পারলো না। ব'লে ফেললো, দেখুন, আমার কথাটা ঠিক বলা হয়নি। এদেশে মিলিটারীকে সবাই ঘেন্না করে, ভয় পায়—তা ছাড়া গোরা সাহেবরা অনেক অনাচারও করে,—সেজন্যে মিলিটারীর লোকদের কোনো আদর নেই। আমি হলুম চড়কডাঙ্গার তাঁবুর একজন মিলিটারী লেফ্‌টেন্যান্ট্‌। আমার 'কসুর' মাপ করুন।

পিসিমা ও উপেনবাবু একটু ভীত হলেন। বললেন, আমরা মিলিটারী নাম শুনেই কেঁপে মরি, কিন্তু ওদের দেখিনি কখনো। তোমাকে দেখে ত' আমাদের ভুল ভাঙ্গলো, বাবা। মিলিটারীর মধ্যে ভদ্রঘরের ছেলেরাও থাকে, এই প্রথম জানলুম।

অরুণ খুব হেসে উঠলো। আড়ালে দাঁড়িয়ে মাধু খুব হাসছিল। এবার পিসিমার ডাকে তাকে কাছে আসতে হোলো। সে ঠাঁই ক'রে দিল, জল এনে

রাখলো, আসন পাতলো। কিন্তু এইটুকুতেই সে রুদ্ধশ্বাস। অধীর উত্তেজনায় সে ঠক্ ঠক্ করছিল।

পিসিমা ভাতের থালা এনে সামনে দিলেন। পরে বললেন, তোমার বিয়ে থা' হয়েছে, বাবা ?

আজ্ঞে না—অরুণ জবাব দিল।

পিসিমার সঙ্গে উপেনের দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল। ওরা কেউ লক্ষ্য করলো না, জীবন-বিধাতা অন্তরীক্ষে কৌতুক বোধ করলেন। পিসিমা পুনরায় বললেন, আমাদের বাবা এইটুকুই ঘরকন্না। বিঘে পঞ্চাশেক জমি-জায়গা এখনও আছে, আর এদিক ওদিক কিছু কিছু আদায়-তশীল হয়। জেলা বোর্ড থেকে উপেন কিছু কিছু পায়,—ব্যস, ওই ভরসা। এই মেয়েটার একটা জোড়া গাথা কিছু হয়ে গেলেই আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। মাধু এবার একটা পাস করবে।

আঃ পিসিমা,—অদূরে দাঁড়িয়ে মাধু চাপাকণ্ঠে পিসিমাকে শাসন ক'রে দিল।

পিসিমা বললেন, ওমা, তা'তে কি হয়েছে। অরুণ হোলো আমাদের স্বঘর, ঘরের ছেলে বলতেও দোষ নেই। আর তাও বলি বাবা, মাধুকে নেবার জন্যে বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসছে।

পিসিমা, তুমি থামবে কি ?—মাধু চেঁচালো।

শ্রীমান্ অরুণ নতহাস্যে খেয়ে যেতে লাগলো। পিসিমা সেদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে বললেন, অবিশ্যি সে কথা সত্যি, যার হাঁড়িতে যে চা'ল দেয়, ভবিতব্যই হোলো আসল কথা। কে জানে বাবা, তোমার মা-বাবা খবর পেয়ে হয়ত দৌড়ে এসে হাজিরই হবেন। মেয়ে সুন্দরী হ'লে সব জায়গাতেই আদর। মাধু, তুই বল্ না মা, লেখাপড়ায় আর গান-বাজনায় ইস্কুল থেকে ক'বার যেন প্রাইজ পেয়েছিলি ?

মাধু সেখান থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

আহারাদি সেরে সেদিন অরুণ বিদায় নিল। কিন্তু যাবার সময় পিসিমা মাথার দিব্যি দিয়ে বললেন, আবার কবে আসছ ব'লে যেতে হবে বাবা। এক দিনেই

তোমার ওপর যেন কতদিনের মায়া প'ড়ে গেল। কা'র মুখ দেখে উঠেছিলুম আজ, পথের ধারে মাণিক কুড়িয়ে পেলুম। মাথার দিব্যি, অরুণ—কাল তোমাকে আবার আসতেই হবে, কেমন ?

অরুণ হাসিমুখে বললে, আমাদের ক্যাপ্টেনের হুকুম না পেলে ত' আসতে পারিনে ? তবে মালপত্র কিনতে আবার দু' এক দিনের মধ্যেই হয়ত আসতে হবে।

পিসিমা ব'লে দিলেন, বাবা অরুণ, মিলিটারীতে না হয় কাজ নিয়েছো, কিন্তু যুদ্ধ ত' থেমে গেছে। আবার যুদ্ধ বাধলে তুমি বাবা মারধোর এড়িয়ে থেকো। যুদ্ধ আজ আছে কাল নেই, ওসব ত' মাথা গরমের ব্যাপার। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক চিরদিনের। কাল থেকে তোমার পথ চেয়ে থাকবো।

বিদায় দিয়ে পিসিমা হাসিখুশী মুখে ভিতরে এলেন।

মাধু কোথায় যেন আড়ালে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। অরুণের যাবার পথে হঠাৎ বেরিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো। জড়িত কুণ্ঠিত লাজনম্র কণ্ঠে শুধু বললে, ঠিক আসবেন কিন্তু।

অরুণ বললে, তুমি ত' কথা বললে না, কেন আসবো ?

হ্যাঁ, আমি বলেছি, অনেক কথা বলেছি, আপনি শুনতে পাননি।

ওইটুকু কথা বলতে গিয়েই পোড়ারমুখী হাঁপিয়ে উঠলো, কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট। মাধু অধীর আবেগ আর অসহ্য আনন্দ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

অরুণ তা'র দিকে তাকিয়ে রইলো কতক্ষণ, তারপর হন হন ক'রে নিজের পথে চ'লে গেল।

এই ছোট্ট কাহিনীর পিছনে দুটি রাজনীতিক আবর্তনের কথা লুকিয়ে ছিল। একটি হোলো সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম, অন্যটি যুদ্ধের অবসান। সমগ্র বাঙলায় একদিকে অরাজকতার হাওয়া বইতে সুরু করেছিল, অন্যদিকে শোনা যাচ্ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীনতার কথাবার্তা।

চারিদিকে হুজুগ শোনা যাচ্ছিল, সৈন্য-বিভাগে ও নৌ-বিভাগে নাকি অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। গভর্নমেন্ট তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করছেন।

দিন কয়েক চ'লে গেল।

এ বাড়ীতে অরুণ এসেছে আরো তিনচার বার। উপেন আর পিসিমা অরুণের মিষ্ট ব্যবহার এবং বিনয়নম্র আলাপে মুগ্ধ। অরুণ তার মা-বাবার কাছে চিঠি দিয়েছে। উপেনবাবু ধ'রে নিয়েছেন অরুণের হাতে মাধুকে তিনি নিশ্চিত তুলে দিতে পারবেন। পিসিমা বিশ্বাস করেন, আগামী ফাল্গুনের মধ্যে এ বিবাহ হবেই হবে। মাধু নিভৃতে ব'সে অরুণের সঙ্গে গল্প করে, অরুণ ওকে বিবাহ করবে।

অরুণকে আসতে হয় এ গ্রামে দু' এক দিন বাদে-বাদে। পনেরো দিন আগে প্রথম আলাপ, কিন্তু এর মধ্যে পাঁচ ছ'বার সে এসেছে। পিসিমা অতি পুলকিত, উপেনবাবুও উৎসাহিত। মাধু অরুণকে নিয়ে এই ভগ্ন অট্টালিকারই এদিক ওদিক দেখিয়ে শুনিয়ে বেড়ায়। এখানে ঠাকুর দালান ছিল, ওখানে ছিল ঘোড়াশালা, এটা বরকন্দাজদের আড্ডা, ও জায়গাটায় ছিল সেরেস্তা। প'ড়ো ঘর, ঝুপসি,—চামচিকে আর বাদুড়ের স্থায়ী বাসা। ওদিকে ছিল মেয়েমহল, সেখানেও এখনও সোঁদা সোঁদা বুনো গন্ধ। ভাবী স্বামীর হাতখানা মাধু ধরে ভয়ে ভয়ে।

এদিক থেকে পিসিমা ভগ্নস্তূপের জটলার পাশ দিয়ে ওদের ঘনিষ্ঠতা দেখে বড় আনন্দ পান। কী ছেলেমানুষ ওরা দুজন। এলোমেলো অকারণ আলাপে কী আনন্দ ওদের! ওরা গল্প করতে করতে সাতমহলা ভগ্নাবশেষের আশেপাশে মিলিয়ে যায়। দেশের এই দুর্দিনে ভগবান যদি এ পরিবারটির দিকে মুখ তুলে তাকান্। আনন্দে পিসিমার চোখে জল আসে। উপেন ভাবেন, স্বর্গতা পত্নী যেন ওদেরকে আশীর্বাদ করেন।

• এমনি সময়টায় সহসা একদিন এই গ্রামেরই আশেপাশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে' উঠলো। কাটাধানের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের চাষীর মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ বেধে ওঠে, এবং সেখানে কয়েকজন হতাহত হয়।

সেই দুর্ঘটনার সংবাদ দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো মাত্র ঘণ্টা দুই। গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত হোলো। কিন্তু শান্তি কমিটীর লোকের সেই আগুন নেভাতে পারলো না।

হাটতলায় লোকজন নেই, দোকানদারি বন্ধ, প্রাণভয়ে চৌকিদার পালিয়েছে, পুলিশের থানা এখান থেকে দু মাইল। এ গ্রাম ছেড়ে বহু লোক প্রাণ বাঁচিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে নানাদিকে। রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে পাহারা দেবার মানুষ নেই।

অরুণ আসেনি গত কয়েক দিন। অস্থির উদ্বেগে দিনে রাতে সবাই প্রহর গুণছে। রাত্রে বাবা ও পিসিমা নিঃসাড় হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে; এদিকে একপাশে মেঝের বিছানায় শুয়ে অন্ধকারের দিকে দপ দপ ক'রে মাধু চেয়ে থাকে। চারিদিকের এই প্রেতপুরীর ইটকাঠের জটলার আনাচে কানাচে তার ব্যাকুল প্রাণ আহত প্রতিহত হয়ে কেবলমাত্র দুই চোখের ঘনকৃষ্ণ তারকায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারা যেন জীবনজোড়া বিপ্লবের দুটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অরুণ আসছে না কেন?

একটি ভয়ত্রাতা যুবকের আগমন প্রতীক্ষায় নিরুপায় একটি ক্ষুদ্র পরিবার মৃত্যুভয়ভীত চক্ষে পথের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে রইলো।

অরুণ কোথায়! অরুণের কোনো সংবাদ নেই!

চারদিক থেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর রটতে লাগলো। আজাদ হিন্দ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গরোধ করার জন্য গভর্নমেণ্ট নাকি হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামের পক্ষপাতী। কিন্তু দেশব্যাপী অরাজকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই রাজনীতিক অবস্থার চুলচেরা বিচার করার মতো মানুষ পাওয়া গেল না।

প্রায় তিনদিন পর্যন্ত গ্রামের শান্তি কমিটি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাটতলা, বারোয়ারীতলা, ইউনিয়ন বোর্ডের আপিস, নাট্যসমিতি,—কোথাও কোনো মানুষ নেই। মাঝে মাঝে থানার মুসলমান দারোগা তাঁর দলবল নিয়ে এক-একবার এখানে ওখানে ঘুরে যাচ্ছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকেরা পাহারা দিয়ে ফিরছিল এগ্রামে ওগ্রামে।

রুদ্ধশ্বাসে গ্রামবাসীরা প্রতীক্ষা করছিল শুভক্ষণের জন্য। কিন্তু মিথ্যা সেই প্রতীক্ষা। সেদিন প্রভাতে রুদ্রেশ্বর মন্দিরের দরজায় একটি বাছুরের মুণ্ড আবিষ্কৃত হোলো এবং আন্দাজ বেলা নয়টার মধ্যেই এ গ্রামে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেল।

এ বাড়ীর গুপ্তগহ্বরে লুকিয়ে রইল তিনটি অসহায় প্রাণী। কিন্তু রেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় তাদের ঘরে হাঁড়ি চড়েনি আজ তিনদিন হোলো। ওরা গিয়ে উঠলো ভগ্নস্তূপের উঁচু জায়গাটায়। সেখান থেকে দেখা যায় মাঠের পথ,—যে পথ দিয়ে অরুণ এসেছে বার বার। কিন্তু জনশূন্য প্রাণীশূন্য প্রান্তর হাহাকার করছে।

আগুনের ধোঁয়ার সঙ্গে মৃত্যুর রোল উঠেছে আশেপাশে। উপেনবাবুর পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হোলো না। ভাঙ্গা দরজা, পুকুরের দিকটা খোলা, বাড়ীর পাঁচিল ধ্বসা—আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। তার ওপর মাধুকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যাবার একটা কানাকানি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।

বোধ হয় বাড়ীর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকাই তাঁর পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু অদূরবর্তী স্কুল বাড়ীটায় নিরাপদ আশ্রয় মিলবে কিনা উপেনবাবু তারই খোঁজে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেদিন বেরিয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, তিনি আর ফিরতে পারেননি। মধ্যরাত্রে উন্মাদিনীর মতো পিসিমাকে লুকিয়ে মাধু তার পিতার খোঁজ করতে বেরিয়েছিল খানিকটা পথ, কিন্তু উপেনবাবুর লাস খুঁজে পাওয়া যায়নি!

পরদিন অপরাহ্ণের দিকে এ বাড়ী আক্রান্ত হোলো। পিসিমা ও মাধু কোথায় গিয়ে লুকোলো কেউ সন্ধান পেলো না। তবে পিসিমা বোধ হয় মনে করেছিলেন, পুকুরপাড়ের নীচে কোথাও আত্মগোপন ক'রে তিনি রাজা দীপেন্দ্রনারায়ণের বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন, এবং হয়ত রাখতেও পেরেছিলেন—কেননা এই দীপেন্দ্রনারায়ণেরই প্রাচীন পদ্মসরোবরের জলের উপরেই পরদিন পিসিমার ভাসমান মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেল।

গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে একটি ছোট পুঁটলী হাতে নিয়ে কালো

আলোয়ানখানা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে মাধু ছুট দিল মাঠের উপর দিয়ে। অরুণদের তাঁবু নাকি এই মাঠেরই অপর প্রান্তে।

ধানকাটা মাঠের পথে ধানের গোড়াগুলি যেমনই পায়ে আঘাত করে, মাটির ডেলাগুলি তেমনই কঠিন। পুষ্পাকীর্ণ চীনাংশুকের পেলবতার উপর দিয়ে যে পদ্মরক্তাভ দুখানি চরণের সঞ্চারণের কথা ছিল, সেই পা আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হোলো। শতবর্ষ বিরহিনী শ্রীমতী চলেছিলেন পাগলিনীর মতো অভিসারে ঘন অন্ধকার এবং শ্বাপদ-ভুজঙ্গ-ভয়কে তুচ্ছ ক'রে, কিন্তু মাধু ছুটেছে প্রাণভয়ে। পিছন থেকে বীভৎস মৃত্যু তার হিংস্র দংষ্ট্রা ব্যাদান ক'রে ব্যাঘ্রের মতো এগিয়ে আসছে, সে ছুটে চলেছে জীবনভয়ভীতা বন্য কুরঙ্গিনীর মতো।

দিনের বেলাতেও সেই দূরবর্তী ক্যাম্পের নিশানা গাছপালার ভিতর দিয়ে দেখা যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে দিক ভুল হবার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু সম্ভবত মিলিটারী ক্যাম্প সম্বন্ধে জনসাধারণের একটা স্বাভাবিক আতঙ্কবোধ থাকার দরুন দাঙ্গাবাজদের সমাগম এদিকে হয়নি। মাধুর বিশ্বাস, ক্যাম্পে কোনোমতে একবার পৌঁছতে পারলেই সমস্ত সমস্যার অবসান। সব শেষের দিনটিতে অরুণের শরীরটাও খুব ভালো ছিল না, এবং মাধুর বুকের মধ্যে ব'সে অন্তর্যামী একথা জানিয়ে দেন, অরুণ কঠিন রোগে ওই ক্যাম্পের মধ্যে শয্যাগত হয়ে প'ড়ে আছে। আর্ত কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো মাধুর মুখ দিয়ে। থমকে সে দাঁড়ালো। উদ্গত অশ্রুর উচ্ছ্বাস ঝাপসা ক'রে দিয়েছিল তার অবাধ্য চোখ। কিন্তু মাটির উপর পুঁটলীটা একবার ফেলে সে নিজের দুখানা হাতের তালু অন্ধকারে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলো, ময়লা দুখানা হাত,—এই দুখানা অসুন্দর হাতে সে ওই রাজপুত্রের পরিচর্যা করবে কেমন ক'রে? মালিন্য মাখা হাতে দেবতার সেবা যে শ্রীহীন হবে!

হাত দুখানা প্রাণপণে সে মাটির ডেলার উপর ঘসে নিল একবার, তারপর গায়ের আঁচল টেনে সেই হাত মুছলো পরিষ্কার ক'রে—তারপর পুঁটলী নিয়ে আবার ছুটলো।

পোড়ারমুখীর চোখ মন প্রাণ বুদ্ধি—সবই ছিল অতি তীক্ষ্ণ। পথ ভুল সে করেনি। গাছের জটলার ভিতর দিয়ে এতক্ষণে ক্যাম্পের আলো তার চোখে পড়লো, এবং সেখানকার দ্রুত কর্মতৎপরতাও সে লক্ষ্য করতে পারলো দূর থেকে।

কাঁটাতারের বেড়া,—অরুণ ব'লে রেখেছিল। পূবমুখী একটা গেট্ আছে, সেই গেটে সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন থাকে। গেটটা পাওয়া গেল অনেক ঘোরাঘুরির পর, কিন্তু পাহারা দেখা গেল না। বেঁচে গেল মাধু। সবচেয়ে প্রধান পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হোলো। ক্যাম্পের মধ্যে চারদিকে আলো জ্বলছে, একটার পর একটা মিলিটারী ট্রাকের কন্‌ভয় দ্রুত অতিক্রম ক'রে চলেছে। মাধু এদিক ওদিক ব্যাকুলভাবে একবার তাকালো, তারপর সন্দেহক্রমে সেইখানে ব'সে পুঁটলীটি খুলে একখানি ছোট্ট নোটবই বা'র করে তার পাতা ওলটাতে লাগলো। বইখানা অরুণের, ওখানা শেষ দিনে তার বুক-পকেট থেকে এক পাশে খসে' পড়েছিল,—আর ফেরত দেওয়া হয়নি! ওরই মধ্যে অরুণের হস্তের লেখা ক্যাম্পের বিশেষ নম্বরটি মাধু দেখে রেখেছিল। নোট বইটিতে অরুণের নামটি ছাড়া সঠিক আর কোনো কিছু পাবার উপায় নেই। কেবল একটির পর একটি নম্বর লেখা পাতায়।

একটি নম্বর মনে রেখে মাধু হনহন ক'রে চললো একদিকে। কাছাকাছি এসে দেখলো সকলেরই ব্যস্তসমস্ত ভাব। গায়ের আলোয়ানটা ভালো ক'রে জড়িয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে একটি লোককে গিয়ে সে ধরলো। পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল আরও একটি কন্‌ভয়।

লোকটা তার ভাষা বুঝতে পারেনি। বললে, ক্যা মাংতা?

মাধু থতিয়ে থতিয়ে নম্বরটা বললে। লোকটা আপাদমস্তক কালো আবরণে ঢাকা নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর বললে, আগে বঢ়ায়কে দেখো। হাঁ হাঁ হাঁ……

গাড়ীর মুখে পড়ে গিয়েছিল মাধু আরেকটু হ'লে। ছুটে সে পেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে নম্বর মিলিয়ে সে দেখলো, সামনেই লেফ্‌টেনাণ্টের ঘর। কিন্তু ঘর শূন্য, কেউ নেই। এপাশ ওপাশ দেখলো জনহীন।

যুদ্ধ থেমে গেলে ক্যাম্পের কী চেহারা দাঁড়ায়, নির্বোধ মেয়েটার জা ছিল না। সমস্ত সাজানো থাকে, থাকে না কেবল মানুষ। আবার তাে ডাক পড়েছে কোথায়, কে জানে! অদূরে আরেকটি লরীর দল যাত্রার জন্য প্রস্তু হচ্ছিল। সেইদিকে সে পা বাড়াবার উপক্রম করছে, এমন সময় পূর্বো সেপাইটি দু'পা এগিয়ে এলো, এবং জানতে চাইলো তার এখানে আগমনে উদ্দেশ্য। মাধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে অরুণের নাম ও পরি তাকে জানালো। সেপাইটি অরুণকে ভালো ক'রেই চেনে,—এই গ্রুপের প্রহরায় সে থাকে। কিন্তু সে মাধুকে বুঝিয়ে দিল, লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাব বিমার প থা, বড়া সাব উন্‌কা বদলি কর দিয়া······

এখানে নেই? অসুখ নিয়েই বদলি হয়ে গেছে?

হাঁ।

কোথা গেছে অরুণ?

মালুম নেহি।—খবরদার······

লরীর দল আসছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালো মাধু। কী ছিল সে চাহনীতে কে জানে! ভয়! বীভৎস পরিণামের আতঙ্ক! মহাপ্রলয়ের আভা ঈশানের ভ্রূকুটির বাঁকা ভঙ্গী! মাধু তৎক্ষণাৎ ছুটলো ওই দ্রুতগতি লরীদলে পাশে পাশে। কেন ছুটলো বলা কঠিন, কি চায় তা অজ্ঞাত। লরীর সেপাই প্রথমে হাসলো, পরে বলাবলি করলো, গাঁওকা পাগলী!

মাধু ছুটছে, একটির পর একটি ট্রাক্ তাকে অতিক্রম ক'রে চলেছে। কত ছুটে গেল মাধু,—বাগান পেরিয়ে, ক্যাম্প ছাড়িয়ে, পথের পর পথ অতিক্র ক'রে! কিন্তু লরীর কন্‌ভয় সেই অন্ধকারে প্রেতচক্ষুর মতো তীব্র হেড্‌লাইট্‌গু জ্বালিয়ে তাকে পিছনে ফেলে চ'লে গেল।

কেন মাধু পাগল হোলো না? মহাচণ্ডী ছিন্নমস্তার মতো আপন টুঁটির র কেন সে পান করলো না? করালী ভয়ঙ্করী ভীষণার প্রলয়নাচনে সৃষ্টিস্থিতি রসাতে কেন দিল না মাধু? কিন্তু ওইখানে ওই মহাশূন্য মাঠের প্রান্তে মুখ থুবড়ে মা নিজের মাথাটাই ঠুকতে লাগলো বার বার,—তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার

শীতের কঠিন ঠাণ্ডায় সেই অন্ধকার আদি অন্তহীন প্রান্তর সত্য সত্যই শ্মশানকালীর প্রেতিনী-নৃত্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে।

মধ্যরাত্রির কোনো একসময় ধীরে ধীরে মাধু সেই মাটির উপরে ভর দিয়েই উঠে ব'সে এদিক ওদিক তাকালো। ততক্ষণে কান্নাটা তার শুকিয়ে গেছে।

অতঃপর দুদিন ধ'রে মাধুর কী অসমসাহসিক অভিযান! পরিশ্রম করেছে যত, তার চেয়ে অনেক বেশী ডোবা-পুকুরের জল খেয়েছে। অবশেষে একদিন অপরাহ্ণকালে সে এসে পৌছলো এক সাহেব বাগানে। সেখানে একজন আয়ার কাছে কলকাতার পথঘাট সে জানতে চাইলো। কলকাতার সম্বন্ধে অন্ধ্রদেশীয় আয়ার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সে গিয়ে এক প্রৌঢ়া মেম সাহেবকে খবর দিল। মেম বেরিয়ে এলেন স্নেহের আস্বাদ নিয়ে। তারা ছিল মিশনারীর লোক। মাধু ওখানে আশ্রয় পেলো কিছুদিনের জন্য।

বিপন্ন নারী তার আপন নিরাপদ ব্যবস্থাকে যেভাবেই হোক, আবিষ্কার ক'রে নয়। মাধুও নারী,—অরণ্যচারিণী হরিণীও নারী! উভয়েই খুঁজে পায় আপন কোটর, আপন গুহাগহ্বর! অত্যন্ত অসুস্থ দেহ নিয়ে মাধু সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, এবং উৎকৃষ্ট রেজাল্টসহ পাস ক'রে গেল। কিন্তু প্রবল বিষক্রিয়া ছিল তার সর্বশরীরে।

মেয়েটা অত্যন্ত নির্বোধ, একান্তই অজ্ঞান। সংসার সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা তার ছিল না। মাত্র কয়েক দিনের আলাপ একটি যুবকের সঙ্গে, এবং না হয় তাকে স্বামী ব'লেই সে কল্পনা করেছিল! কিন্তু সংসারে এমন ত' নিত্যই ঘটে। অনেক ব্যর্থতা, অনেক আঘাত জীবনে সইতে হয়, এর জন্যে যে মেয়ে ভেঙ্গে পড়ে—তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়!

এ সব হোলো বিজ্ঞের কথা। কিন্তু যে রূপবান তরুণ যুবকটিকে সে স্বামী ব'লে মনে-মনে গ্রহণ করেছিল, তারই সন্তানকে মাধু তখন গর্ভে ধারণ ক'রে রয়েছে—এই কথাটা সে একদিন স্বীকার করতে বাধ্য হোলো ওই প্রৌঢ়ারই রূপী কন্যার কাছে। পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হোলো না তার আগে।

এর পরে মাধুর জীবনে এলো নতুন হাওয়া। মিশনারী মেয়েদের কাছে সে

আশ্রয় নিল এবং একদা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলো। অরুণের নোটবই সে বা'র ক'রে দেখিয়েছিল কয়েকজনকে, কিন্তু সেই বছরের শেষ দিকে ভারং রাষ্ট্রে এবং গভর্নমেণ্টের মধ্যে অরাজকতা ও অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়, তাকে অতিক্র ক'রে অরুণের সংবাদ এনে দেবে, এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি নোটবইটির মধ্যে যে কতগুলি হিজিবিজি সাঙ্কেতিক নম্বর এবং অক্ষর বসাে ছিল, তারও হদিশ কেউ দিতে পারলো না। মাধুকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে চু ক'রে যেতে হোলো। কিন্তু ওই নোটবইটি অরুণের শেষ চিহ্নরূপে তার কাে রয়ে গেল।

মিশনারীদের হেপাজতেই শিশুটিকে ছেড়ে দিতে সে বাধ্য হোলো। সে সদ্যোজাত সুন্দর শিশুটিকে তারা কোথায় যেন পাঠিয়ে দিল, মাধু তার খোঁজখব রাখার চেষ্টাও করলো না। মুক্তি পেয়ে সে বাঁচলো এবং তরুণী মেমটির সে মাধুর বন্ধুত্ব জমে উঠলো এক বছরের মধ্যে। পরবর্তী দুবছরের মধ্যে ম আই-এ পাস ক'রে একটি মূল্যবান্ স্কলারশিপ পেলো। তার অনন্যসাধার সাফল্যে সবাই চমৎকৃত। নাচ এবং গানের পরীক্ষায় এমন কৃতিত্ব সে প্রকা করলো যে, 'স্টেট্স্ম্যান' কাগজে তার ছবি ছাপা হোলো।

বি-এ পড়তে গেল মাধু শান্তিনিকেতনে। সেখানকার প্রশান্ত পরিবেশে মাঝখানে গিয়ে নিজেকে সে জানতে শিখলো, এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের উপে সে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ব'লে তার খ্যাতি রটে গেল সর্বত্র ওখানে সে নাচের কাজ নিল, নতুন নাচের শিক্ষা চালু ক'রে দিল, গানের উপ চড়ালো নতুন মীড়, অভিনয়াদিতে আনলো নতুন টেক্‌নিক্ এবং অর্থ শাে অভিনব সাফল্য অর্জন ক'রে সে প্রমাণ করলো, মাথাটা তার অতি পরিষ্কার মেয়েটার হাস্য, লাস্য, কথার চাতুরী, বাচনভঙ্গী, গানের কণ্ঠ এবং সহজা অভিজ্ঞান লক্ষ্য ক'রে সবাই মনে মনে জেনে নিল, এ মেয়ে নতুন প্রতিভা মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা এবং স্বভাবের শুচিতা,—মাধুর এই দুটি গুণ লক্ষ্য ক' আশেপাশের মেয়েরাও তার অনুগত হোলো। বি-এ পাস করলো মাধু সসম্মানে এবং এম-এ পাস করলো সে অর্থনীতিশাস্ত্রে। এবার সে উপার্জনে নামবে।

রাত্রিশেষের জ্যোৎস্না নিষ্প্রভ হয়ে এলো। সেই ম্লান আলোয় ঈশানীর গল্প শেষ হোলো। শান্তনুর মুগ্ধ চোখ তার মুখের উপর স্থির হয়ে ছিল।

মাথার উপরে মৃদুগতি পাখা ঘুরছে রাত বারোটার পর থেকে। একই বিছানার এপাশে ঈশানী, ওপাশে শান্তনু,—যেন প্রস্তরীভূত! কিন্তু এবারে যেন মধুর অবসাদে শান্তনুর চোখ জড়িয়ে এলো। সে বললে, মিশনারীদের সেই তরুণী মেয়েটি যেন কাব্যের উপেক্ষিতা হয়ে রইলো?

চোখ দুটি একবার বন্ধ ক'রে ঈশানী বললে, আমার অতি দুর্দিনের বন্ধু, ওরই নাম শিলভিয়া!

শান্তনু বললে, তবে কি ভিক্টর তোরই ছেলে?

ধরা গলায় ঈশানী বললে, তুই আর শিলভিয়া ছাড়া পৃথিবীতে এ খবর আর কেউ জানে না।

শান্তনু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। পরে বললে, মাধু নামটা কবে বদলালি?

আই-এ পাস করার আগে ওই শিলভিয়াদের সাহায্যে ইউনিভারসিটিতে দরখাস্ত করি। অনেক কষ্টে নামটা বদলাতে পেরেছিলুম।

ঈশানী নামটা পছন্দ কেন তোর?

ঈশানী হাসিমুখে বললে, দর্প অস্ত্র হাতে নিয়ে এই জীবনের রণক্ষেত্রে নেমেছিলুম, তখন বোধ হয় চোখে ছিল বাঁকা কটাক্ষের করাল বিদ্রূপ, ঈশানী নামটা মানিয়ে গেল!

শান্তনু বললে, কিন্তু সেই জীবন তুই কাটিয়ে উঠেছিস। এখন তুই আত্মবিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে,—তোর স্থিতি ফিরে এসেছে। তোর এখন ফিরে আসা দরকার জননীর পরিচয়ের মধ্যে!

ঈশানী বললে, কেমন করে ফিরবো?

তোর জীবনে সাফল্য ঘটেছে অনেক, কিন্তু সার্থকতার পথ এখনও যে

অনেকদূর! তুই নিজে বঞ্চিত হয়েছিস ব'লে একটি নিরপরাধ সন্তানকে জননী স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবি? বঞ্চনার প্রতিশোধ বঞ্চনায়?

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো।

শান্তনু প্রশ্ন তুললো, তোর এই যৌবন সমারোহ থাকবে চিরদিন নন্দনবাসিনী উর্বশীর আনন্দ-উদ্বেল দেহবল্লরীর বাসনা-বিলোল নাচ কতদিন চলতে পারে? আরো না হয় দশ-পনেরো বছর? তারপর? তারপর যে রঙ্গমঞ্চে আলো নিভে যাবে! বুকচাপা নৈরাশ্য নিয়ে ফিরে আসতে হবে অন্ধকার ঘরে একা,—সে ঘর যে একেবারেই শূন্য! মেয়ে বলো, আর পুরুষ বলো,—মানুষের শেষ আশ্রয় তার সন্তানসন্ততি। তুই ভুল করেছিস, ঈশানী,—ভালোবাসার সার্থকতা হোলো বাৎসল্যে আর স্নেহে।

ঈশানী এবার মুখ খুললো। বললে, কিন্তু ভিক্টর যখন জানবে, তার মা পথে-ঘাটে নেচে-গেয়ে বেড়ায়, এবং সেই মায়ের অন্য সমস্ত পরিচয় অন্ধকারে ঢাকা। তা ছাড়া আরও কথা আছে, শান্তনু। মেয়েমানুষের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া, আর মা হয়ে ওঠা—দুটো এক জিনিস নয়। ভিক্টরের জন্মমুহূর্তের থেকে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় হয়নি। সেই জন্যই ভিক্টর আমার কাছে সত্য নয়, কল্পনামাত্র।

শান্তনু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। এমন অদ্ভুত মনোজটিলতার সঙ্গে তার পরিচয় নেই।—তা হ'লে অরুণের সঙ্গে তোর সম্পর্কটা?

ঈশানী হঠাৎ হাসলো। বললে, ওটা দৈব।

মানে?—শান্তনু হতবুদ্ধি হয়ে তাকালো।

আকাশে ততক্ষণে উষার আভা ফুটেছিল। আশেপাশের বন-বাগানে প্রভাতের পাখীরা ডানা ঝাড়ছিল,—অনন্ত আকাশ এখনই ওদেরকে ডাক দেবে। কোনো কোনো পাখী ব্রাহ্মমুহূর্তে ধরেছে ললিতের তান। একটু পরেই ব'সে যাবে সূর্যবন্দনা সভা।

শান্তনু বললে, কি বলছিস তুই? ওটা ভালোবাসা নয়?

ঈশানী বললে, এক বিন্দুও নয়!

তোকে ধিক, ঈশানী! তুই কি মনে করিস একথা শুনলে আমি পুলকিত হবো?

তোর ঘেন্না চিরকাল বয়ে বেড়াবো সেও ভালো, কিন্তু তোর মুখের ওপর মিথ্যে বলতে পারবো না। অপরিণত মনের ক্ষণিক বর্ণচ্ছটাকে যদি ভালোবাসা ব'লে তুই ভুল করিস, তোকেও অনুতাপ করতে হবে, শান্তনু। সে-লোকটা আসা-যাওয়া করেছিল অবিশ্যি বার পাঁচ ছয়, তার মোট স্থায়িত্ব ঘণ্টা কুড়িও নয়। তাকে দেখলে হয়ত চিনতে পারবো, কিন্তু মুখখানা আজ একেবারেই মনে পড়ে না। সে ব্যক্তি আমার ভালোবাসা পায়ে মাড়িয়ে যায়নি, কেননা ভালোবাসার চেতনা জন্মাবার আগেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।—

মন দিয়ে শান্তনু তার কথা শুনলো। তারপর বললে, তা হলে কি বলতে চাস, ভিক্টরের কোনো দায়িত্ব কোনোদিন তুই গ্রহণ করবিনে? তার জন্মের কাহিনী চিরদিনই রহস্যময় হয়ে থাকবে?—

ঈশানী একটু হাসলো। বললে, পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ সন্তান আছে, যাদের জন্মকাহিনী রহস্যাবৃত, এ কি তোর জানা নেই? কী করে তারা? বড় হয়ে কোথায় দাঁড়ায়? অথচ কে না জানে, অনাথ আশ্রমের শিশুরা সবাই পিতৃমাতৃহীন নয়। হয়ত অনেকের মা-বাপ কাছেই থাকে, তারা কিন্তু জানে না!

শান্তনু স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো! এ জগতের কতটুকু জানে সে!

ঈশানী বলতে লাগলো, এমন অসংখ্য স্বামী আছে যারা নিঃসন্তান স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা ক'রে নিজের গুপ্ত সন্তানকেই 'পালিত পুত্র' হিসেবে গ্রহণ করেছে! অনেক অসতী স্ত্রীর সন্তান স্বামীর নামে চ'লে যায় কে না জানে! সেই জন্য জন্মবৃত্তান্তের শুচিতা নিয়ে কোনো মানুষের কোনো বিচার নির্ভুল নাও হতে পারে, একথা জেনে রাখা ভালো, শান্তনু।

শান্তনু প্রশ্ন করলো, ভিক্টর চিরদিনই অজ্ঞান থেকে যাবে, এই তোর ধারণা?

ঈশানী বললে, তার মনে যদি কখনও কঠিন প্রশ্ন ওঠে, আমি তার জবাব দিতে নাই বা গেলুম। তার মা-বাপের পরিচয়টা তাকে জানিয়ে তার জীবনটাকে নাই বা অশান্ত ক'রে তুললুম।

কিন্তু যদি কখনও অরুণের সঙ্গে তোর দেখা হয়ে যায়?

ঈশানী হেসে উঠলো, ভয় নেই, যে-মেয়ে তার পায়ে ধ'রে কাঁদতে পারতো সে-মেয়ে অনেকদিন আগে ম'রে গেছে। তবে হ্যাঁ, দেখা হ'লে ভিক্টরের কথাটা হয়ত তুলতুম। পুরুষের জীবনে পিতৃপরিচয়টাই দরকার, মায়ের পরিচয় মুছে গেলেও চলে।

তামাশা ক'রে শান্তনু বললে, তোর ভালোবাসার ব্যাপারটা?

ভালোবাসা!—ঈশানী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে সে তার প্রাতঃকালীন 'মেহনতে'র ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

৭

কথাটা এখান থেকেই পরিষ্কার হওয়া চাই। মাধু হোলো আগেকার মেয়ে, ঈশানী তার নতুন নাম। মাধু তলিয়ে গেছে তার উৎপীড়িত জীবনের সংগ্রাম নিয়ে, ঈশানী দাঁড়িয়ে উঠেছে তার শ্মশানভস্ম গায়ে মেখে। মাধু হারিয়ে গেছে অতীতে,—ঈশানীর আছে স্মৃতি। মাধু যাকে স্বামী ব'লে ভাবতে চেয়েছিল, স্বামী হয়ে ওঠার আগেই নিরুদ্দেশে তার অবলুপ্তি ঘটেছে। সেদিনের অরুণের সঙ্গে সেদিনকার মাধুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঈশানী সকৌতুকে তাকিয়ে রয়েছে ওদের অবলুপ্তির দিকে। অরুণের পিছনটা চোখে পড়ে, মাধুর সামনেটা। মাধুর চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নামছে, ঈশানী তার দিকে এখন হাসিমুখে তাকায়। ঈশানীর প্রাণের বৃন্তে ওরা ছিল দুটি ফুল—মাধু আর অরুণ—কিন্তু দুটি ফুলই ঝ'রে গেছে।

ঈশানীকে প্রশ্ন করো,—সে বলবে, মাধুর প্রণয়ীকে তার মনে আছে, কিন্তু সে এক প্রিয়দর্শন তরুণের নিরাকার ছায়ামাত্র,—রেখার আকার কিছু নেই। তারই প্রতি আকর্ষণে আত্মবিক্রয় করেছিল সেই মাধু, কিন্তু ঈশানী নয়। ছেলেটার প্রকৃতি কেমন ছিল একথার সাক্ষ্য সেদিনকার মাধু দিতে পারতো, কিন্তু ঈশানীর পক্ষে সম্ভব নয়। ছেলেটা ভালোবেসেছিল কি না বলা কঠিন, কারণ যৌবন-চাঞ্চল্যের গদগদ প্রলাপটাকে প্রেমের নাম দেওয়া চলবে না। যে-স্মৃতি কেবলমাত্র যৌন-চেতনার মধ্যে শিহরণ আনে, তাকে প্রশান্ত প্রেমের ভাবাবেশ বলা চলবে না। কেন না প্রেমের এক হাতে আছে কল্যাণ কামনা, অন্য হাতে ত্যাগ-বুদ্ধির প্রসন্ন উদারতা। সেইজন্য ছাড়াছাড়ির মধ্যে প্রেমের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু টানাটানির মধ্যে তা'র নিশ্চিত অপমৃত্যু। প্রেমের ঐশ্বর্য হোলো অশ্রুতে, কিন্তু কামনার প্রকাশ হোলো বিলাপে।

অমনি শান্তনু চেপে ধরলো ঈশানীকে,—তার মানে? মাধু কি ভালোবাসেনি?

ঈশানী হাসলো। বললে, মাধু সম্ভবত তার ওই লঘু প্রণয়ের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। বুঝতে পারলিনে?

না।

দুই বিস্ফোরক বারুদ এসেছিল কাছাকাছি। দুইয়ের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠেছিল। সেই আগুন নিবলো মাধুর চোখের জলে। মেয়েরা যে জন্ম-অর্বাচীন। ওরা যন্ত্র, পুরুষ হোলো যন্ত্রী! ওদের নিজস্ব অনন্যতা নেই, পুরুষ ওদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে, তাই ওরা সচল হয়। যে পুরুষের আঘাতে ওদের জীবন লণ্ডভণ্ড হয়, সেই পুরুষই ওদেরকে চিরকালীন মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে পুজো দেয়! ভালোবাসার আগেই অরুণ মাধুকে চেয়ে বসলো, ভালোবাসার চেতনা জন্মাবার আগেই মাধু আত্মদান করলো। স্বামী পাবার জন্য সে অপেক্ষা করতে পারলো না, পুরুষকেই আগে পেয়ে গেল। অর্বাচীন মেয়েটা একথা বুঝলো না, সব পুরুষের মধ্যে স্বামী নেই। ওদুটো একসঙ্গে যে-মেয়ে পায়, সংসারক্ষেত্রে সেই মেয়েই সার্থক।

কথা উঠতে পারে ঈশানীর জীবনের সার্থকতা কোথায়? তৎক্ষণাৎ উত্তর এসে পৌঁছবে, ঈশানী নামটার মধ্যেই সার্থকতা। বাঁকা কটাক্ষে যে-মেয়ে তাকায়, সে-মেয়ে লক্ষ্য করে সংসারের উল্টো দিকটা। যেটা চলছে এতকাল, সেটা কোন্ যুক্তিতে চলছে? নাচের জগতে আমার খ্যাতি কম নয়, কিন্তু নাচছি, না নাচাচ্ছি?

শান্তনু বললে, তুই হ'লি যন্ত্র, আমি তোকে নাচাচ্ছি।

ভুল! এতকাল পুরুষ নাচিয়েছে, এবার কিছুকাল আমরা নাচাই। আমরা টাকা এনে ওদেরকে নাচাবো, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ওদেরকে নাচাবো, শাসন-কেন্দ্রে ব'সে ওদেরকে নাচাবো, সন্তান-ধারণ বন্ধ ক'রে ওদেরকে নাচিয়ে নাচিয়ে ঘোরাবো। ওরা ধেই-ধেই ক'রে নাচুক, কিছু দিন কাঁদতে কাঁদতে নাচুক,—জীবন রঙ্গমঞ্চে ওদের নাচন-কোঁদন দেখে আমরা হাততালি দিই।

কৌতুক ক'রে শান্তনু বললে, কিন্তু ঘরকন্নাটা? প্রাণের দায়টা? পাখী ডিম পাড়বে কোথায়?

ঈশানী জবাব দিল, পাড়বে না। দরকার মতো পাড়বে। তারপরে রইলো অনন্ত মুক্তির আকাশ!

শান্তনু আবার হাসলো। বললে, বিবাহ-বিচ্ছেদ চালু হ'লে একদিকে বাড়বে ভিক্টরদের সংখ্যা, অন্যদিকে গজাবে মেয়ে-সন্ন্যাসীর দল।

খিল খিল ক'রে ঈশানী হেসে উঠলো। বললে, মন্দ কি, সেদিন গিয়ে স্ত্রীহীন 'স্বামী'দের আশ্রমগুলি দখল ক'রে নেবো।

হাসি নিয়ে ওদের কাটে সারাদিন, পরিহাস নিয়ে কাটে সন্ধ্যাকাল, তারপর রাত্রে গভীর স্বরে গভীর কথার জাল বোনা। অন্ধকারে বাঁশী বাজাবার আসর বসে নিরিবিলি ছাদের উপর। সেদিন প্রায় মধ্যরাত্রে ছাদে উঠে এসে ঈশানী সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ ক'রে শান্তনুকে দেখালো তার নাচের পটুতা। নাচের জন্য ঈশানীর দেশজোড়া খ্যাতির কথা শুনে শান্তনু কিছুটা ওর নাচের প্রতি বিরূপ ছিল। ঈশানী প্রমাণ ক'রে দিল, তার নৃত্যটা হোলো দেহোৎসর্গের মতো। ঊর্ধ্বায়িত দেহটা হোলো একটি স্তব, একটি সকরুণ প্রার্থনা, আত্মবিসর্জনের একটি ব্যাকুল বাসনা। সেই দেহ লজ্জাজড়িত নয়, কুণ্ঠা-অবগুণ্ঠা নেই সে-দেহে, কারণ দানের মধ্যে সঙ্কোচ থাকলে চলবে না, সে দান গ্রহণ করেন না জীবন-দেবতা! লজ্জা, মান, ভয়, দ্বিধা, লাজুকতা,—এরা হোলো বাধা, এরা উপচারকে কণ্টকিত করে, এদের জন্য নাচের নৈবেদ্য কলুষিত হয়। ঈশানী নাচলো মৃদু বাঁশীর মিহি মধুর তানের সঙ্গে,—পুরুষোত্তমের নিত্যকালের বংশীধ্বনির সঙ্গে মায়া-মোহিনী পরমাপ্রকৃতি যেমন আপন কক্ষ-পথে নেচে বেড়ায়।

রাত্রি কখন্ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে ওরা লক্ষ্য করেনি। গগনের কোণায় কোণায় ঈশানের কাল-কটাক্ষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ছাদের উপরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে মৃদু বাঁশী মুগ্ধকণ্ঠে বেজে চলেছে। অদূরে সর্বনাশিনী উর্বশীর ছায়াটা আপন নাচের আনন্দে আত্মহারা, তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না। চোখ বেয়ে ঈশানীর জলের ধারা নেমেছিল।

এমন সময় রুদ্রের প্রচণ্ড অগ্নিক্ষরা ঝলসিত তরবারী আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি দ্বিধাবিভক্ত ক'রে দিল। সেই প্রলয়োচ্ছ্বাসের পলকে শান্তনু দেখে নিল মর্ত্যের মায়াবিনীকে। ঈশানের অনাগত সূর্যের দিকে রাত্রির রক্তকমল আপন নগ্নমরণকে মেলে ধরেছিল।

বাঁশী থামিয়ে ছাদের দরজাটা খুলে শান্তনু অন্ধকারে নীচে নেমে গেল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড় উঠে এই সমগ্র নিষ্প্রদীপ অট্টালিকাকে আঘাত হানলো। জানালা ও দরজার কবাট বুক চাপড়ে হাহাকার ক'রে উঠলো।

দেখতে দেখতে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এলো।

পরদিন প্রভাতের শান্ত আকাশ নবীন সূর্যের আবির্ভাবে জ্যোতিষ্মান হয়ে দেখা দিল। শান্তনু প্রভাতের পদচারণায় বেরিয়ে পড়লো। প্রসন্ন তার চিত্তলোক, আনন্দের প্রসাদগুণে দিকদিগন্ত তার উদ্ভাসিত।

সদ্যঃস্নাতা ঈশানী তসরের একখানা শাড়ী জড়িয়ে বারান্দায় এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। দূরের থেকে দৃষ্টিবিনিময়ের দ্বারা দুজনে দুজনকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। শুভ প্রভাত!

কিছুক্ষণের মধ্যেই রমেনবাবু একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন। গাড়ীখানাকে দাঁড় করিয়ে তিনি সরাসরি উপরে উঠে এলেন। নন্দ তাঁকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসালো।

রামতীরথের কাছে রান্নাবান্নার হিসেব দিয়ে ঈশানী এসে ঘরে ঢুকলো। রাঙ্গাপাড় তসরের শাড়ীখানা সকালের রৌদ্রের আভায় তাকে মানিয়ে গেছে। লাবণ্যের সঙ্গে এমন সম্ভ্রম সহসা চোখে পড়ে না। রমেনবাবুর দুই চোখে শ্রদ্ধা ভ'রে এলো।

এত সকালে আপনি?

সকালে!—রমেনবাবু বললেন, পাছে কোথাও তুমি বেরিয়ে পড়ো, তাই রাত থাকতে উঠেছি। মুখোমুখি ছাড়া এসব কথাবার্তা পাকাপাকি হয় না।

ঈশানী বললে, কষ্ট ক'রে এলেন এতদূরে, না এসে বরং টেলিফোন করলেই পারতেন!

টেলিফোনের কথা আর ব'লো না। ওটা আজকাল থাকা না থাকা একই কথা। যতক্ষণে তোমার নম্বর পাবো, তার আগেই তোমার এখানে পৌঁছে যাবো। অবিশ্যি কাল রাতে অফিসে ব'সে একবার মনে করলুম, তোমাকে ফোন করি। কিন্তু রাত তখন দশটা। ভাবলুম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঈশানী বললে, ঠিক ঘুমোইনি, তবে হ্যাঁ, ওই এক রকম আর কি। তারপর খবর কি বলুন।

রমেনবাবু বললেন, তোমার কাছে পাকা কথা পাওয়া গেছে, আর আমার কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু হঠাৎ কাল রাত ন'টার পর দিল্লী থেকে জরুরী ট্রাঙ্ক কল্! ওরা আমাদের যাবার কথাটা পাকাপাকি জানতে চায় অর্থাৎ তারিখটা জানবার জন্যে ওরা ব্যস্ত। ওদের আবার নানারকমের পাবলিসিটি আছে কি না। আর তা ছাড়া আরেকটা কথাও ওরা জানতে চেয়েছে।

একটু আনমনাভাবে ঈশানী বললে, কি বলুন?

যদি আমরা কিছু টাকা চাই তাহ'লে ওরা এখানকার ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারে।

ঈশানী বললে, আপনি গীতালী সঙ্ঘের নামে অবশ্য টাকা নিতে পারেন, কিন্তু আমি নিজে কোনো টাকা অগ্রিম নেবো না।

বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন রমেনবাবু এবার একটু হাসলেন। বললেন, ঠিক এই কথাটি আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলুম। আসছি এত বড় শিল্পীর কাছে, যদি খোস-মেজাজে আর বহাল তবিয়তে না পাই? ঠাকুরের নাম করতে করতে আসছি। হে ঠাকুর, তুমি যেন স্থানে থেকে কানে শুনো!

ঈশানী হেসে ফেললো,—কেন, কি হয়েছে বলুন না?

কপাল! কপাল ছাড়া কিছু নেই! টাকা কি কেউ রোজকার করে? ও হোলো কপালের ফল, মা-লক্ষ্মীর দৃষ্টি! আমারই ভুল। মনেই থাকে না যে, বড় শিল্পী মানেই বড় প্রতিভা! আর প্রতিভার চেহারাই হোলো আলাদা! তার

হাতে যে স্ফূর্তি, তাই সে নিজের খেয়াল-খুশিতেই চলে ! বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, জ্ঞানবুদ্ধি আমার পাকলো না।

ঈশানী বললে, আপনার বোধহয় টাকার দরকার, তাই না ?

হ্যাঁ, ধরেছ ঠিক ! আর না ধ'রেই বা যাবে কোথায় ? কত লোক কত বড়-বড় পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়তে নামে, কিন্তু তোমার মতন আর্টিষ্ট ক'জন পায়, বলো ত' ? তা যখন পেয়েছি তখন মনের কথা বলতে আর বাধা কিসের ?

ঈশানী বললে, কত টাকা পর্যন্ত ওরা অগ্রিম দিতে চায় ?

রমেনবাবু বললেন, তা হ'লে শোনো। ছেলে আর মেয়ে নিয়ে আমাদের তিরিশ বত্রিশ জন আর্টিষ্ট, তা ছাড়া আমার নিজের ষ্টাফ,—তাও তিন চার জন। ওরা বলছে, দিল্লী পৌঁছনো পর্যন্ত ওরা হাজার চারেক টাকা আর আমাদের পাওনার খাতে হাজার খানেক—মোট পাঁচ হাজার টাকা এখনই দিতে চায়।

ঈশানী বললে, বেশ ত' !

কিন্তু পোষাক আসাক্ ! খুচরো খরচা ! কিছু কিছু বাজাবার যন্ত্র ! লোকজনের মাইনে।—এই সব নিয়েই যত গণ্ডগোল বেধে উঠেছে অফিসে।—রমেনবাবু গলা নামিয়ে এবার বললেন, আবার কি জানো ঈশানী, নাচ-গান করলে ওদের যেন ডবল্-তে-ডবল্ ক্ষিধে বেড়ে ওঠে। কথায় কথায় চা, কথায় কথায় জলখাবার। যেমন-তেমন জলখাবারের প্লেট সাজাতে যাও, আটগণ্ডা পয়সা লেগে যাবে। ওর মধ্যে আবার নাক উঁচু ক'রে কোনো কোনো মেয়ে বলে, আমরা 'দাল্‌দা'য় ভাজা কচুরি-শিঙ্গাড়া খাইনে,—নাচতে গেলে আমাদের পেট মোচড়ায়। আমি তখন বলি, গাওয়া ঘি কোথায় পাবো, মা ঠাকরুণ ? গরু পুষেছি অনেক, কিন্তু একটাও দুধ দেয় না !

ঈশানী হঠাৎ খিল খিল ক'রে হেসে লুটোপুটি খেয়ে গেল।

রমেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা যা বলেছ। গান বাজনা নাচ অভিনয়—যাই বলো না কেন, ওতে লিভারের কাজ ভালো হয়। আর লিভার ভালো হবার মানে বুঝে নাও,—ম্যানেজারের তবিলের সর্বনাশ। ডিম বলো, মাখন-রুটি বলো,

ফলমূল আর লুচি-মাংস-সন্দেশ—যা কিছু বলো, টাউ টাউ ক'রে গিলে খায়। ওদের হোলো পাখীর স্বভাব, উড়তে পারলে ভারি খুশী!

ঈশানী হাসি সম্বরণ করার জন্য আঁচলে মুখ চাপা দিল।

রমেনবাবু বললেন, তোমার কি ধারণা দুর্ভিক্ষ দেশ থেকে গেছে? মোটেই না, দুর্ভিক্ষ ওদের পেটে পেটে! আর আমাদের কপাল ভাখো, ব'সে ব'সে কাজ করি কি না। তাই একটু আধটু সামান্য সব্জি সেদ্ধ খেলেই ব্যস,—ভুঁড়ি বেড়ে উঠলো যেন কুমড়ো পটাশ! ওই জন্যে আই-এ পড়া মেয়েগুলো আমাকে বলে, পুঁজিবাদী! শোনো কথা!

রামতীরথ প্রাতরাশ এনে সামনে রাখলো। মুখ তুলে ঈশানী প্রশ্ন করলো, ছোটবাবু ফিরেছেন, রামতীরথ?

হাঁ মা, কাগজ পড়ছেন।

ঈশানী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি খেতে আরম্ভ করুন, আমি আসছি।—এই ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

শান্তনু নিবিষ্টমনে খবরের কাগজখানার ওপর চোখ বুলোচ্ছিল। পিছনে ঈশানী এসে দাঁড়ালো। কানে কানে বললে, রমেনবাবুকে কি জবাব দেবো?

আমি বলবো কেমন ক'রে?

তাই ব'লে চুপ ক'রে থাকবি?

আঃ—ব'লে কাগজখানা ফেলে শান্তনু উঠে এসে এঘরে ঢুকলো। রমেনবাবু হাত তুলে নমস্কার জানালেন, আসুন আসুন, অনেকদিন দেখা নেই।

শান্তনু একটি আরাম চেয়ারে বসলো। রমেনবাবু বললেন, এই দুঃখু-ধান্দার কথাবার্তা হচ্ছিল আর কি। চিরকাল টেবিলে ব'সে কলম ঠেলে কাটালুম, কিন্তু একটা নামসই করলে যে পাঁচ হাজার টাকা তার দাম হয়, একথা জজে বললেও মানতুম না। ঈশানীকে দেখে সে কথা বিশ্বাস করেছি।

ব্যাপার কি? নতুন বরাত?—শান্তনু সহাস্যে তাকালো।

ঈশানী বললে, উনি তোর কাছেই ব্যাপারটা বলতে এসেছেন।

রমেনবাবু পলকের মধ্যেই চোখটা এদিক থেকে ওদিকে বুলিয়ে নিলেন।

বললেন, হ্যাঁ তা বই কি, কথাটা তাই ত' দাঁড়ায়। আমারই ভুল, শান্তনু-বাবুকেই ত' আগে বলা দরকার। অভিভাবক ত' বটে।

ঈশানী বললে, দিল্লী যাওয়া আমাদের স্থির। তবে কবে যাবো, এই হোলো কথা। সেখান থেকে টেলিফোন এসেছে ওঁর কাছে, তারা গাড়ীভাড়া আর হাজার খানেক টাকা অগ্রিম দিতে চায়। কিন্তু আমি যদি ওদের সঙ্গে 'শো' করি এবং যেতে রাজি হই, তাহ'লে তারা কিছু বেশী টাকা দিতে প্রস্তুত। তবে আমার টাকাটা বোধ হয় উনি এখন নিজের হাতে নিতে চান্—তাই না, রমেনবাবু?

রমেনবাবু প্রফুল্লকণ্ঠে বললেন, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি! এইটি হোলো আমার মনের খাঁটি কথা!

শান্তনু বললে, টাকাটা ঈশানীর হাতে আসতে কি দেরী হবে?

লাফিয়ে উঠলেন রমেনবাবু,—ওরই প্রতিষ্ঠান, ওরই টাকা! যা কিছু দেখছেন মিষ্টার চৌধুরী, সবই ওর! আমরা ত' সবাই ওর টাকাতেই নবাবী করি! কে না জানে!

ঈশানী চট্ ক'রে বললে, একথা আপনার সত্যি নয়, রমেনবাবু। ওরা সবাই প্রত্যেকে শিল্পী, আপনি বড় একটা প্রতিষ্ঠান নিজের পরিশ্রমে পরিচালনা করছেন,—নিজের শক্তিতেই আপনাদের প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেকেই নিজের গুণপনার ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শান্তনু হাসলো। বললে, ওরা হচ্ছেন দাহ্য, তুই হ'লি দাহিকা। উনি তাই বলতে চান্।

রমেনবাবু বললেন, এই যা বলেছেন! আসল কথা হোলো এই! শুধু বাঁশী নয়, ভাষাও কিছু আছে তার সঙ্গে!—বলতে বলতে নিজের আনন্দেই তিনি হো হো ক'রে হাসলেন।

ওরা সবাই জলযোগে ব'সে গেল।

ঈশানী বললে, আমার নামে কত টাকা আপনি চান্?

বেশী নয়,—রমেনবাবু বললেন, হাজার তিনেক টাকা হ'লেই ঝড়তি-পড়তি

দেনাগুলো শোধ ক'রে দিতে পারি। ঠাকুর যদি মানরক্ষে করেন, তাহ'লে এ-টাকা সামনের বছরের গোড়াতেই তোমাকে ফেরত দিতে পারবো!

ঈশানী বললে, কিন্তু আগের দেনার দরুন সেই সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা!

অপ্রস্তুত হবার লোক রমেনবাবু নন্। তিনি পুনরায় উচ্চকণ্ঠে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, সম্রাট আকবরের সেই গল্পটা মনে পড়ছে। গান শুনে খুশী হ'য়ে তিনি গায়ককে একটি হাতী উপহার দিলেন। গায়কের সাধ্য কি হাতীকে খাওয়ায়। সে হেসে বললে, সম্রাট, আপনার উপহার আপনি ফেরত নিন্। এও তাই। তুমি হাতী উপহার দিয়েছ, ঈশানী, কিন্তু তোমার খরচে এ-হাতীকে না খাওয়ালে এর অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী! আর দেনার কথা বলছ? সেও গেছে ওই হাতীর ভোগে!

শান্তনু হাস্যমুখে বললে, গল্পটা সত্যই যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে!

ঈশানী বললে, কিন্তু আমার পালাবার পথ ক'রে দিন?

রমেনবাবুর হয়ে শান্তনু জবাব দিল, যেখানে পালাবি, ওই পাগলা হাতী ছুটবে পিছু পিছু। তার চেয়ে আমি বলি এক কাজ কর। ওই হাতীর পিঠের ওপরেই হাওদা নিয়ে ব'সে যা।

ঈশানী বললে, ও-প্রতিষ্ঠান চালাবার সাধ্য আমার নেই। আমি গ'ড়ে দিতে পারি, কিন্তু লেগে থাকতে পারিনে। আমারই গড়া জিনিস, আমারই গায়ে শৃঙ্খল জড়াবে,—সে অধীনতা অসহ্য!

শান্তনু বললে, তাহ'লে এ টাকা ওকে তুই দিয়েই দে। বাস্তবিক, তোদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে উনি ত' সত্যিই বিব্রত। পাওনাদাররা ওকেই চেনে, তোর কাছ পর্যন্ত তারা পৌঁছয় না। ওরই জ্বালা বেশী। তুই নেচে খালাস, ওকে কিন্তু সেই নাচের দাপট সইতে হয়।

ঈশানী প্রশ্ন করলো, আপনি নিজে কত টাকা নেন্, রমেনবাবু?

রমেনবাবু জবাব দিলেন, আমি? তবেই হয়েছে! আমি হলুম রাঁধুনি-বামুন। সবাই ভুরিভোজন শেষ করলে যা উচ্ছিষ্ট থাকে, তাইতে আমার উপোস রক্ষে হয়। আমার কথা না তোলাই ভালো, কি বলেন মিষ্টার চৌধুরী!

বটেই ত!

যাক্, বাঁচলুম। এবার আমি উঠি। হ্যাঁ, তাহ'লে দিল্লী পৌঁছবার তারিখটা কবে দেবো? পাঁচিশে বৈশাখ হ'লে মন্দ কি?

ভালোই হয়। তাই দিন্।

রমেনবাবু বললেন, তুমি কি একসঙ্গেই যাবে?

ঈশানী বললে, না, আমি আলাদা যাবো। হয়তো বা কিছু আগেই যাবো। আমার অন্য কাজ আছে।

বেশ—রমেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহ'লে অন্যান্য কথা টেলিফোনে তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে নেবো।

পুনরায় ঈশানী বললে, ওদের কাছে তাহ'লে পাঁচ হাজার টাকার কথাই বলবেন আমার নাম ক'রে। ওরা যেন ফোন করে, আপিসে গিয়ে আমি টাকা নেবো। টাকা আমার নিজেরও দরকার।

রমেনবাবু বিদায় নিলেন। নীচে তাঁর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। হাসিখুশী মুখে তিনি নীচে নেমে গেলেন।

সকৌতুক দৃষ্টিতে ঈশানীর দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে শান্তনু বললে, তুইও ত' ব্যবসাদার কম নয়?

ঈশানী বললে, টাকার গন্ধ পেলে কে না চতুর হয়, বল্ ত'? কিন্তু এরা ভুল করছে। সোনার ডিম একসঙ্গে অনেকগুলো পাবার লোভে ওরা হাঁসটাকে কাটতে চাইছে। ব্যয়টা তুই দেখছিস্, আয়টা এখনও তোর চোখে পড়েনি। দেখলে খুশীই হ'বি।

শান্তনু বললে, কিন্তু তোর কথায় রমেনবাবুর প্রতি সন্দেহের একটা সুদূর ইঙ্গিত ছিল। উনি হয়ত বোঝেন নি,—আমার কানে লেগেছিল।

ঈশানী জবাব দিল, ওঁর ওপর আমার কোন আক্রোশ নেই। বরং আমার ধারণা, উনি না থাকলে এ-প্রতিষ্ঠান চালাবার অন্য লোক আর পাওয়া যেতো না। কিন্তু তোকে খুলেই বলি, উনি ওঁর গরীব শ্বশুরের 'বেনামীতে সম্প্রতি ছত্রিশ হাজার টাকায় একটি সম্পত্তি কিনেছেন!

ধিক্ তোকে, ঈশানী! শত ধিক্!—ঈশানীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তনু অন্য ঘরে চ'লে গেল।

ঈশানী একবারটি থমকে দাঁড়ালো, তারপর ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ ক'রে বারান্দা পেরিয়ে এসে দেখলো, শান্তনু সেই সংবাদপত্রখানা নিয়ে একান্তে গুম হ'য়ে বসে গেছে। ঈশানী সামনে এসে কাগজখানা টান মেরে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল। তারপর বললে, গালাগালি দিলি কম, উত্তেজনা চাপলি অনেকখানি।

শান্তনু বললে, না, আমার কিছু বলবার নেই।

আমার আছে।—ঈশানী বললে, আমার প্রতি লোকের বদান্যতার কথাই শুনবি, বঞ্চনার কথা শুনবিনে কেন?

শান্তনু বললে, টাকার সঙ্গে নোংরামি জড়ানো থাকে, তুই তার মধ্যে পা বাড়াবি কি জন্যে? একদিন আমার সম্বন্ধেও যদি তোর মনে এই কথা ওঠে?

ধিক্ তোকে, শান্তনু! শত ধিক্।—ঈশানী যেন চাবুক নিয়ে দাঁড়ালো।

ধিক্ কেন? এ কি সত্যি হ'তে পারে না?

ঈশানী বললে, তুই আমাকে অনেকবার অনেক পরীক্ষায় জব্দ করতে চেয়েছিস্, কিন্তু এ-পরীক্ষায় তুই নিজেই জব্দ হ'বি।

কেন?—শান্তনু তার দিকে তাকালো।

ঈশানী বললে, যেখানে কুণ্ঠা সেখানেই মনের জটিলতা। তোর মনে পুরুষের অহঙ্কার আছে ব'লেই কুণ্ঠা আছে। সেইজন্য তোর মন কাঁটা হয়ে থাকে দিনরাত, নিজেই তার জন্য কষ্ট পাস। এই ত' নিজের চোখেই দেখলুম, তুই হাসিমুখে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে এলি, তোর ন্যায্য পাওনা কেড়ে নিয়ে তোকে পথে বসিয়ে দিল,—কিন্তু বিনা তর্কে বিনাযুদ্ধে তুই সমস্ত ত্যাগ ক'রে এলি।—আমি কি জানিনে যে, লোভ দেখিয়ে তোকে বেঁধে রাখা যায় না? আর মেয়ে মানুষের প্রতি আসক্তি? আমি কি সুষমাকে দেখিনি? অমন ক'রে কেঁদে গেল চোখের সামনে দিয়ে, কিন্তু তুই মুখ ফিরিয়ে নিলি, কই একটা দিনও ওই কাঁচা বয়সের মেয়েটাকে নিয়ে তুই কাটিয়ে এলিনে ত'? তোকে কোনো রকম সন্দেহ করার পথ কি রেখেছিস তুই? তোকে ধিক্, তুই আমাকে এই

সব নোংরা কথায় টেনে আনিস। আমাকে ধিক্, তোর পায়ে মাথা খুঁড়েও তোর মন পেলুম না।

ঈশানীর চোখ দুটো জ্বালা ক'রে এলো। ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

কাগজখানা আবার টেনে নিয়ে শান্তনু কিছুক্ষণ তার ওপর চোখ রেখে পড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু হিজিবিজি কিছু বুঝতে না পেরে সে উঠে পড়লো। ঘর থেকে বেরিয়ে সে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে অবশেষে ঈশানীর শোবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। ঈশানী বিছানায় উপুড় হয়ে চুপ ক'রে শুয়ে আছে। একখানা পা ঝুলছে তার মেঝের দিকে।

শান্তনু ওর শয়নকক্ষে কোনোদিন আসেনি, আজও এলো না। ঘরের বাইরে ছোট্ট বারান্দায় চৌকিখানার ওপর সে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

নন্দ ওদিক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল, শান্তনুকে দেখে বললে, আরেক পেয়ালা চা দেবো, ছোটবাবু?

শান্তনু বললে, চা? তা মন্দ নয়, নন্দ।

গলার আওয়াজে তার একটু যেন কৌতুকের আভাস ছিল, ঈশানী উঠে এলো। বাইরে এসে চৌকিতে ব'সে প'ড়ে বললে, নন্দ, চায়ের সঙ্গে একরাশ পানতুয়া নিয়ে আয়!—

শান্তনু সকৌতুকে বললে, চা না হয় বুঝলুম, পানতুয়া কেন?

ঈশানী বললে, আঁতুড়ে অবস্থায় তোমার মা যখন তোমাকে নুন খাওয়াননি, আমি দেখি মিষ্টি খাইয়ে তোমার গলায় মধু আনতে পারি কি না।

শান্তনু বললে, চোখ লাল কেন? কেঁদেছিলি?

পোড়া কপাল আমার।—ঈশানী বললে, সেকালের সেই অর্বাচীন মাধু হ'লে কেঁদে ভাসাতো, আমি কাপড় দিয়ে চোখ ঘষে তোকে দেখাতে এলুম! আমার নাচই দেখবি, অভিনয় দেখবিনে?

শান্তনু বললে, বটে, সেকালের সেই অর্বাচীন মাধুকে পেলে আমি কি বলতুম জানিস? বলতুম, ওরে মাধু, এত চোখের জল ফেলেও তুই মনের মানুষকে ধ'রে রাখতে পারলিনে? এর পরে যদি আর কোনো ব্যক্তির মন পেতে

চাস, চোখে কাপড় ঘষিস, হয়তো বা তোর কান্না দেখে তার মন ভুলতে পারে!

ঈশানী বললে, আমি কি কেবল তোর মন ভোলাবার চেষ্টায় দিনরাত ঘুরে মরছি?

রাম বলো।—শান্তনু বললে, যার নাচের ইসারায় হাজার হাজার স্তাবক জোটে, রাজার মুকুট পায়ের কাছে লোটে, সে মন ভোলাতে আসবে আমার,—যার সামাজিক লৌকিক আর্থিক কোনো পরিচয়ই নেই? এত সামান্য তোকে কেন ভাববো? তুই যে একালের হিরোয়িন্। যুব সমাজের আদর্শ। লেখাপড়া জানা মেয়েরা সবাই তোর মতন হ'তে চায়, নতুন মনের ছেলেরা তোকে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো দিতে চায়! আমার মন ভোলাতে চাইবি তুই কোন্ লোভে?

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো। একটু পরেই নন্দ এলো চায়ের সঙ্গে একরাশ পানতুয়া নিয়ে। সামনে রেখে সে চ'লে গেল।

শান্তনু একটুও লজ্জা পেলো না। একটার পর একটা ক'রে গোটা চারেক নধর পানতুয়া সে খেলো। ঈশানী উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে সামনে ধ'রে দিল। তারপর তসরের আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নতজানু হয়ে শান্তনুর পায়ের কাছে ব'সে বললে, গুরুদেব, আমিও লোভী, প্রসাদ একটু পাবো কি?

শান্তনু বললে, ওইজন্যেই বলি, মেমসাহেবদের সঙ্গে মিশে তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস, একটুও হিঁদুয়ানী নেই তোর! সুষমা হ'লে আমার এই খাওয়ার পরিশ্রম দেখে পিছন থেকে বাতাস করতো!

বোধ হয় রামতীরথ আসছিল,—চক্ষের পলকে উঠে ঈশানী ঘরে চ'লে গেল। রামতীরথ সামনে এসে দাঁড়ালো।

শান্তনু বললে, আরেক গ্লাস জল পাঠিয়ে দাও ত'?

রামতীরথ নিজেই জল এনে দিয়ে গেল। গ্লাস ও পানতুয়ার প্লেট হাতে নিয়ে শান্তনু এবার ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর বললে, এই নে,—তোর গলাতেও মধু ফিরে আসুক।

ঈশানী হাসিমুখে প্লেটটা হাতে নিল।

ওরই পাশে ব'সে শান্তনু পুনরায় বললে, আমার নিজের বর্তমান জীবনও যুবক সমাজের আদর্শ তা জানিস ?

পানতুয়া মুখে দিয়ে ঈশানী বললে, কেন ?

শান্তনু হাসলো। বললে, সতীসাধ্বী নর্তকীর আশ্রিত-বাৎসল্যে পরিপুষ্ট,—নির্ভাবনায় অন্নবস্ত্র, দিনরাত্রি মন-দেয়া-নেয়ার রস-বিলাস, সুখের স্বপ্নে রঙীন ভবিষ্যৎ, দায়-দায়িত্ব কোথাও কিছু নেই,—এর চেয়ে কাম্য আছে কিছু ? এর ওপর যদি আবার বাঁশী বেজে ওঠে, তবে কালিন্দীর কূলে কূলে জোয়ার এসে মাথা ঠুকে যায়। আমিই ত' বেকার ছেলেদের আদর্শ !

হয়েছে।—গেলাস নামিয়ে ঈশানী বললে, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। এবার যাবার দিন ঠিক কর, নৈলে লোকসমাজে আমি যদি অপদস্থ হই, তুইও মুখ দেখাতে পারবিনে !

তোর জন্যে আমি মুখ দেখাতে পারবো না, মানে ? তুই আমার কে রে ?

ঈশানী চট্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন মুষ্টিতে শান্তনুর একরাশ চুল ধ'রে নাড়তে লাগলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, তুই আমার সকলের বড় শত্তুর !

হাসিমুখে ঈশানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রমেনবাবুর আগ্রহাতিশয্যটা প্রায় দিনরাতই ওদের পিছনে পিছনে লেগে রয়েছে। টেলিফোন করছেন তিনি দিনে অন্তত ছয় সাত বার। সেদিন তিনি অফিসে গিয়েই দিল্লীর ট্রাঙ্ক কল্ বুক করেছিলেন। অতঃপর দিল্লীর সঙ্গে আলাপ ক'রে ঈশানী এবং তার দলবলের নামে হাজার কয়েক টাকার ড্রাফ্‌ট্ আনিয়েছেন। সুতরাং দিল্লী রওনা হবার তোড়জোড় লেগে গেল।

সেদিন কন্‌ভেন্ট থেকে ফিরে শান্তনু একটু বেঁকে বসলো। বললে, আমি যাবো না।

তাড়াতাড়ি ছুটোছুটির মাঝখানে ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করলো, ও আবার কি কথা ? আমাকে দয় মজাবি তুই ? যাবো কা'র সঙ্গে

শান্তনু অন্যদিকে মনোযোগ দিয়ে বললে, তুই ত' একাই একশো! আমি বরং এখানে থাকি, তোর ঘরদোর পাহারা দেবো।

ঈশানী হাসিমুখে বললে, এখানে তুই আমার সম্পত্তির পাহারায় থাকবি, সেখানে নর্তকীর পাহারায় কে থাকবে, শুনি?

আমি কেন দেবো তার পাহারা? আমি ত' অগ্নি আর নারায়ণকে সাক্ষী রাখিনি!

বিদেশে যদি মাথার ওপর তুই না থাকিস, তাহ'লে চারদিকের ঝুনো ব্যবসাদারদের পাল্লায় প'ড়ে আমার কি দুর্গতি হবে তা তুই জানিস্? তার চেয়ে রমেনবাবুকে তুই ব'লে দে,—আমি চিরজীবনের মতন বরং নাচ-গান ছেড়ে দেবো, কিন্তু তুই না গেলে আমি যাবো না। সকাল বেলা তোর এই দুর্মতি কেন বল্ ত'?—ঈশানী সামনে এসে দাঁড়ালো।

শান্তনু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, একটি সর্তে আমি যেতে পারি।

সর্ত? কিসের?

ভিক্টরকে আমি সঙ্গে নেবো।

ভিক্টরকে?—ঈশানী সবিস্ময়ে বললে, শিলভিয়া ওকে ছাড়বে কেন? কন্‌ভেণ্টের নিয়মকানুন কি তোর জানা নেই?

শান্তনু বললে, নিজের ছেলের ওপর তোর অধিকার নেই কেন?

কে বলেছে নিজের ছেলে? কোনো স্বীকৃতি আমার আছে কি? এমন ভূত তোর ঘাড়ে চাপলো কি জন্যে?

শান্তনু বললে, ভূত নয়! তুই দিল্লী গিয়ে হাজার রকমের হট্টগোলে পড়ে যাবি, দিনরাত থাকবি তোর নিজের দলবল নিয়ে। নাচতে নাচতে তোর দিন যাবে। আর আমি গিয়ে বুঝি সেখানে চানাচুর চিবিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো?

ঈশানী বললে, তোর এই সমস্যা কি আমার মাথায় নেই বলতে চাস?

কি করবি তার জন্যে?

রমেনবাবুকে ব'লে রেখেছি শহরের একটু বাইরে আমার জন্মে একটি বাড়ী; উনি ব্যবস্থা করবেন।

শান্তনু বললে, সেখানে পরগাছার মতো আমি থাকবো কোন্ অধিকারে?

কিন্তু রমেনবাবুর কাছে তোর ত' অন্য পরিচয়!

আমার নিজের কাছে?

ঈশানী বললে, আমি যদি তোকে সমস্ত ঝড়ঝাপটা থেকে নিজের ডানা দিয়ে ঢেকে রাখি?

শান্তনু বললে, কোন্ সুবাদে?

চুপ ক'রে রইলো ঈশানী। পরে বললে, ভিক্টর সঙ্গে থাকলে তোর সে-অবস্থার উন্নতি কেমন ক'রে হবে?

তবু ওরই মধ্যে একটু আনন্দ! সঙ্গী থাকলেই অবাধ স্বাধীনতা, যথেচ্ছ পরিভ্রমণ!

ঈশানী বললে, ভিক্টরকে নিয়ে তুই এখানে-ওখানে ঘুরছিস, এত বেড়াচ্ছিস—আজ চিড়িয়াখানা, কাল ডায়মণ্ডহারবার, পরশু বটানিক গার্ডেনস্,—তবু তোর শখ মিটলো না? শিলভিয়া ওকে ছাড়বে কেন?

শান্তনু হাসিমুখে বললে, শিলভিয়াকে আমি ব'লে রেখেছি। সে রাজি আছে।

অ্যাঁ!—ঈশানী আবার বিস্মিত হোলো,—রাজি হয়েছে?—ও, এবার বুঝতে পেরেছি। নাঃ গতিক ভালো নয়!

শান্তনু ওর মুখের দিকে তাকালো। ঈশানী ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, তুই নিশ্চয় তোর ওই সর্বনেশে চেহারা নিয়ে শিলভিয়ার মুখের ওপর হাসিমুখে অনুরোধ জানিয়েছিস, মেয়েটা অমনি গলে গেছে! তাই না?

সম্ভব!—শান্তনু কৌতুকের হাসি হাসলো।

বুঝলুম! কপাল পুড়লো মেয়েটার!

তাহ'লে তোর কপাল পুড়েছে বল্?

ঈশানী বললে, আমার পোড়া কপাল আর পুড়বে কেন?—যাক্, তোর

মতলবটা ভালো। আমি নির্বোধের মতন দিল্লী শহরে নেচে বেড়াবো ওদিকে, আর এদিকে আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যাবে আমারই আঙিনা দিয়া? মাধু অনেক বোকা ছিল, কিন্তু অত বোকা আমাকে ঠাওরাসনে!

ঈশানী বারান্দার দিকে এগিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে মধুর আওয়াজ দিল, তেওয়ারী?

হুজুর!—নীচের থেকে তেওয়ারী সাড়া দিল।

গাড়ী বাহার করো।

যো হুকুম।

ঈশানী স'রে এসে শান্তনুর ঘরে ঢুকলো। বললে, তোর সেই ক্যামেরা বিক্রির টাকা থেকে শ' পাঁচেক টাকা এখন ধার দে ত?

শান্তনু উঠে গিয়ে টাকা এনে তার হাতে দিল! সমস্ত ব্যাপারটাই তামাসা। তবু সকৌতুকে শান্তনু বললে, এই নিয়ে অনেক টাকাই ত' ধার করলি। এবার নিজেকে বাঁধা রাখতে হবে!

তাই ত' আছি।—ব'লে ঈশানী দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কৈফিয়ৎ নেওয়া চলবে না, পাছে ঈশানীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। পুরুষ নিজেরা চিরদিন অবিশ্বাসী, সেইজন্য মেয়েদের ওপর তাদের বিশ্বাস কম। হারেম বানায় পুরুষ, বোর্খা পরায় পুরুষ, এবং রাজপ্রাসাদে বন্দী ক'রে রেখে কাব্য ক'রে মেয়েদেরকে বলে, অসূর্যম্পশ্যা! সূর্যও দেখে না তাকে। ধনী লোকের মেয়েদের সঙ্গে দারোয়ান পাঠায়, ফাঁকির কথা শুনিয়ে বলে, ওটা নাকি মেয়েদের সম্মান। রাজারাজড়ারা ঘেরাটোপের মধ্যে ময়ূরপঙ্খী পাল্কীতে পাঠায় রাজমহিলাগণকে, নির্বোধ নারীরা পুরুষের কাপট্য বোঝে না। পাল-পার্বণে যোগেযাগে গঙ্গার ঘাটে পুরুষ ভলান্টিয়ার মেয়েদেরকে পাহারা দেয় বড় আনন্দে এবং মধুর উল্লাসে। ওদের ভয়, মেয়েরা পাছে হারায়। অনেক মেয়ে যে স্বাধীনতা পেয়ে আত্মহারা হ'তে চায়, ঈর্ষান্বিত পাহারাদাররা একটুও সেকথা ভাবে না। সিনেমার গল্পেও তাই। মেয়েদেরকে পুরুষের সঙ্গে মেলাতে পারলে তবেই পুরুষরা খুশী হয়ে পয়সা দেয়। কিন্তু একা মেয়েকে ছাড়লে তাদের প্রাণে বড় দুঃখ লাগে।

মনস্তত্ত্ব জগতে এসব সমস্যার কথা শান্তনু বোঝে, তাই কোনো প্রশ্ন সে তোলে না, পাছে ঈশানী আঘাত পায়। টানাটানি সে করতে চায় না, কেবল নিজেকে সে নিরন্তর প্রকাশ করে—ওতে যদি কোনো মেয়ে অনুপ্রাণিত হয়, তার আপত্তি নেই। ওরা হোলো কামিনী, তাই সংযম ওদের প্রিয়,—বিপরীত রস না পেলে মেয়েরা দুঃখবোধ করতে থাকে। পুরুষের মধ্যে জানোয়ারী চেতনা স্বভাবতই উগ্র, সেইজন্য অনেক সময় বিবেকবিহীন অসংযমের দ্বারা মেয়েদেরকে সে মারে, এবং নিজেও মরে। নদীর উদ্বেলতা যদি তটের বাঁধন অতিক্রম করে, তবে তার চেহারা হোলো সর্বনাশা। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় না আছে শ্রী, না আছে সৌন্দর্য।

ঈশানী এমনি ক'রেই এক একবার বেরিয়ে চ'লে যায়। ঘরদোরের চেহারা তার আলুথালু হয়ে পিছনে প'ড়ে থাকে। টেবলের উপর অলঙ্কার ছড়ানো; দেরাজের মধ্যে টাকাকড়ির টানাটা খোলা, রেশমের শাড়ী আর জামা মেঝের উপর লুটোপুটি,—তার কোল-আঁচলের কোণে কসি পাকানো। উপকরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, আড়ম্বরগুলির প্রতি যত্ন নেই। ঈশানীর দেহটা হোলো তার প্রতিভা সত্তার একটা আবরণ মাত্র। দেহের অন্তরালে তার ঊর্ধ্বস্ফুটিত প্রাণপদ্ম,—ওই পদ্মের চারিপাশে শান্তনুর মনের ভ্রমর অহোরাত্র গুন্ গুন্ করে। সেই পদ্মগন্ধার ঘরখানার মাঝখানে এসে শান্তনু চুপ ক'রে ব'সে রইলো, এবং ওই মায়াবী ভ্রমর শান্তনুর হৃৎপিণ্ডের গুহালোক থেকে বেরিয়ে সমস্ত ঘরময় গুন্‌গুন্ ক'রে ফিরতে লাগলো।

ওদিকে কন্‌ভেণ্টের ময়দানের মধ্যে ঢুকে ঈশানীর মোটর সোজা এসে থামলো শিলভিয়ার ঘরের সামনে। চেনা মোটরের হর্ন, সুতরাং শিলভিয়া হাসিমুখে ছুটে বেরিয়ে এলো। গুড মর্নিং, মাধু!

ঈশানী তার করমর্দন ক'রে বললে, দিল্লী যাওয়া স্থির।

শিলভিয়া বললে, সে ত' জানি, তোমার প্রেমিক এসে ব'লে গেছে।

আমার প্রেমিক! কেমন ক'রে জানলে, শিলভিয়া?

শিলভিয়ার মুখে মিষ্টহাসি ভেসে উঠলো। বললে, মেয়েমানুষের জীবনের প্রথম প্রেমিককে লুকিয়ে রাখা বড় কঠিন, মাধু!

ঈশানী বললে, শান্তনু বুঝি বলেছে কিছু তোমাকে?

ননসেন্স—শিলভিয়া জবাব দিল, তোমার প্রেমিকটি ভীষণ লাজুক, অত্যন্ত কম কথা বলে। এমন ভদ্র ছেলে আমি দেখিনি।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত দুষ্টু, তা জানো, শিলভিয়া? আমাকে একটুও পরোয়া করে না। তোমার হাতে পড়লে শান্তনু খুব জব্দ হোতো!

শিলভিয়া বললে, বটে,—আর আমি যে চিরকাল কেঁদে কেঁদে মরতুম?

ঈশানী অবাক হয়ে বললে, কেন?

শিলভিয়া জবাব দিল, তোমার জন্যেই শান্তনু জন্মেছিল। তোমাকে ছাড়া কোনো মেয়েকে সে ভালোবাসতে পারবে না।

কেমন করে জানলে?

সেদিন তোমার প্রেমিকটি ভিক্টরের সঙ্গে লাইব্রেরীতে ব'সে গল্প করছিল। আমি গিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ালুম ভিক্টরের পাশে। প্রশ্ন করলুম, Mr. Chowdhury, what is that thing, which you are really fond of? কথাটা শুনে শান্তনু আমার দিকে তাকালো। বললে, Yes, you see, the great mind always inspires me. বললুম, But you cannot always find it around! Do you? ভিক্টরের সামনে বসেই শান্তনু বললে, Certainly yes, it is there where I stay on for the present. শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম, মাধু।

বাষ্পাচ্ছন্ন দুটো চোখ ঈশানী সামলিয়ে নিল। মুখে বললে, কিন্তু আমার দিকের কত বাধা আর অসুবিধা তা তুমি জানো, শিলভিয়া!

শিলভিয়া বললে, ক্ষমা করো, মাধু—ওটা তোমার হিন্দুমনের সংস্কার। তাই ব'লে ওটাকে যে অশ্রদ্ধা করি তা নয়, ওটা বুঝতে পারিনে বলেই দুঃখ লাগে। আমার বিশ্বাস কি জানো, শান্তনুও তোমার এই সংস্কারকে শ্রদ্ধা করে। অত্যন্ত ভদ্র মন তার।

কিন্তু আমি যদি এই সংস্কারকে ভাঙতে চাই শান্তনুর সাহায্য পাবো না?

শিলভিয়া বললে, সেকথা আমি কেমন ক'রে বলবো, মাধু? তবে

রক্ষণশীল এই সংস্কার তোমার প্রেমিকেরও থাকতে পারে। সে নিজে বিদ্বান এবং পণ্ডিত।

ঈশানী বললে, তুমি হ'লে কি করতে, শিলভিয়া?

মধুর স্নিগ্ধ হাসি শিলভিয়া হাসলো। বললে, আমি এ ধরনের কোনো মনোভাব নিয়ে গ'ড়ে উঠিনি, যাধু! আমি মিশনারী!

শিলভিয়ার সম্পূর্ণ একখানা হাত নিজের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে ঈশানী বললে, দশ বছর ধ'রে আমার জীবন-সমস্যায় তুমি আর তোমার মা যে সাহায্য করলে, কোনো প্রেমিকের সাধ্য ছিল না আমাকে সেই সমস্যার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়।—শোনো, ভিক্টরকে যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই, তুমি অনুমতি দেবে?

শিলভিয়া বললে, তোমাকে মা ব'লে যে ছেলে চেনে না, তাকে সঙ্গে নেবে কেমন ক'রে?

ঈশানী বললে, শান্তনু ওকে ছেড়ে যেতে চায় না। কি করি বলো ত'?

শিলভিয়া বললে, শান্তনুর সঙ্গে ওর খুব ভাব, তার সঙ্গে ভিক্টর যেতে পারে। কিন্তু ভিক্টরকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাকবো, বললে না ত'?

ঈশানী হাসিমুখে বললে, It's a strange attachment for a missionary, indeed!

শিলভিয়া হাসতে হাসতে চ'লে গেল।

শান্তনুর সহযাত্রী হবে শুনে ভিক্টর সোৎসাহে তৈরী হয়ে নিল। মানচিত্র দেখে বিদেশের গল্প শুনেছে সে শান্তনুর মুখে। শান্তনু ওকে শুনিয়েছে ভারতের ইতিহাস আগাগোড়া। সভ্যতার পর সভ্যতার কাহিনী দিল্লীর ওপর দিয়ে ভেসে চ'লে গেছে, নয় বছরের বালকটি সে সব গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছে। অনাবিষ্কৃত ভারত তাকে যেন ডাক দিচ্ছে!

শিলভিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়ে আনলো। তারপর ভিক্টরের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ তাকে প্রস্তুত ক'রে দিল। সামনে গরমের ছুটি আসছে, কিন্তু দিল্লীতে নাকি এখানকার চেয়ে গরম বেশী। একথাও শিলভিয়া ব'লে দিল, সেখানে যদি ভিক্টরের বেশী দিন ভালো না লাগে তা'হলে আমাকে ট্রাঙ্ক

চল্‌ ক'রে ওকে প্লেনে পাঠিয়ে দিয়ো, আমি ওকে দমদমা থেকে নিয়ে আসবো।

আচ্ছা গো আচ্ছা, মিশনারী মেয়ে, ও যদি বা থাকতে পারে, তুমি ওকে ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারবে না জানি।

শিলভিয়া তার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ লুকিয়ে বললে, তোমার মতন পাষাণী কোনো মেয়ে নয়। সব মেয়ের মনে মা জেগে ব'সে থাকে সন্তান কতক্ষণে কোলে ফিরবে!

ঈশানী তার দিকে একবার তাকালো। বললে, তোমার কোল চিরদিন ভ'রে থাক শিলভিয়া, এই আমি চাই। এসো, ভিক্টর।

ভিক্টর সানন্দে গাড়ীতে উঠলো। বললে, মাম্মি, মিষ্টার চৌধুরীর কাছে যাচ্ছি ত'? আমি কিন্তু ট্রেনে উঠে তাঁর কাছে বসবো, কেমন?

অন্যমনস্ক ঈশানী বললে, নিশ্চয়ই, তিনি তোমাকে আনতে পাঠালেন।

স্নেহার্দ্রচক্ষু শিলভিয়া দূর থেকে সহাস্যে ওদের দিকে হাত তুললো।

৮

ঈশানীকে নিষ্ঠুর প্রকৃতি বললে যুক্তিশাস্ত্রে বাধবে। নিজের অপরাধ স্বীকার করতে সে প্রস্তুত, যদি সেটা যুক্তি দিয়ে কেউ ওকে বোঝায়।

ঈশানীকে প্রশ্ন করলে তখনই সে জবাব দেবে, ভিক্টর তাদের সঙ্গে চলেছে শান্তনুকে সাহচর্য দেবার জন্য, তা'র নিজের কোনো আত্মিক প্রয়োজনে নয়। বাৎসল্যটা স্নেহের মতোই আপেক্ষিক, কারণ সেটা সান্নিধ্য ও সংযোগের অপেক্ষা রাখে। জননী ও সন্তান আজন্ম একত্র থাকে, তা'র থেকে জন্মায় বাৎসল্য। কিন্তু যেখানে এর বিপরীত? সদ্যপ্রসূত শিশুকে চোখের আড়ালে নিয়ে যাও, সামনে এনো না কোনোদিন,—দেখা যাবে জননী কিছুকাল বিমনা থাকবে বটে, তার পরে আর কোনো বাৎসল্যের চেতনা নেই। নিত্য সান্নিধ্যই হোলো স্নেহাসক্তির মূল কথা। অনেক জননী তাদের সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে ভয় পেয়ে সন্তানকে ত্যাগ ক'রে পালায়। তা'রা পিশাচী নয়, কিন্তু সমাজের হাত থেকে আঘাত পাবার আতঙ্কে তা'রা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়। তারপরে ক্রমশ বিস্মৃতির প্রলেপ পড়তে থাকে মনে। ভিক্টরের জননী ছিল মাধু, সেই মাধু ম'রে গেছে। প্রসূতি-আগারে মাধু ছিল সপ্তাহখানেক, কিন্তু প্রসবের পর থেকে সে ভিক্টরের আর কোনো খোঁজ খবর পায় নি। সাত বছর পরে কনভেণ্টে গিয়ে প্রথমে সে ভিক্টরকে দেখে। কিন্তু বাৎসল্যের কোনো চেতনা তা'র মনকে স্পর্শ করে নি। সে ঈশানীর ছেলে নয়, শিলভিয়ার পালিত সন্তান। মাধু ম'রে গেছে, ঈশানী সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

ট্রেন চলেছে অন্ধকার রাত্রে অতি দ্রুত। গাড়ীখানা দুলছে। ভিক্টর যথাসময়ে তার অভ্যাসমতো বর্ধমান স্টেশন আসবার 'আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে গল্প করেছে সে শান্তনুর সঙ্গে অনেক, এবং সে সব গল্পের চৌহদ্দির থেকে

ঈশানীকে সে বাদ দিয়ে রেখেছিল। শান্তনু তা'র আপন, কেন না উভয়ের মধ্যে মনোজগতের জানাজানি, উভয় উভয়কে রসবোধের মধ্যে পেয়ে এসেছে,—কিন্তু ঈশানী তা'র আপন নয়। মাম্মি ব'লে ডাকাটা হোলো রেওয়াজ, ওটা শেখানো বুলি, সামাজিক ভব্যতা,—কিন্তু ওটার মধ্যে জননী কোথাও নেই। শিশু ও বালকের সব চেয়ে যে ব্যক্তি কাছে থাকে, সেই হলো একান্ত আপন—অন্য কেউ নয়। আনন্দ ও আহার লাভের ভিন্ন ক্ষেত্র যদি অধিকতরো আকর্ষণীয় হয় তবে যে-কোনো শিশু অতি অনায়াসে পিতামাতাকে ত্যাগ ক'রে যায়, ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না। নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রয়োজন মতো আহার্য পায় ব'লেই শিশুর কাছে পিতামাতার মূল্য, নৈলে সবটাই অলীক। ঈশানীর সম্বন্ধে ভিক্টরের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য নেই।

অন্যদিকের কথাটাও প্রায় তাই। ভিক্টর সম্বন্ধে ঈশানীর ঔৎসুক্য মাতৃস্নেহোচিত নয়। উভয়ের রুচি, ভব্যতাবোধ শিক্ষা, সংস্কার,—সমস্তই পৃথক। দু'জন দু'জগতের,—কোথাও পরস্পরের আত্মিক সম্পর্ক নেই। এই ছেলেটিকে একদা সে গর্ভে ধারণ করেছিল, এটা তা'কে চমক লাগায়, কিন্তু একথা ভাবতেই তা'র গা ছমছমিয়ে আসে। সেদিনকার সেই নবজাত শিশু তা'র সংসারানভিজ্ঞা জননীর সঙ্গে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে,—ঈশানী এই দোলায়মান গাড়ীর মধ্যে ব'সে তন্দ্রাজড়ানো চোখে সেই তাদের দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে। মাধুর সঙ্গে সবাই হারিয়ে গেছে।

শান্তনু ওই ছেলেটার বিছানা ক'রে দিয়েছে, খাবার সাজিয়ে সহাস্যে ওর সামনে ধরেছে, সিলিং ফ্যানটা ওর মাথার দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। শান্তনু চেনে ভিক্টরকে, ঈশানী চেনে শান্তনুকে।

আসানসোল ছাড়িয়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে গমগমিয়ে। এ গাড়ীতে ও'রাই তিনজন,—অন্য কেউ নেই। আপার বার্থে আমোদ ক'রে শুয়েছে ভিক্টর, তারই নীচের বার্থে ওরা দু'জন কাছাকাছি বসেছে। নন্দ এসেছে সঙ্গে, কিন্তু সে আছে অন্য গাড়ীতে। বাড়ীতে রয়ে গেল রামতীরথ আর তেওয়ারী, মোটর গাড়ীখানা রইলো চাবিতালা বন্ধ।

ঈশানীর চোখে তা'র নিজের ঘরকন্নাটা একটা খেয়ালের খেলা। ওটার বাঁধন কিছু নেই ব'লেই ওটার মূল্য স্বীকৃত। ঈশানীর প্রাণের মূলকেন্দ্রে ব'সে রয়েছে বৈষয়িক নিরাসক্তি, অনেক সামগ্রী নিয়ে অনেকবার সে নাড়াচাড়া করে, তারপর সেগুলো অনায়াসে সরিয়ে দেয়।

শান্তনুর চোখে ছিল বিস্ময়, মনে ছিল কতকটা অনুশোচনা। জননী ও সন্তানের ভিতরকার এই বিচিত্র সম্পর্কটা তা'র পক্ষে নতুন আবিষ্কার। এতদিন পর্যন্ত তা'র আঙ্কিক মন একটা অনুমান খাড়া করে রেখেছিল, কিন্তু সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হোলো। বারম্বার সে উভয়ের চেহারা লক্ষ্য করেছে, এবং বারম্বারই নৈরাশ্য তা'কে ঘিরে ধরেছে। উভয়ে মধ্যে সাত সমুদ্রের ব্যবধান। ঈশানীর মধ্যে মাতৃত্বের কোনো উদ্বোধন ঘটেনি।

এক সময়ে ঈশানী মৃদু গলায় বললে, ঘুম পায়নি ?

শান্তনু বললে, ঘুম ! কই না। কত রাত ?

ঈশানী সহাস্য মুখে নিজের কব্জি থেকে হাতঘড়িটা খুললো, তারপর শান্তনুর বাঁ হাতখানা টেনে সেই ঘড়িটি পরিয়ে দিল। শান্তনু বললে, এর মানে ?

ঈশানী বললে, আমি বাস করি অনন্তকালের মধ্যে,—সময় নিয়ে তুই মাথা ঘামা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখা গেল রাত একটা বেজে গেছে। এই মাত্র কি যেন একটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। পার্বত্য উপত্যকার আশে পাশে ট্রেন চলেছে। বেশ লাগছিল।

শান্তনু বললে, তোর সঙ্গে আমার কোনও প্রকার সামাজিক সম্পর্ক থাকলে এই ভ্রমণ এমন সুন্দর মনে হোতো না। কিন্তু এ তুই কি করলি, বল্ ত' ?

ঈশানী নিদ্রারসে ভরা দুই চোখে তা'র দিকে তাকালো। শান্তনু বললে, এ রকমটা দাঁড়াবে, এ আমি কোনোমতেই ভাবতে পারিনি।

ব্যাপারটা খুব অস্পষ্ট নয়, তবু ঈশানী মৃদুকণ্ঠে বললে, কেন ? কি বলছিস ?

শান্তনু চাপা কণ্ঠে বললে, ভিক্টরকে সঙ্গে এনে কি আমি সত্যিই ভুল করেছি ?

কেন ভুল করবি? তুই ত' এনেছিস তোর নিজের জন্যে!

কিন্তু ছেলেটির দিকে তোর মন কি কোনোমতেই এগিয়ে আসতে ।ারে না?

স্মিতমুখে ঈশানী বললে, আমি ত' তোদের সঙ্গেই আছি!

শান্তনু মুখখানা গম্ভীর ক'রে বললে, তুই কি সত্যিই ওর মা নয়?

ঈশানী হেসে উঠলো,—মাঝরাত্রে তুই দেখছি ভারি মজার তর্ক এনে ফললি?

শান্তনু চুপ ক'রে গেল। কিছুক্ষণ অবধি দুজনের মধ্যে কোনো কথা নেই। ।ানলার বাইরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়তলীর গাছপালা বন জঙ্গল পিছন িকে স'রে যাচ্ছে। সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ঈশানী সহসা একটু ত্তেজিত হয়ে বললে, ভিক্টর আমাকে একদিন মা ব'লে কেঁদে জড়িয়ে ধরবে, ।ার আমি বাবা ব'লে তা'কে কোলে নিয়ে চোখের জল ফেলবো, এই নাটুকে ্যাপারটা সামনে দাঁড়িয়ে দেখবার জন্যেই কি তুই ওকে সঙ্গে এনেছিস? এই ।হজ পরিশিষ্টের বাইরেও জীবনটা অনেক জটিল, শান্তনু।

শান্তনু বললে, আমাকে তুই ক্ষমা কর্, ঈশানী!

ঈশানী বললে, তুই ভালো ক'রে জানতে চাইলে আমি আগেই বলতুম। ামি জানি আমার অনুভূতি কিছু নেই, সেই জন্য ভিক্টরকে নিয়ে যখনই কোনো ালোচনা ওঠে, আমার নতুন লাগে। দু'মাস ছ'মাস অন্তর হয়ত পাঁচ মিনিটের ন্যে ওকে দেখতে পাই, ওই পর্যন্ত। প্রথম সাত বছর ওকে চোখেই আমি েখিনি, আমার জীবনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। শিলভিয়া আমার িদিনের বন্ধু, তাই কন্‌ভেণ্টে মধ্যে মাঝে যাই,—নৈলে সেখানে যাবার অন্য কানো কারণ নেই। বছর দুই আগে শিলভিয়া প্রস্তাব করলো, আমি যদি কিছু বেশী টাকা দিই, তবে ভিক্টরের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে ভালো কাজ হ'তে ারে। পেটে ধরেছিলুম একদিন, তা'র ঋণশোধের কথা আছে বৈকি।

শান্তনু বললে, ও যদি শোনে, তুই ওর মা?

ঈশানী বললে, শুনিয়ে দেখ্ একবার, হেসে উঠবে। কিন্তু এ সব কথা

শুনলে কি ফল হবে জানিস? ওর মনে একটা জটিল মনোভাব দেখা দেবে, সেটা ওর পক্ষে ক্ষতিজনক।

সত্যি বল্‌ত, ওর চেহারাটা কি তোর ভালো লাগে না?

চমৎকার লাগে—ঈশানী বললে, কিন্তু সেটা ত' শুধু ভালো লাগা, ভালো ব'লেই ভালো লাগা! ও যদি মন্দ হোতো, কী করতে পারতুম? অনেক ছেলেই মন্দ, ও হোতো তাদেরই একজন!

এত উদাসীন তুই? মা কী এমন পাষাণী হয়?

হেসে উঠলো ঈশানী। বললে, অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমো। তবু একটা কথা ব'লে রাখি, তোর বুদ্ধি-বিবেচনা নির্বিকার হোক, চল্‌তি সংস্কার থেকে বেরিয়ে আয়। এটা বুঝতে শেখ্‌, কাকের বাসায় কোকিল মানুষ হয়েছে,—জননী আর সন্তানের মধ্যে কোনো যোগ হয়নি!

শান্তনু উত্তেজিত হয়ে বললে, কিন্তু এর ভবিষ্যৎ?

আকাশপথের পথিক পাখীর ভবিষ্যৎ তুই-আমি কতটুকু জানি?

চিন্তিত মুখে শান্তনু বললে এরকম যদি হয় তাহ'লে তোকে আগেই ব'লে রাখি, দিল্লী পৌঁছে দুচারদিনের মধ্যেই আমি ভিক্টরকে ফিরে পাঠিয়ে দেবো!

সে তোর ইচ্ছে। ঈশানী চুপ ক'রে গেল।

ভোরবেলায় উঠলো ভিক্টর। এদিক ওদিক তাকালো, তারপর হেঁট হয়ে দেখলো, নীচে দুটো বার্থে অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে শান্তনু আর ঈশানী। রেলগাড়ীতে চড়েছে সে অনেকবার, দল বেঁধে এখানে ওখানে গিয়েছে 'এক্‌স্‌কারসনে', কিন্তু এমন ক'রে নিঃসঙ্গ রাত তা'কে কাটাতে হয়নি। অধিকাংশ সময়ে শিলভিয়া থাকতো তা'র কাছে। সব ছেলেমেয়ে শিলভিয়াকে বলে, ম্যাডাম,—কিন্তু সে ডাকে মাম্মি কিংবা শিলভিয়া! কবে থেকে ডাকে তা'র মনে নেই। ভাবতে মজা লাগে, শিলভিয়া খুব মনমরা হয়ে আছে। ওর জন্যে শিলভিয়া আলাদা বিস্কুট লুকিয়ে রাখে, সে-বিস্কুট এখন কে খাবে কে জানে! তাড়াতাড়ি না ফিরলে শিলভিয়া ভীষণ চটবে। আসবার আগে

কানে কানে যা শিখিয়ে দিয়েছে, মিষ্টার চৌধুরীকে সেকথা বলতেই হবে। এতক্ষণে তা'র বন্ধুরা সেখানে উঠে প্রার্থনায় বসেছে। হ্যারি, রোজ, ইসাবেলা, ফিলিপ, কক্স—সবাই।

ভিক্টর নীচে নেমে এলো, তারপর টয়লেট কেসটি খুলে তোয়ালে, মাজন, সাবান এবং হাফপ্যাণ্ট ও শার্ট নিয়ে সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। শিলভিয়া যেভাবে ব'লে দিয়েছে, ঠিক বর্ণে বর্ণে সেগুলি পালন করা দরকার।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সে বেরিয়ে এলো। একেবারে স্নান ক'রে বেরিয়েছে। গাড়ী চলছে অতি দ্রুত। বাইরে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে। সামনে চোখ পড়তেই দেখলো, ঈশানী বাইরের দিকে তাকিয়ে এক কোণে ব'সে আছে।

দুজনে চোখাচোখি হতেই ভিক্টর বললে, ড'মর্ণিং, মাম্মি!

ড'মর্ণিং, ভিক্টর।

ঈশানী উঠে দাঁড়ালো। অঘোরে ঘুমোচ্ছে শান্তনু। একটু গলা নামিয়ে ঈশানী পুনরায় বললে, এর মধ্যে তোমার স্নান করাও হয়ে গেল? চমৎকার! ভোরবেলা তুমি এক্সারসাইজ করো না?

ভিক্টর বললে, ম্যাডাম বলেছেন এগারো বছর বয়স হ'লে এক্সারসাইজ করতে সুরু করবো।

ঈশানী বললে, হ্যাঁ, তোমার বয়স এখনও সম্পূর্ণ দশ বছর হয়নি।

ভিক্টর ঈশানীর মুখের দিকে একবারটি তাকালো। তারপর বললে, স্ট্রেঞ্জ। তু—আপনি আমার বয়স জানেন বুঝি?

হ্যাঁ—ঈশানী অন্যদিকে ফিরে বললে, শিলভিয়াই আমাকে বলেছে!

ভিক্টর নিজের মনে স্বাধীন ভাবেই তা'র নিজের টিফিনক্যারিয়রটি খুললো। একটি প্লেট্ বার করলো—ফ্লাস্ক থেকে গরম দুধ, ডিমসিদ্ধ, কেক, মাখন-টোস্ট, এবং চিনি। নিজের হাতেই সে নিজের প্রাতরাশ সাজিয়ে নিল। তারপরে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, প্রায় সাড়ে ছ'টা! মিষ্টার চৌধুরীকে নিয়ে খাবো মনে করেছিলুম; কিন্তু উনি দেরিতে ওঠেন—!

ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলা ভাষা, সমস্তটা ঠিক গুছিয়ে বলে না। কিন্তু কণ্ঠস্বর মিষ্ট

ব'লে শুনতে ভালো লাগে। ঈশানীদের সঙ্গে প্রচুর খাদ্য ছিল নানাবিধ, এবং এও তা'র মনে ছিল, ভিক্টর এবং শান্তনুকে সে নিজের হাতেই পরিবেষণ ক'রে দেবে, কিন্তু ও-খাবারটা শিলভিয়ার, ওটা ভিন্ন জগতের, ওর মধ্যে শিলভিয়ার মাতৃহৃদয়ের মধুর আস্বাদ মেলানো, ওটার স্বাদই আলাদা। বুঝতে পারা গেল, গত সন্ধ্যায় শিলভিয়া স্টেশনে এসে ওদেরকে বিদায় দেবার সময় খাবারগুলি ওর কাছে লুকিয়ে রেখে গেছে।

এত কাছে ভিক্টরকে ঈশানী কোনোদিন দেখেনি। দেখেছে চোখ দিয়ে, মন দিয়ে নয়। ওর সমস্ত ধরন এবং বাচনভঙ্গী অন্য সমাজের, ঈশানীর সঙ্গে কোথাও মিল নেই। স্বভাবের মধ্যে মিষ্টতা আছে, কিন্তু আর্দ্রতা নেই। চাহনি, হাত পা নাড়া, বসার ভঙ্গী, এমন কি প্রসাধন ও প্রাতরাশ প্রস্তুতের মধ্যেও সাহেবী-ধরন—জড়তার চিহ্নমাত্র কোথাও চোখে পড়েনা।

ঈশানী হাসলো। বললে, ভিক্টর, মিষ্টার চৌধুরীকে তোমার খাওয়াবার কথ মনে হয়েছিল, কিন্তু কই, আমাকে কিছু 'অফার' করলেনা ত'?

মুখ তুললো ভিক্টর। রাঙ্গা ঠোঁট দুখানা একত্র ক'রে বললে, সরি, আমার মনে হয়নি!

ঈশানী আর কিছু বললে না, কেবল অলক্ষ্যে শান্তনুর গায়ে একটা টিপ দিে সে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মোগলসরাই স্টেশন পৌঁছে গাড়ী যখন থামলো, ঈশানী স্নান ক'রে বেরিে এলো। নন্দ এসে দাঁড়ালো গাড়ীর সামনে। ঈশানী বললে, বিছানাগুলে গুছিয়ে দিয়ে যা।

শান্তনুর এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো। মুখে চোখে জল দিয়ে সে বেরিয়ে আসতে ভিক্টর সামনে তা'র হাত ধ'রে প্লাটফরমে নামলো। শান্তনুকে তা'র একান্তভাে কাছে পাওয়া দরকার।

মোগলসরাই নামটা কেন হোলো জানা চাই বৈকি। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত এসেছে কিনা, এখান থেকে কাশী কোন্ দিকে, যমুনা নদী কতক্ষণে আসে এলাহাবাদকে প্রয়াগ বলে কেন,—এবম্বিধ নানা প্রশ্ন।

সবুজ ফ্ল্যাগ ওড়ানো। থা ... ওঠবার

শান্তনুকে একটুখানি আগ মধ্যে ... শেষে ... ক্তন্ত্র

শিলভিয়ার বন্ধু মাম্মিকে সে ... তে উঠে এলো। ... আকর্ষণ করে,

রঙীন ছোটপাখী অতি ভি ... ঘাড় ফিরিয়ে ... ীর প্রিয় হয় ত

কোনো অভিনবত্ব নেই, নী সম্বোপন ... বালকের প্রি

সেখানে যথার্থ কৌতুক। ... কিন্তু কোনো

ব্যক্তি, সে ভাগ্যবান,—এতে সন্দেহ ... কমাত্রই সংটায় ... কি? ... হচ্ছে

হাসিমুখে ওধার থেকে ঈশানী বললে, আমার মনে ...

ঘাড় ফিরিয়ে শান্তনু বললে, হ্যাঁ, এই যে। আরে, চা দিয়ে গেছে বলোনি ত'?

ভিক্টরকে ছেড়ে শান্তনু এ বেঞ্চে এসে বসলো। ধুলো আসছে প্রচুর, ঈশানী কাচের জানলা তুলে দিল। ওরা যখন চা ও খাবার নিয়ে বসলো, ভিক্টর তখন স্কুলব্যাগ থেকে খান দুই বই বা'র করে একটু পড়াশুনায় মন দিল; বাইরের দিকে অনেক আকর্ষণ, নতুন জগতের বিচিত্র জীবনযাত্রা—কিন্তু শিলভিয়ার শান্ত স্নেহময় চক্ষুর স্থির নির্দেশ ভিক্টর ভোলেনি। সুযোগ পাবামাত্র কিছুক্ষণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া না করলেই তা'র চলবেনা।

একটু তামাসা ক'রে ঈশানী শান্তনুকে খোঁচা দিল, তোকে হারালুম।

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শান্তনু বললে, ক্রমশ এমন হ'তে পারে, আমিই তোকে হারাবো!

পেয়ালাটা নামিয়ে ঈশানী চমকে তার দিকে তাকালো,—মানে?

চায়ে একবার চুমুক দিয়ে শান্তনু বললে, ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে?

ও, তোর বুঝি কিছু ভালো লাগছে না?

হাসিমুখে শান্তনু বললে, হয়ত ভালো লাগছে ব'লেই ভয় পাই!

ঈশানী ওর দিকে স্তব্ধ চক্ষে তাকিয়ে রইলো, কথা এলো না। শান্তনু বললে, সংসারে এ ভালোলাগার শেষ পরিণতি চিরদিনই অস্পষ্ট থেকে যায়, একি তুই বুঝিসনে?

ব'লে শুনতে ভালো লাগে। ঈশানীদের সঙ্গে প্রচুর ?

এও তা'র মনে ছিল, ভিক্টর এবং শান্তনুকে সে নিজের স উঠলো শান্তনু।

দেবে, কিন্তু ও-খাবারটা শিলভিয়ার, ওটা ভিন্ন জগৎ ক। ঈশানী একবার উঠে

মাতৃহৃদয়ের মধুর আস্বাদ মেলানো, ওটার স্বাদই আল য় দেখলো ওদিকে, ভিক্টর

গত সন্ধ্যায় শিলভিয়া স্টেশনে এসে ওদেরকে বিদায় দে ঈশানী এগিয়ে এসে

তা'র থে

কাছে লুকিয়ে রেখে গেছে। টের উপর সাজালো,

গিয়ে বললে, তুমি আঙুর ছু অংশ নিয়ে একটি

শিলভিয়া আমাকে জানিয়েছিল। এসো!

কলা পছন্দ করো,

ভিক্টর পাশ ফিরে তাকিয়ে একটু সলজ্জভাবে হাসলো।

মাম্মি,—এখন না, আমি নিজেই চেয়ে নেবো।

ললে, থ্যাঙ্ক ইউ,

একটুখানি ধাক্কা খেলো ঈশানী, সন্দেহ নেই। মুখ নামি

বইয়ের দিকে মন দিল। থমকে একবার দাঁড়ালো ঈশানী, তারপর ভিক্টর আবার

চা দেবো, ভিক্টর?

বললে, একটু

ভিক্টরকে আবার মুখ ফেরাতে হলো। বললে, হ্যাঁ—

খুশী হয়ে ঈশানী ফ্লাস্কসংলগ্ন গ্লাসে একটু চা এনে ভিক্টরের

তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে সে বসলো। মিনিট দুই পরে হঠ গছে দিল

লক্ষ্য করতেই দেখা গেল, ভিক্টর চায়ের পাত্রটা সরিয়ে রেখেছে, সেটা ৎ সেদিকে

শান্তনু সমস্তটা লক্ষ্য করেছে এতক্ষণ। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানটা খায়নি।

একটু বিঁধলো। সীট্ ছেড়ে উঠে সে ভিক্টরের পাশে এসে বসলো নি তাকে

তৎক্ষণাৎ বইখানা সরিয়ে রেখে খুশী হয়ে ওর সঙ্গে গল্প করতে সুর । ভি

শান্তনু প্রশ্ন করলো, তোমার চা প'ড়ে রইলো যে? য় অ করলে

ভিক্টর বললে, ওটা ঠাণ্ডা! 'লাইফ্‌লেস্!' র এক

বাঙলা ভাষায় যাকে বলে, প্রাণহীন। শান্তনু একেবারে

এলাহাবাদ স্টেশনে গাড়ী থামলো। একটু পরেই নন্দ এসে খাও চুপ।

স্টেশনের ঝাড়ুদার এসে কামরার ভিতরটা ঝেড়ে মুছে দিয়ে কি

'লে গেল। এবারেও দেখা যাচ্ছে, অপর কোনো প্যাসেঞ্জার এ-কামরায় ওঠবার চষ্টা পেলো না। গাড়ীর মধ্যে ওরা তিনজনে মিলে যেন নিজেদের একটি ক্ষুদ্র ংসার বানিয়ে তুলেছে।

শান্তনুকে নিয়ে যথারীতি ভিক্টর প্লাটফরমে নেমে গেছে। নাবালকের নরাসক্ত মনোভাবটি ঈশানী সকৌতুকে উপভোগ ক'রে চলেছে, সন্দেহ কি! শলভিয়ার সঙ্গে তাকে ভিক্টর দেখেছে কয়েকবার,—ওইটুকু যা চেনাচিনি, ওর বশী একটুও নয়। ভব্যতা রক্ষার জন্য ঈশানী বুঝি দু একবার ভিক্টরের চবুক ধ'রে নেড়েছে—এর বাইরে ঈশানীও পা বাড়ায়নি, এবং ভিক্টরের পক্ষেও চার কাছে আসার সুযোগ হয়নি!

শান্তনু প্রশ্ন তুলবে, যতই হোক, তুই ওর মা! তোর প্রতি আঘাত, অসম্মান, অবহেলা—যাই আসুক, তুই ওর মা! কিন্তু ঈশানী জানে, দৈবাৎ সে জননী হয়েছিল, কিন্তু আজও সে মা হয়ে ওঠেনি। পণ্ডিতরা চিরদিন প্রশস্তি-বাচন করে এসেছে মাতা ও পুত্রের সম্পর্ক নিয়ে। মা হোলো জগজ্জননীর অংশ,—একথা সন্তানদের কানে-কানে চিরকাল ধ্বনিত হয়ে এসেছে! জননীর কানে-কানে বলা হয়েছে, নারীর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি তা'র মাতৃত্বে! এটা সমাজ-প্রতিষ্ঠার গোড়াকার বাঁধুনি, কে না জানে! অন্যদিকে তাকিয়োনা, পুরুষের আত্মজকে পালন করো,—নারীর প্রতি এই কঠিন নির্দেশ। সন্তানদের প্রতি নির্দেশ হোলো, ঘর ভেঙ্গে পালিয়োনা, ঘরের মধ্যে জমা আছে বাৎসল্যের মধু,—এর আকর্ষণকে স্বীকার ক'রে নিলে তবেই সমাজ রক্ষা, নৈলে দুর্গতি। পুরুষের সম্পত্তিবাদের সঙ্গে বাঁধা আছে নারী ও তার সন্তান। পুরুষ-পরম্পরায় নারী ও সন্তান পুরুষের সম্পদকেই পাহারা দিতে বাধ্য হয়েছে। যেখানে এর ব্যতিক্রম, সেখানেই সমাজবিপ্লব, সমস্তটাই ছন্নছাড়া। সেই ভয়ে সর্বপ্রকার সম্পদের প্রতি সন্তানকে আকৃষ্ট ক'রে রাখার জন্য পুরুষ-প্রাধান্যময় সমাজ কল্পনা করেছে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে। ঘরে বউ নিয়ে এসে প্রবীণ অভিভাবক বলেন, লক্ষ্মী আনলুম। এঁর প্রতি সবাই আকৃষ্ট হও!

ঈশানীর জীবনের মধ্যেও এই সর্বনাশা বিপ্লবের বীজ আপন সাংঘাতিক কীজ

ক'রে চলেছে। সে গৃহচ্যুত, প্রাণের মধ্যে তার বন্ধনের শিহরণ কোথাও নেই। তা'র বাসস্থানটা গৃহ নয়, আশ্রয় মাত্র। ওটা অতিথিশালা, ফেলে যেতে হবে যে-কোনো দিন। ওটার মধ্যে প্রাণ নেই, আছে দেহ। বিলাস আছে, ঐশ্বর্য নেই। দান আছে, দয়া আছে, দাক্ষিণ্য আছে,—কিন্তু স্নেহবন্ধনের টান কোথাও নেই। ওটার মন্দিরে সন্ধ্যারতির করুণ প্রদীপের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি ওঠে না, ওটার মধ্যে বারোয়ারীতলার পূজার হুজুগ পাওয়া যায়।

এর জন্য কি ঈশানীর মনে বেদনাবোধ কিছু আছে? কই, না! ভিক্টর কি সজ্ঞান মনে তা'র জননীকে আপন আচরণের দ্বারা আঘাত করেছে? একেবারেই না! ভিক্টরের কাছে সে একজন মহিলা মাত্র,—শিলভিয়ার অনেক বন্ধুর মধ্যে সে একজন,—তা'র বেশী কিছু নয়। ঈশানীর ভিতরকার আকুল ব্যাকুল জননীর বত্রিশ নাড়ির পাকে পাকে ক্ষুধিত বাৎসল্যের কান্না নিত্য জমে' উঠছে,—একথা সত্য নয়; সর্বাশ্রয়হীনা মাধু বেঁচে থাকলে সেকথা হয়ত উঠতো; কিন্তু ভিক্টরের সর্বপ্রকার উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য লক্ষ্য ক'রে ঈশানীর অন্তরে-অন্তরে কৌতুক এবং পরিহাসবোধের অবধি নেই। এতটুকু আঘাত সে পাচ্ছে না।

এলাহাবাদ থেকে ট্রেন ছেড়ে যাবার পর শান্তনু স্নানের ঘরে ঢুকলো। ভিক্টর তা'কে ধুতি বার করে দিচ্ছে, তেল-সাবান-তোয়ালে এগিয়ে দিচ্ছে। শান্তনুর কোনো কাজ ক'রে দিতে পারলে সে খুশী,—শান্তনুর আরামের জন্য সর্বদাই সে ব্যস্ত। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঈশানী হাসি চেপে ব'সে রইলো।

এক সময় ভিক্টর এগিয়ে এলো। বললে, মাম্মি, স্নানের পর মিষ্টার চৌধুরী কিছু খাবেন ত'? আমার কাছে খাবার আছে, সে খাবার কি উনি খাবেন? আপনি যদি বলেন তাহ'লে—

ঈশানী সহাস্যে বললে, আমার অনুমতি চাচ্ছ কেন, ভিক্টর?

ভিক্টর একবার এই মহিলার মুখের দিকে তাকালো, পরে বললে, হ্যাঁ, তাই ত'! আমিই বের ক'রে নিচ্ছি!

ভিক্টর শান্তনুর জন্য খাবারের প্লেট্ সাজাতে লাগলো। কী যত্ন,—ধুলো না পড়ে, মাছি না বসে!

ঈশানী বললে, ও খাবার শিলভিয়া তোমার জন্য দিয়েছে, অন্যকে দিচ্ছ কেন, ভিক্টর?

ভিক্টর সানন্দে হেসে উঠলো। বললে, বাঃ আমি যে কাল রাত্রে ম্যাডামের পারমিশন্ চেয়ে নিয়েছিলুম!

পারমিশন্ কি শুধু মিষ্টার চৌধুরীর জন্য?—ঈশানী আবার হাসলো।

হ্যাঁ, উনি আর আমি দুজনে খাবো!

সুন্দরী রেশমী পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে শান্তনু বেরিয়ে এলো। শত শত আংটির মত চুলের রাশি তা'র কোঁকড়ানো। গাল দুখানা ও চিবুক পরিচ্ছন্ন ভাবে কামানো, কিন্তু সমগ্র দাড়ির রেখাটা চেনা যায়। মুখখানা মসৃণ, রক্তাভ—যেমন বরাবর। চোখের পাতাগুলি ঘন কালো, ভ্রমরের পাখার মতো। ছোট ছেলের মতো পাৎলা ঠোঁট দুখানা ঈষৎ রাঙ্গা। শান্তনু পান ও সিগারেট ছোঁয়না। লাবণ্য ও কাঠিন্যে স্বাস্থ্যটা সুন্দর। দীর্ঘকায় শান্তনু পাশে দাঁড়ালে ছেলেমেয়ে যেন সামান্য হয়ে যায়।

ঈশানী বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। চন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে নদীর জোয়ার-ভাঁটা মেলানো।

ভিক্টরের হাতের সাজানো আহার্য দেখে শান্তনু পুলকিত কণ্ঠে বললে, বুঝলে ভিক্টর, আমি আজ পর্যন্ত কা'রো ভালোবাসা পাইনি। এই তুমিই যা আমাকে একটু সুনজরে দেখো!

ভিক্টর প্রশ্ন করলো, তোমার মাম্মি নেই?

নেই ব'লেই ত' ভাগ্য খুলে গেল! তোমাকে পেলুম। যে যাই বলুক, তোমার আমার জগতে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ নেই। অবিশ্যি কেউ-কেউ সামনে এসে দাঁড়ায় বটে, তবে কি জানো, তা'রা সব রঙ্গীন মেঘ,—এই আছে এই নেই! তুমি আর আমি সত্য!

শান্তনু খেতে ব'সে গেল। ওই প্লেট্ থেকেই একখানা বিস্কুট তুলে শান্তনু ভিক্টরের হাতে দিতেই সানন্দে সে গ্রহণ করলো। আহার সামান্যই। শেষকালে দুজনে দুটো চকোলেট্ মুখে দিল। শান্তনু প্রশ্ন করলো, আমাকে তোমার কেন ভালো লাগে, ভিক্টর?

আড়ষ্ট লজ্জায় ছেলেটি বললে, জানিনে।

গলা নামিয়ে শান্তনু বললে, একটা কথা জানো তুমি, তোমার ওই মাম্মি তোমাকে খুব ভালোবাসেন?

মৃদুকণ্ঠে ভিক্টর বললে, সত্যি বল্‌ছ?

শান্তনু তৎক্ষণাৎ অন্য কথায় চ'লে গেল। বললে, তোমার বন্ধুদের মায়েরা কনভেণ্টে আসে না?

হ্যাঁ, আসে। রোজ্‌, ফিলিপ, হ্যারি, ইসাবেলা—ওদের মায়েরা প্রায়ই আসে! কিন্তু তোমার মা?

ভিক্টর বললে, ম্যাডামের কথা বল্‌ছ?

শান্তনু বললে, ম্যাডাম শিলভিয়া ত' সকলেরই মা,—তাই না?

ছোট্ট জবাব দিল ভিক্টর, হ্যাঁ।

তোমার নিজের মাকে দেখেনি?

নিজের মা আবার কি?—সবিস্ময়ে ভিক্টর তাকালো।

শান্তনু বললে, প্রত্যেক শিশুর নিজের মা আছে, তা জাননা?

ভিক্টর জ্ঞানলাভ করছে। একবার শান্তনুর কথায় ঘাড় নেড়ে সে সম্মতি জানালো। তারপর বললে, আর বাবা?

হ্যাঁ, তাও আছে বৈকি। শিলভিয়া কিছু বলেনি?

না।

কেন?

আমি জানতে চাইনি তাই বলেনি।

শান্তনু বললে, জানতে পারলে তুমি খুশী হবে ত'?

ভিক্টর বললে, হ্যাঁ—

তোমার মন খারাপ হবে না?

মন খারাপ!—ভিক্টর অবাক হয়ে বললে, কেন হবে?

শান্তনু খুব একচোট হেসে উঠলো। তারপর বললে, না, তাই বলছি। তোমার সঙ্গে গল্প করলেই আমার আনন্দ হয়, কেন বলো ত' ভিক্টর?

ভিক্টর খুব হাসলো। বললে, আমি যে তোমাকে খুব পছন্দ করি, তাই জন্যে!

মধ্যাহ্ন রৌদ্রের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এক সময় ট্রেন এসে পৌছলো ফতেপুরে। গাড়ী থামবার মিনিটখানেকের মধ্যে নন্দর সঙ্গে সঙ্গে রেষ্টুরেণ্ট কার-এর বয় থালা সাজিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের সামগ্রী নিয়ে এলো।

ভিক্টর অনুযোগ জানালো শান্তনুর কাছে, তুমি যে তখন বললে, আমাকে রেষ্টুরেণ্ট কার-এ নিয়ে যাবে?

ঈশানী বললে, বেশ ত', ও আর তুমি গিয়ে খেয়ে এসো, পরের স্টেশনে আবার উঠবে। আমি এখানে খাই—নন্দ, তুই আমার কাছে থাক্। তুই খাবার কিনে এখানেই খেয়ে নে। স্নান ক'রেও নিতে পারিস।

নন্দ পুলকিত কণ্ঠে রাজি হয়ে গেল।

গাড়ী থেকে সোৎসাহে নেমে এলো ভিক্টর এবং শান্তনু। হঠাৎ জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে মধুর কণ্ঠে ভিক্টর ঈশানীর দিকে চেয়ে বললে, মাম্মি, প্লীজ্—আপনি ভাববেন না, আমরা পরের স্টেশনেই আসবো!

ঈশানী জবাব দিল, ধন্যবাদ, ভিক্টর!

ওরা একটুখানি এদিক ওদিক ঘুরে রেষ্টুরেণ্ট কার-এ এসে উঠে পড়লো। এটা ভিক্টরের পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা। ভিতরে বেশী ভীড় হয়েছে। পুরুষ ও মহিলারা বসেছেন দুই সারি টেবলে। নিরিবিলি টেবল আর একটিও নেই। মাঝখানের বড় টেবলে বসেছেন একটি মহিলা তাঁর একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে। এদিকে ওদিকে জায়গা না পেয়ে অগত্যা শান্তনু আর ভিক্টর এসে তাঁদের সামনেই ব'সে গেল। মহিলা একা, সেজন্য শান্তনুর একটু আড়ষ্টতা ছিল। কিন্তু সে আড়ষ্টতা মহিলাটিই ভেঙে দিলেন। বললেন, বসুন না, আমাদের অসুবিধে কিছু হবে না।

• বাঙ্গালী মেয়ে! শান্তনু একটু অবাক হয়ে গেল। পরিচ্ছদ-পরিধানের ধরনে বাঙ্গালী ব'লে আগে মনে হয়নি। কিন্তু বাঙ্গলাদেশ ছাড়লেই বাঙ্গালিনীর আড়ষ্টতা ঘোচে, ওরা অনেকটা সুস্থ ও সহজ হয়,—ওরা কথা বলার ভাষা খুঁজে পায় লোকসমাজে।

শান্তনু ভিক্টরকে নিয়ে বসলো। বয় এসে দুটো ইংরেজি লাঞ্চ-এর অর্ডার নিয়ে গেল। মহিলা বললেন, ছেলেটি ভারি চমৎকার! কী নাম তোমার?

ভিক্টর!

মহিলা হাসলেন,—নামের সঙ্গে চেহারা মিলেছে! কি পড়ো?

ভিক্টর বললে, কন্‌ভেণ্টে স্ট্যাণ্ডার্ড থ্রি-তে পড়ি?

বাঃ! আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

শান্তনু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, দিল্লী যাবো। আপনি?

মহিলা বললেন, আমি উঠেছি এলাহাবাদ থেকে। আমিও দিল্লী যাবো। আমার স্বামী ওখানে বদলি হয়েছেন কিনা তাই মেয়েকে নিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। সকাল ন'টায় টেলিগ্রাম পেয়েই জিনিসপত্র যা হোক ক'রে গুছিয়ে গাড়ী ধরেছি। মেয়েকে খাইয়েও আনতে পারিনি!

শান্তনু তাকালো ফ্রকপরা মেয়েটির দিকে হাসিমুখে। বছর পাঁচ ছয় বয়স, ফুটফুটে চেহারা, মুখখানি ভারি মিষ্টি! শান্তনু বললে, দিল্লীতে এই বুঝি আপনার প্রথম?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই প্রথম। উনি আবার এখন দিল্লীতেও নেই, উনি গেছেন পাঠানকোটে জরুরী সরকারি কাজে। চাপরাশি আর আমাদের বাড়ীর চাকর স্টেশনে থাকবে, এই যা ভরসা।

দুজন বয় একে একে এসে চারজনের খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। স্যুপ দিয়ে আহার আরম্ভ হোলো, সঙ্গে রুটি আর মাখন।

স্যুপ শেষ ক'রে তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছে শান্তনু বললে, আপনার স্বামী কোন্ অফিসে কাজ করেন?

মহিলা হাসলেন। বললেন, উনি অনেকদিন ধ'রে গভর্নমেণ্টের নানা দপ্তরে কাজ করেছেন, ওঁর রেকর্ড বেশ ভালো। এখন উনি 'সেরিকালচার' বিভাগে আছেন।

ভিক্টর উসখুস করছিল। কোনো সময়ে শান্তনুকে একলা পাবার জো নেই। বয় একটির পর একটি প্লেট দিয়ে যেতে লাগলো।

শান্তনু প্রশ্ন করলো, বাঙ্গলা দেশে আপনারা যান্না ?

বিশেষ না—মহিলা বললেন, আমি এলাহাবাদের মেয়ে আর উনিও ইউ-পির লোক। বাঙ্গলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব কম। ছেলেমেয়েরা ছোট থেকেই হিন্দি শিখতে বাধ্য হয়। আমাদের বাড়ির অনেক ছেলে মেয়ে বাঙ্গলা লিখতে-পড়তে জানে না।—আপনারা দিল্লী যাচ্ছেন, আমাদের ওখানে একদিন আসবেন, আমার স্বামী খুব খুশী হবেন। ভিক্টরকেও নিয়ে আসবেন—মহিলা তাঁর স্বামীর নাম ঠিকানা যুক্ত একখানা কার্ড তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বা'র করে শান্তনুর হাতে দিলেন। সেখানা একবার নাড়াচাড়া ক'রে শান্তনু কেবল বললে, বেশ ত'? যাবো একদিন!

মহিলা একবারটি তাকালেন শান্তনুর দিকে, তারপর পুনরায় প্রশ্ন করলেন, এর মা কোথায় ?

এই প্রকার প্রশ্নেই শান্তনুর ভয় ছিল বেশী। প্রথমটা সে থাতয়ে একবার চুপ ক'রে গেল। কিন্তু সে একটি মুহূর্তে, তারপর সে বললে, হ্যাঁ, আছেন!

আপনাদের সঙ্গে তিনি যাচ্ছেন না ?

শান্তনু মরিয়া হয়ে ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে একবারটি হাসলো। বললে, ভিক্টর, বলো না তোমার মাম্মির কথা ?

ভিক্টর বললে, হ্যাঁ, মাম্মি ত' সঙ্গেই আছেন!

শান্তনুর কপালে দেখতে দেখতে ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। গলাটা সে পরিষ্কার ক'রে নিল। মহিলাটির কেমন যেন একটু কৌতূহল হোলো। কারণ, উভয়ের কোনো জবাবই খুব স্পষ্ট নয়। তিনি উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলেন, এটি আপনারই ছেলে ত'?

ছুরি দিয়ে কাট্‌লেটের অংশ কেটে কাঁটা দিয়ে মুখে তুলতে গিয়ে সহসা ঝড়ের মতো শান্তনু হেসে উঠলো। তারপর বললে, দেখুন, প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরের দান, এ তাঁরই! মানুষ কেবল আমার-আমার ব'লে চেঁচায়! কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় সন্তানকে কতটুকু নিজের কাছে পাই, বলতে পারেন? কেউ কি জোর ক'রে বলতে পারে, এ আমার? কখনই না! প্রত্যেক সন্তানই

তা'র মা-বাপের, কিন্তু কেউ বা সন্তান, কেহবা তা'র পিতামাতা! আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী! আমরা আমাদের জীবন-রঙ্গমঞ্চে কেবল মা-বাপ ভাই-বোন ছেলে-মেয়ে—এদের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যাই বৈ ত' নয়! ভিক্টর, তোমার খাওয়া হয়েছে? বয়, বিল্ আনো!

মহিলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে শান্তনুর মনোজ্ঞ বক্তৃতা শুনছিলেন। এবার বললেন, গাড়ী না থামলে ত' নামতে পারবেন না?

রুদ্ধশ্বাসে শান্তনু ঘর্মাক্ত হাসি হাসছিল। এবার সচেতন হয়ে বললে, ও, হ্যাঁ, —কানপুর বুঝি আসেনি এখনও?

বয় এসে ফলের রস মেলানো মিষ্টান্ন দিয়ে গেল।

আরো প্রায় আধঘণ্টা পরে কানপুর স্টেশন এসে পৌঁছলো। কোনোমতে একটা নমস্কার জানিয়ে ভিক্টরকে সঙ্গে নিয়ে শান্তনু তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

*

*　　*

রাত সাড়ে ন'টার পর লালকেল্লার পাশ কাটিয়ে গাড়ীখানা এসে পৌঁছলো দিল্লী স্টেশনে। নন্দ তাদের কামরায় সমস্ত মালপত্র গুছিয়ে রেখেছে,—সে খুব পটু এসব ব্যাপারে।

নানা হোটেল থেকে নানান রকম দালাল এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। ওরই মধ্যে একটি নামকরা হোটেলের লোককে পাওয়া গেল। সে লোকটি বেশ হোমরা চোমরা কোটপ্যান্ট্ পরা। সে এগিয়ে এসে জিনিসপত্রের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে কুলী ডাকলো। শান্তনু একটু অন্যমনস্কভাবে একবার এদিক ওদিকে তাকালো, কিন্তু রেষ্টুরেন্ট কার-এর সেই ভদ্রমহিলাকে ভীড়ের মধ্যে আর দেখা গেল না।

স্টেশনের বাইরে এসে বড় একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা পুরনো দিল্লীর দিকে চললো। রেল লাইনের পাশ দিয়ে স্লেলব্রীজের তলা পেরিয়ে কাশ্মীরী গেট্ ছাড়িয়ে ওরা চললো বেশ খানিকটা দূরে। এদিকটা নিরিবিলি,—

গাছপালা ছাওয়া বাগানবাড়ী ঘেরা সুন্দর মসৃণ পথ। কিন্তু ওরা সকলেই এখানে নতুন, সুতরাং দিনের বেলায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া দিল্লীকে ওরা বুঝতেই পারবে না।

উত্তেজনার অবসান। ভিক্টরের চোখে ঘুম এসেছিল। হোটেলে এসে দোতলায় পরস্পর-সংলিপ্ত তিনটি ঘর ওরা দখল করলো। আসবাবপত্র ও বিছানার অভাব কিছু নেই। ঘরগুলি এয়ার-কন্‌ডিশন্‌ড্‌—ভিতরে গরম এবং গুমোট নেই। বাইরের দিকে একটি দরজা, ভিতর দিকে যথেষ্ট প্রশস্ত। পাঁচ-সাতজন নরনারীসহ একটি পরিবার থাকার মতো প্রচুর জায়গা আছে। এমন সুসজ্জিত এবং আড়ম্বরপূর্ণ সুব্যবস্থা পেয়ে ওরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। ভিতরের ঘরের এক কোণে একটি ফ্রিজিডেয়ার—ঠাণ্ডা পানীয় জল অজস্র পাওয়া যাবে।

সামনের ঘরটি ড্রয়িং। মাঝখানের ঘরটিতে থাকবে শান্তনু আর ভিক্টর—ঈশানীর নির্দেশ। শেষের ঘরটি একান্তে, সেখানে ঈশানীর বিছানা। এ ছাড়া ড্রেসিং রুম এবং দুটো বাথ।

ভিক্টরের খাবার এলো সকলের আগে। মুখ হাত পা ধুয়ে সে ডাইনিং কর্ণারে খেতে ব'সে গেল। ভোজ্য উৎকৃষ্ট। শান্তনুর নির্দেশক্রমে তাদের দুজনের খাবার রেখে গেল দুজন বয় ওই একই টেবিলের একপাশে। নন্দর জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করা হোলো।

আহারাদি সেরে ভিক্টর গেল তা'র বিছানায় এবং ঈশানী ও শান্তনু একে একে স্নান ক'রে এসে বাইরের ঘরে বসলো। বয় এসে দুগেলাস ঠাণ্ডা লিমন্ স্কোয়াস দিয়ে গেল।

ওরা বসলো দুজনে মুখোমুখি। কিন্তু কে ওরা? একজনের সঙ্গে আরেক-জনের সম্পর্ক কি? হোটেলের খাতায় কী পরিচয় লিখবে কাল সকালে? দুই গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছিল সৌরলোকে আপন আপন কক্ষপথে। এখন ওরা এলো একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে,—দুই গ্রহ লক্ষ্য করছে পরস্পরকে। এটা কলকাতার সেই বাড়ীতে বসবাসের মতো নয়,—সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতা

ছিল। এখানে নির্দিষ্ট অল্প পরিসর সীমার মধ্যে একই সূত্রে তারা বাঁধা পড়েছে। এঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যাবার কোনো স্বাধীনতা নেই। একটিমাত্র দরজা, তার বাইরে অজানা অপরিচিত পৃথিবীর বৃহত্তর লোক সমাজ।

শান্তনু একবার দরজাটার দিকে তাকালো। বললে, দরজাটা রাত্রে খোলা থাকলে ক্ষতি কি?

ঈশানী বললে, অজানা জায়গা, ভয় নেই কিছু?

ভয় ঘরের মধ্যে, বাইরে ভয় কিসের? সবাই রয়েছে। আমরা কিছু হীরে মুক্তো জড়োয়া ঘরময় ছড়িয়ে রাখছিনে যে, রাত্রে ডাকাত পড়বে!

তা বটে,—কিছু টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। ঈশানী চুপ ক'রে রইলো কতক্ষণ। পরে বললে, দরজাটা ভেজিয়ে রাখাও চলে!

শান্তনু বললে, ভেজানোও যা বন্ধও তাই।

ঈশানী হাসিমুখে বললে, মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মালে বুঝতিস, ও দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত!

একথাটা আর বাড়ানো উচিত নয়, শান্তনু চুপ ক'রে গেল। একসময় ঈশানী বললে, কাল সকালে রমেনবাবুকে টেলিগ্রামটা পাঠানো চাই। দলবল নিয়ে তিনি পরশু রওনা হবেন, তাঁরা উঠবেন অন্যত্র।

শান্তনু বললে, এখানে বেশীদিন থাকতে কি ভালো লাগবে?

তোর বুঝি ভালো লাগছে না?

শান্তনু একটু থেমে বললে, ঠিক কি হ'লে ভালো লাগে, তাও ত' বলা কঠিন। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন জটিল হয়ে উঠছে দিন দিন। তুই চিরদিন নেচে বেড়াবি, ভিক্টর চিরদিন অন্ধকারে থেকে যাবে, আর আমি চিরদিন ঘরে আর ঘাটে কোথাও জায়গা পাবো না,—এ সমস্যার কোনো সমাধান আছে কি?

ঈশানী বললে, তুই কি তোর দাদার ওখানে ফিরে যেতে চাস?

সেখানে আমার জায়গা কোথায়?

তুনম্বর, আমাকে সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে কি তুই চুপ ক'রে থাকতে বলিস?

শান্তনু বললে, তাহ'লে তোর চললে কেমন ক'রে?

ঈশানী বললে, তিন নম্বর, ভিক্টর যদি কনভেন্টের সমস্ত পড়াশুনো ছেড়ে আমার আঁচল ধ'রে মা ব'লে আমার ঘরে ঢোকে—কেমন লাগে তোর?

সে হয় না।—শান্তনু জবাব দিল।

তাহ'লে এ সমস্যার প্রতিকারও সহজ নয়।

শান্তনু চুপ করে রইলো। সকলের সমগ্র ভবিষ্যৎটাই যেন মস্ত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

ঈশানী বললে, চোখে ঘুম এলে তুই বড্ড আবোল-তাবোল কথা বলিস। যাক্, অনেক রাত হয়েছে, কিছু মুখে দিয়ে এবার শুয়ে পড়গে যা। চল্, ওঠ্—

শান্তনুর সঙ্গে ঈশানীও উঠে দাঁড়ালো। সামনের দরজাটা ভেজিয়ে ওরা ভিতর মহলের দিকে অগ্রসর হোলো।

৯

রমেনবাবু তাঁর দলবল নিয়ে দিল্লী এসে পৌঁছেছেন আজ তিন চার দিন হোলো। রীগল সিনেমা হলটা নতুন দিল্লীর ঠিক মাঝখানে এবং ওখান থেকে সমগ্র শহরের বিভিন্ন সমাজে 'শো' দেবার সংবাদটি প্রচারিত হয়ে গেছে। তারই তোড়জোড় নিয়ে রমেনবাবু প্রায় দিবারাত্র ব্যস্ত। কথা আছে ঈশানীকে কোনো হৈ চৈ এবং কাজকর্মে ব্যস্ত করা চলবে না। যথাসময়ে ঈশানী আত্মপ্রকাশ করবে।

ঈশানী নিজেদের খরচে ছিল চার-পাঁচ দিন ধ'রে একটি হোটেলে, অতঃপর তারা এখন সেই 'শো'র কর্তাদের অতিথি। আরাবল্লীর শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে যে পথটা চ'লে গেছে পুশার দিকে, সেদিকের রাজপথে মস্ত এক বাগান-বাড়ী তার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেখানে বসবাসের উপযুক্ত সর্বপ্রকার উপকরণ প্রস্তুত, এমন কি এক পাচক, চাকর এবং পরিচারিকা পর্যন্ত। ঈশানীর ব্যবহারের জন্য একখানি মোটর মোতায়েন আছে অহোরাত্র। বুদ্ধিমান ও বিষয়ী রমেনবাবু কর্তাদের খরচে ঈশানীর সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আগেভাগেই ক'রে রেখেছেন এমন লোককে স্বার্থসচেতন ব'লে সন্দেহ করার জন্য শান্তনু বারম্বার ঈশানীকে অভিশাপ দিল।

শান্তনু আর ভিক্টরের সঙ্গে পাঁচ দিন ধ'রে ঈশানী সমগ্র দিল্লী ও শহরতলী ঘুরে বেড়ালো। রোদ ক্রমশ অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে, সেজন্য বড়জোর সকালের দিকে দশটা এগারোটা পর্যন্ত পরিভ্রমণ চলে—তারপর ভিক্টরকে আর বাইরে রাখা চলে না। শিলভিয়ার কাছ থেকে এই এক সপ্তাহের মধ্যে দুখানা টেলিগ্রাম ও তিনখানা লম্বাচিঠি এসে হাজির হয়েছে। ভিক্টর তার কাছে চিঠি দিয়েছে দুখানা। ঈশানীও পাঠিয়েছে টেলিগ্রাম ও চিঠি। শিলভিয়া বড়ই

ব্যস্ত, ভিক্টরকে বেশী দিন রাখা চলবে না। সে রকম আবশ্যিক প্রয়োজন হ'লে নন্দ আছে, ওর সঙ্গে ভিক্টরকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

ঘুরে বেড়ালো তারা অনেক, টাকাকড়িও খরচ হোলো অজস্র। পৌরাণিক যুগে উর্বশীর নাচের ঠমকে নাকি কাননে-কান্তারে ফুল ফুঠে উঠতো, একালে ঈশানীর নাচের ঠমকে টাকা-পয়সা গজিয়ে ওঠে সাত হাত মাটির তলা থেকে। লাবণ্য আর আনন্দের প্রলোভনে লোকে অর্থ ব্যয় করে সবচেয়ে বেশী। হোটেলে যা খেয়ে এলো তার খরচ এমন কিছু নয়, কিন্তু আনন্দ-বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের দাম দিতে হোলো অনেক টাকা। হোটেলের বিল দেখে শান্তনু শিউরে উঠেছিল।

রীগল রঙ্গমঞ্চে অবতরণের দিন প্রায় ঘনিয়ে এলো। প্রাচীরে প্রাচীরে বিজ্ঞাপন পড়ে গেছে। সংবাদপত্রাদির দপ্তরে টেলিফোন আসছে। খবরা-খবর নিচ্ছে দিল্লীর বৃহৎ জনসমাজ। ছোটোখাটো একটা আপিস ব'সে গেছে কনটপ্লেসে। কাগজে কাগজে নৃত্যরতা ঈশানীর ঝাপসা ছবি বেরিয়েছে একটির পর একটি। নানাবিধ গল্প বেরিয়েছে ঈশানীর। সে নাকি বাঙ্গলার কোন রাজবাড়ীর মেয়ে,—সেখানকার হাতীশালা আর ঘোড়াশালা! সুন্দরবনের বাঘ এবং গরুতে নাকি তাদের রাজত্বে একঘাটে জল খেতো। ঈশানীর জীবন নাকি বিচিত্র নাটকীয় সংঘাতে পরিপূর্ণ। ইংরাজমিশনারীদের সঙ্গে ঈশানী নাকি খৃষ্টধর্ম প্রচারে অনেককাল কাটিয়েছে। আপন দান-খয়রাতের জন্য বাঙ্গলায় সে নাকি এক মহীয়সী রমণী! ঈশানী অবিবাহিত, এবং ব্রহ্মচর্য ব্রতচারিণী।

সমগ্র দিল্লীতে উন্মাদনা দেখা দিল এবং তার ফলে হোলো এই, ঈশানীর পক্ষে পথেঘাটে বা'র হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো।

শান্তনু বললে, এসব আজগুবী গল্প তোর সম্বন্ধে কেমন ক'রে লোকে জানলো?

ঈশানী বললে, রমেনবাবুর অনুগ্রহে।

সামান্য সত্যির সঙ্গে পর্বতপ্রমাণ মিথ্যে জড়ানো হয়েছে, এও কি রমেনবাবুর জন্যে?

নিশ্চয়ই। মনোহর মিথ্যাকে সামান্য সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার কৌশলই হোলো প্রচারকার্য!

শান্তনু বললে; নির্ভুল সত্য আর সততা নিয়ে প্রচার কার্য চলে না?

ঈশানী হাসিমুখে বললে, চলে বৈ কি! কিন্তু তার খদ্দের কম। যে ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস লেখে, সে যত পণ্ডিতই হোক—কল্কে পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি মানুষকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে—সে ওই রঙীন কল্পনার ইন্দ্রজাল বোনে ব'লেই সমাদর পায়। এর ফলে ঔপন্যাসিকের প্রতি ঐতিহাসিকের চিরদিনের বিদ্বেষ হিংস্র চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শান্তনু বললে, এই অদ্ভুত প্রচারকার্যের ওপরেই কি তোর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত?

অনেকটা—ঈশানী আবার হাসলো,—আমাকে ঘিরে অনেকের উদ্দাম রঙীন রসকল্পনা গ'ড়ে ওঠে। যা পাবার নয়, অথচ যা পাবার জন্য মানুষের ক্ষুধিত মন আজন্ম হাহাকার করে, সেই বস্তু আমার নাচের মধ্যে ওরা খুঁজে পায়। ওদের ওই ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয় সুদক্ষ প্রচারকার্য, তাই টাকা এনে ওরা পায়ের কাছে ঢেলে দিয়ে যায়। এই আনন্দবিলোবার ব্যবসায়ে আমি হলুম রমেনবাবুর প্রধান পুঁজি।

শান্তনু বললে, কিন্তু এর মধ্যে তোর একটা মস্ত অসম্ভ্রম জড়িয়ে রয়েছে, এ কি ভেবে দেখেছিস?

ঈশানী চুপ ক'রে কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইলো। পরে বললে, এই সর্বনাশা আত্মবিক্রয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই মিহিজামে তোর সাহায্য চেয়েছিলুম, মনে পড়ে তোর?

সেদিন তোর সত্য পরিচয় এমন ক'রে জানতে পারিনি। আজ জানলুম বটে, কিন্তু এর থেকে তোর মুক্তি পাবার ত' কোনো উপায় নেই।

কেন?

শান্তনু বললে, টাকার অঙ্ক চারদিক থেকে বেড়াজালে তোকে বেঁধেছে, চেয়ে দেখছিস? ভালোবাসার জন্য মানুষ এককালে সমস্ত ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিতে পারতো; কিন্তু একালে টাকা খরচ করলে ভালোবাসাও কিনতে পাওয়া যায়।

টাকার থেকে ক্ষমতার সৃষ্টি, ক্ষমতার থেকে প্রভুত্ব,—তুই ত' আজ অনায়াসে দিল্লীর ওপর প্রভুত্ব করতে পারিস, কে তোকে বাধা দিচ্ছে? সম্পদের প্রাচুর্য তোর মনকে সম্পূর্ণ নীতিভ্রষ্ট করছে, মুক্তির পথ খোঁজাটাও তোর মনের একটা বিলাস! তুই পালাতে গেলে হাজার লোক তোর পিছু ছুটবে, তুই হারিয়ে গেলে লক্ষ লোক তোকে খুঁজে আনবে। তুই যদি সন্ন্যাসও নিস, তবে ওই লক্ষ লোকই চাঁদা তুলে তোর জন্যে মায়াকাননের রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দেবে। যদি তুই বনের ফল খেয়ে দিন কাটাতে চাস, তারা বানিয়ে দেবে তোর জন্যে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, তেষ্টা পেলে এনে দেবে ভোগবতী নদীর রসধারা। মুক্তি তোর কোথাও নেই, ঈশানী।

নীচের দিকে একটা চাপা কলরব অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল। শান্তনু এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। ফটক পেরিয়ে বাগানে এসে ঢুকেছে ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক, অনেকের সঙ্গে আবার সাইকেল। জনসাধারণ গন্ধ পেয়েছে, এখানে এসে উঠেছে নাকি দেশের শ্রেষ্ঠ নর্তকী। শুধু নর্তকী নয়, রাজকন্যা। শুধু রাজকন্যা নয়,—রূপে ও দেহলাবণ্যে তিনি নাকি অমরাবতীর ইন্দ্রসভার অপ্সরী।

সবাই চীৎকার ক'রে তাদের প্রাণের প্রার্থনা জানালো শান্তনুর সুবিবেচনার দরবারে। হৈ চৈ উঠলো বাগানে।

আগামী কাল 'রঙ্গলে' নর্তকীশ্রেষ্ঠার প্রথম অবতরণ! আজ তাকে মানবীর আকারে দর্শন না করলে কিছুতেই চলবে না।

শান্তনু ঘরের মধ্যে স'রে এলো। ঈশানীর মুখখানা বিবর্ণ। শান্তনু বললে, যা একবার, সামনে গিয়ে দাঁড়া?

কেন?

ওরা দেখতে চায়।

কী দেখতে চায়? আমাকে?

শান্তনু বললে, না, নর্তকীর দেহকে। যার জন্যে ওরা অকাতরে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত।

ঈশানী বললে, এমন দেহ কি দিল্লীর পথেঘাটে নেই?

আছে।—শান্তনু বললে, কিন্তু সে সব দেহে খ্যাতির সঙ্গে রং নেই, রংয়ের সঙ্গে রসকল্পনা নেই।

আমি যাবো না।—ঈশানী ব'লে বসলো।

শান্তনু হাসলো। বললে, যাদের টাকায় তোর এত ঐশ্বর্য-বিলাস, তাদের ঋণ শোধ করবিনে কেন? যা, গিয়ে হাত জোড় ক'রে সামনে দাঁড়া।

ঈশানী বললে, কী চোখে ওরা আমাকে দেখবে, তা কি তোর জানা নেই?

জানি, সেই চোখের নগদ মূল্য কম নয়। ওরা কাল 'রীগলে' টিকিট কিনবে। তুই টাকা পাবি অনেক।

ঈশানী তবুও গেল না। বললে, অসম্ভ্রমের দিকে আমি এগিয়ে গেলে কি তোর মনে দাগ কাটে না?

শান্তনু বললে, কিন্তু তুই দিল্লী এসেছিস এই অসম্ভ্রমের বদলে মোটা টাকা নিয়ে যেতে, এ কি তোর মনে নেই?

ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো, তারপর তার সেই রূপলাবণ্যের রাশি নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাত জোড় করলো।

তরঙ্গ গর্জন শোনা গেল ভারত সমুদ্রে।

বৈশাখের সেই খররৌদ্রে সেই বাগানে জনতার ভিড় দেখতে দেখতে বেড়ে উঠলো। এদিকটা গাছ-পালা কম, নতুন নগর গ'ড়ে উঠছে এদিকে ওদিকে, তবু সেই ছায়াহীন রৌদ্রে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দীপনা কোনোমতেই শান্ত হোলো না। বাগানে নতুন ফুলগাছ সাজানো ছিল, একদল লোক সেই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে উপর দিকে ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিল। দেখতে দেখতেই ফুলগাছগুলি নিঃস্ব। কাঠের পুতুলের মতো ঈশানী দাঁড়িয়ে রইলো।

এক সময় নমস্কার জানিয়ে সে ভিতরে চলে এলো এবং সেই মুহূর্তেই আবার উদ্দাম জনতা তাদের প্রাণপুত্তলীর উদ্দেশে আবার রোল তুলে দিল।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে এইটিই কাম্য। এবার জনসাধারণ নিজের হাতেই প্রচারকার্যের ভার তুলে নিয়েছে, এবার এটি ক্রমশই ব্যাপ্তি ও বিশালতা লাভ করবে। খরচ কমবে নিজের থেকেই। সংবাদপত্রগুলি এবার বিনামূল্যে

ছবি ও রাইট্-আপ ছাপবে। বৃহৎ যন্ত্রটা চালু হয়েছে এবার। রীগল্ বিল্ডিং সাজানো হয়েছে। অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা রমেনবাবুর নিজের পকেটে উঠবে বৈ কি।

টেলিফোনে রমেনবাবুর একান্ত অনুরোধক্রমে ঈশানীকে থাকতে হোলো এ বাড়ীতে বন্দিনীর মতো। প্রকাণ্ড হলের চারদিক বন্ধ ক'রে তাকে নিজে নিজেই নাচের মহড়া দিতে হোলো। অপরাহ্নের দিকে ভিক্টরকে নিয়ে গাড়ী চ'ড়ে শান্তনু বেরিয়ে পড়লো। প্রাচীন দিল্লীর সর্বপ্রকার স্থাপত্য গত কয়েকদিন তারা সবাই ঘুরে ঘুরে দেখেছে। ফোর্ট, জুমা মসজিদ, নাজামুদ্দিন আওলিয়া, ফিরোজ শা কোট্‌লা, হুমায়ুন সমাধি, সফদারজঙ—কোনটা বাকি নেই। ওখ্‌লা গিয়েছে, রাজঘাটে এসেছে, ইন্দ্রপ্রস্থ ঘুরেছে। বাকি ছিল কুতব মিনার, এটা আর ঈশানীর কপালে নেই।

শান্তনু চললো কুতুবের দিকে। নন্দ ছিল গাড়ীতে।

রৌদ্রের প্রখরতা কমেছে। প্রাচীন দিল্লীর অন্তহীন ভগ্নাবশেষ দুই পাশের প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত। মাঝখান দিয়ে চলেছে নানাপথ নানাদিকে। ওরা বিজয়নগরের পাশ কাটিয়ে চললো। মাত্র আট নয় মাইল। আধঘণ্টার মধ্যে ওরা এসে পৌঁছলো কুতবের সীমানার মধ্যে।

সমস্ত পথটা ভিক্টর এলো গল্প শুনতে শুনতে। ছবিতে সে এই কুতব মিনার দেখেছে অনেকবার—তার ইতিহাসের বইয়ের মধ্যে। গাড়ী থেকে নেমে এবার সে নিজেই এগিয়ে চললো। অদূরে গগনস্পর্শী মিনার উঠেছে, নীচের দিকটা তার স্ফীত, উপর দিকে শীর্ণ। পাথরের গায়ে গায়ে বিচিত্র ভাস্কর্য দেখে ভিক্টর একেবারে চমৎকৃত। শান্তনুর পক্ষেও এই প্রথম। আশেপাশে বন-বাগানের গায়ে-গায়ে পাঠান, মোগল ও ভারতীয় স্থাপত্য প্রত্যেক যুগে আদের চিহ্ন রেখে গেছে। দু'জনে বেড়িয়ে বেড়ালো অনেকক্ষণ।

নিরিবিলি এক বেঞ্চে ব'সে শান্তনু অনেক গল্পই ভিক্টরকে শোনালো। সামনে ঐতিহাসিক স্তম্ভকে রেখে গল্প ব'লে যাওয়া—বোধ হয় এই শিক্ষাই ভালো। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে এক সময় ওরা তিনজন মিনারের ঠিক নীচে এসে

দাঁড়ালো। ভিক্টর ধ'রে বসলো, সে ভিতরের সিঁড়ি বেয়ে চূড়ার উপরে উঠবে। নন্দ এ প্রস্তাবে খুশী হয়ে বললে, ভয় নেই ছোটবাবু, আমি ক্ষুদে সাহেবের সঙ্গে [illegible]।

[illegible]নু বললে, সাবধান কিন্তু, আস্তে আস্তে উঠবি। আমি এই চায়ের দোকানে অপেক্ষা করবো।

নন্দ আর ভিক্টর সিঁড়ির পথ ধরলো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে দোকানের কাছাকাছি এসে শান্তনু থমকে একবার দাঁড়ালো। দোকানের চেয়ারে ব'সে রয়েছেন কোট-প্যান্টপরা একটি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক, আর তাঁর পাশেই ব'সে রয়েছেন যে মহিলাটি এবং ছোট বালিকাটি—তাঁদের সঙ্গে দিল্লী আসার ট্রেনে শান্তনুর ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়।

শান্তনুকে দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, বেশ, আবার দেখা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি আপনাদের, কিন্তু ডাকিনি। ইনি আমার স্বামী।

ভদ্রলোক বললেন, আসুন ?

শান্তনু উঠে গিয়ে বসলো এক পাশে। বললে, আমিও ভাবিনি আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে।

স্বামী বললেন, এমনি বেড়াতে এসেছেন বুঝি দিল্লীতে !

আজ্ঞে হ্যাঁ—

তবে কি জানেন, এ সময়টা ঠিক দিল্লীর সীজন্ নয়। অক্টোবর থেকে মার্চ এবং এপ্রিলের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত দিল্লীর তুলনা নেই ! কদ্দিন আছেন ?

শান্তনু বললে, সপ্তাহখানেক হলো এসেছি, আরও ধরুন সপ্তাহখানেক।

উঠেছেন কোথায় ?

হোটেলে উঠেছিলুম, এখন আছি রাজেন্দ্রনগরের কাছাকাছি।

কা'রো অতিথি নাকি ?

শান্তনু হাসলো,—তা কতকটা বৈ কি।

মহিলা বললেন, ছেলেকে আনলেন, কিন্তু কই, আপনার স্ত্রীকে আনলেন না ?

শান্তনু গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিল। তারপর বললে, রেলগাড়ীর কামরায় আপনি সেদিন ঠিক বুঝতে পারেননি। আমি আজও বিবাহ করিনি।

মহিলা ঈষৎ বিস্মিত হলেন। বললেন, ও—তা হবে। ক্ষমা করবেন হয়ত আমি বুঝতে পারিনি। ছেলেটি কিন্তু চমৎকার। কে হয় আপনার ?

শান্তনু বললে, ঠিক কেউ নয়, তবে ওদের বাড়ীতে থাকি কিনা আমরা,- তাই আমাদের সঙ্গে খুবই আত্মীয়তা।

স্বামী বললেন, সে ত' খুবই ভালো, পর আপন হ'লে একান্তই আপন হয়ে ওঠে। সঙ্গে ক্যামেরা দেখছি আপনার, ছবি তোলার সখ আছে বুঝি ?

শান্তনু হাসলো। বললে, ক্যামেরাটা কাঁধেই প্রায় ঝোলানো থাকে, ছবি তোলার কথা মনে থাকে না।

এক সঙ্গে চা খাবার পর শান্তনু বললে, যদি আপত্তি না থাকে আসুন না, আপনাদের ছবি তুলে দিই !

তুলবেন ?—স্বামী বললেন, তা মন্দ কি, চলুন ?

ছবি তোলার সখ মেয়েদেরই বেশী, কারণ তারা নিজেদের ছবি দেখে নিজেদের চেনবার চেষ্টা করে। মহিলাটি আগে ভাগে এসে দাঁড়ালেন মেয়েটিকে নিয়ে। বাগানের প্রায় মাঝখানে এসে শান্তনু ওদেরকে গায়ে-গায়ে দাঁড় করিয়ে ফোকাস্ করলো। অবেলার পশ্চিমের আলোটা ভালোই ছিল এবং শান্তনুর সুদক্ষ হাতের গুণে খুব সম্ভব ছবিখানা বেশ প্রাণবন্ত হোলো।

মহিলা বললেন, ছবি কিন্তু আমাদের ঠিকানায় ঠিক পাঠিয়ে দেওয়া চাই, বুঝলেন ? সেদিন আপনার কাছে ঠিকানা দিয়েছি, হারায়নি ত ?

স্বামী বললেন, পাঠাবার আর দরকার কি ? তুমি ওকে চায়ের নেমন্তন্ন করো, ছবি নিয়ে উনি কালই আসুন। আপনার নাম কি, জানতে পারি ?

• শান্তনু চৌধুরী।

চৌধুরী ? বাঃ, মিলেছে বেশ ! আমিও দত্তচৌধুরী ! আমাদের বাংলোর পথ খুব সোজা। একখানা মোটর-টাঙ্গা নিয়ে বিকেলের দিকে আমার ওখানে চ'লে আসবেন।

মহিলা বললেন, দাঁড়াও, কাল কি ক'রে হবে? আমরা যে এত টাকা দিয়ে 'রীগ্যলের' টিকিট করেছি। কাল যে নাচ দেখতে যাবো সন্ধ্যেবেলা। আপনি পরশু দিন এলে খুব খুশী হই।

শান্তনু বললে, বেশ ত', তাই যাবো!

এমন সময় একটি তরুণ যুবক এসে সামনে দাঁড়ালো। বললে, তোমরা এখানে বেশ মজায় চা খাচ্ছ, আমরা ওদিকে কী মুস্কিলে পড়েছিলুম। গাড়ীর একস্ট্রা চাকা নেই, সুতরাং চাকা তুলে টায়ার-টিউব খুলে তবে 'পাঙ্কচার' সারাতে পারা গেল! একেবারে ঘাম বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আর দেরি নয় মেজবৌদি, বেলা প'ড়ে এলো, মিনারে যদি উঠতে হয় তবে এই বেলা—

চলো যাই।—মহিলা অগ্রসর হলেন। একবার মুখ ফিরিয়ে শান্তনুকে ব'লে গেলেন, পরশু দিন ঠিক আসবেন কিন্তু?

শান্তনু হাসিমুখে সম্মতি জানালো। পিছন থেকে দত্তচৌধুরী বললেন, আমরা এখানেই রইলুম, তাড়াতাড়ি ক'রো।

ভিক্টরের ফিরতে এখনও অনেক দেরি। অতটা উঠবে, তারপর চূড়ায় খানিকটা বসবে, চারদিকের শোভা-বৈচিত্র্য দেখবে, এবং হয়ত বা নন্দকে খানিকটা ইতিহাসও শেখাবে,—তারপর নেমে আসবে অতগুলো সিঁড়ি। সুতরাং দেরি হবে বৈ কি।

চা-ওয়ালা এতক্ষণ গরম চা এক পেয়ালা সামনে এনে রাখলো। সেদিকে একবার তাকিয়ে দত্তচৌধুরী হাসিমুখে বললেন, কিছু জিজ্ঞেস করাটা হয়ত বেয়াদপি হবে, কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে, আপনি কি কোনো বিজ্‌নেস করেন?

শান্তনু জবাব দিল, আজ্ঞে না, আমি একেবারে নির্জলা বেকার। সঠিক কাজকর্ম কিছু নেই, তাই নানা কাজে ঘুরি। গরীব গেরস্থর ছেলে!

তবে কি দিল্লীতে কোনো কাজের তদ্বিরে এসেছেন?

শান্তনু হাসিমুখে বললে, বিনা কাজে দিল্লীতে এলে লোকে বলে নির্বোধ, কাজ নিয়ে এলে লোকে বলে, লোকটা বড় ধূর্ত! আমি আছি দুইয়ের মাঝখানে অকাজের কাজে এসেছি, এই বললেই ঠিক হয়।

দত্তচৌধুরী খুব হাসলেন। শান্তনু চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিল। কিন্তু ভদ্রলোক আর ওদিকে ঘেঁষলেন না। কেবল এক সময় বললেন, কলকাতাতেই থাকেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনার স্ত্রীর কাছে শুনেছি বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে আপনাদের ত' একেবারেই কোনো সম্পর্ক নেই !

দত্তচৌধুরী বললেন, হ্যাঁ তা এক রকম বৈ কি। তবে আমাকে একবার গিয়ে কিছুদিন বাঙ্গলায় থাকতে হয়েছিল !

তাই নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তখন লড়াই চলছে,—আমি এক গ্রামের ধারে মিলিটারী ক্যাম্পে থাকতুম। গ্রামটার নাম বোধ হয় ফুলকাঠি।

শান্তনু সরলভাবে বললে, সৈন্যবিভাগে ছিলেন বুঝি ?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, আমি ছিলুম লেফ্‌টেনাণ্ট্‌—সেই সূত্রেই ওই প্রথম বাঙ্গলা দেশে যাওয়া ! কিন্তু তারপরে আজাদ হিন্দের মুভ্‌মেণ্ট আর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। আমাদের ক্যাম্প নিয়ে খুব মুস্কিলে পড়ি।

মুস্কিল কেন ?

চারিদিকের অরাজকতা, কোথাও খাবার জিনিস পাইনে। সেই অবস্থায় একদিন তারপর সিভিল পোষাক চড়িয়ে আমি যাই ওই ফুলকাঠি গ্রামে মালপত্র কিনতে। সেই সময় সেখানে এক গেরস্থ বাড়ীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

শান্তনু বললে, মিলিটারির লোককে তখন বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ করতে দিত ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, সে এক ছেলেমানুষী ! লুকিয়ে লুকিয়ে যেতুম তাদের বাড়ীতে। এককালে তারা নাকি জমিদার ছিল, রাজা উপাধি ! তখন ছিলেন এক বৃদ্ধা পিসিমা, আর তাঁর ভাই। একটি সুশ্রী মেয়ে ছিল ভদ্রলোকের।

চায়ে চুমুক দিয়ে শান্তনু উৎকীর্ণ হয়ে উঠলো। বললে, বাঃ লড়াইয়ের কালে আপনার ত' বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছিল ?

হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। অভিজ্ঞতাই বটে। অমন সুন্দরী মেয়ে সেদিন পর্যন্ত আমি চোখে দেখিনি। ভারি ভালো লেগেছিল।

তারপর ?—শান্তনুর গলার ভিতরটা রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠলো।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, পাঁচ-সাতবার গিয়েছিলুম বটে, তারপর অসুখে পড়ি, তখন আমাকে বদলী ক'রে পাঠায় বোম্বাইতে। বছর খানেক পরে মিলিটারী থেকে ডিস্‌ব্যাণ্ডেড হলুম। তখন আবার একবার গেলুম বাঙ্গলা দেশের সেই গ্রামে। গিয়ে শুনলুম, দাঙ্গায় সেই বাড়ীর সবাইকে নাকি কেটে ফেলেছে। ভারি দুঃখ নিয়ে সেবার ফিরে এসেছিলুম।

পায়ের নীচে এবং চোখের সামনে ওই গগনস্পর্শী কুতব মিনারটা যেন একটা নাড়া খেয়ে গেল। শান্তনু ঘাড় ফিরিয়ে কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, দ্বিতীয়বার আপনি সেখানে গেলেন কেন ?

কেন গেলুম ?—ভদ্রলোক একটু হেসে উঠলেন। বললেন, দশ বছরের কথা হ'তে চললো, সবটা মনেও পড়ে না। তখন অল্প বয়স ছিল যে। স্নেহমমতার একটা বাঁধন ভালো লাগতো!

বাঁধন কা'র সঙ্গে ? সেই পিসিমা আর তাঁর ভাই বুঝি আপনাকে ভালোবাসতেন ?—শান্তনু তার কণ্ঠস্বরকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ক'রে তুললো।

এই সরল-স্বভাব যুবকটির প্রতি দত্তচৌধুরী একবার তাকালেন। তারপর বললেন, আপনি মশাই বে'থা করবেন না কোনোদিন! মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান-গম্যি কিছু হয়নি। আমি সেই বুড়োবুড়ির কথা কি বলছি ? বলছি সেই মেয়েটির কথা!

শান্তনু প্রশ্ন করলো, সেই কুমারী মেয়েটি ?

হ্যাঁ, ঠিক পরের বছরেই তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিল! কি যেন বেশ নামটি! হয় মিনতি, নয় ত মালতী!

হেসে উঠলো শান্তনু। বললে, আশ্চর্য, যার সঙ্গে অত ভাব হোলো তার নামটাও মনে নেই ? মাধবী নাকি ?

তাই ত বটে, ঠিক বলেছেন আপনি !—দত্তচৌধুরী সোৎসাহে বললেন, কিন্তু আপনি জানলেন কেমন ক'রে ?

খুব সোজা কথা ! যে শ্রেণীর লোকেরা মালতী-মিনতি নাম ছাড়া কিছু খুঁজে পায় না, তারাই মাধবী নাম পছন্দ করে !

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাকে 'মাধু' ব'লে ডাকতো। কেউ বলে তাকে কেটে ফেলেছে, কেউ বা বলে তাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। বেচারি !

দু'জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠেছিল। শান্তনু বললে, আপনি কি মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলেন ?

দত্তচৌধুরী হাসলেন। বললেন, এখন আমি স্ত্রী নিয়ে ঘর করি, একটি মেয়ের বাবা আমি, সুতরাং ওসব কথা আর ওঠে না। তবে মাধুর সঙ্গে আলাপের কালে কাঁচা বয়সের একটা তাড়না ছিল বৈ কি। হয়ত তাকে বিয়েও করতুম একদিন।

শান্তনুর মাথায় ভূত চাপলো। বললে, আপনি সত্যিই বলেছেন মিষ্টার দত্ত-চৌধুরী, আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, মেয়েঘটিত ব্যাপারটা আমার মাথাতেও ঢোকে না। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন ?

কি বলুন ?

এখন যদি সেই মেয়েটি বেঁচে থাকতো, আর আপনার সঙ্গে দেখা হোতো,—আপনি কি করতেন ?

ভদ্রলোক শান্তনুর দিকে একবার সন্দিগ্ধচক্ষে তাকালেন। তারপর মাথা নীচু ক'রে বললেন, কি আর করতুম, চিনতে পারতুম না !

মানে ? প্রথম যৌবনে যে-মেয়ের সঙ্গে অতখানি অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, মাত্র দশ বছর পরে তাকে চিনতেও পারতেন না ?

শান্তনুর কণ্ঠে যেন মৃদু তিরস্কারের আভাস পাওয়া গেল। ভদ্রলোক একবার তাকে নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, আপনি যেন রেগে উঠছেন মনে হচ্ছে ? আপনি কি চান আমার ঘর ভেঙ্গে যাক্ ?

শান্তনু এবার হাসলো। বললে, ক্ষমা করবেন, আমি বড় অসামাজিক হয়ে যাই। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করলে হয়ত আমার এই বইপড়া নীতিজ্ঞান ঘুচে যেতো! যাক আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি আনন্দ পেলুম। আর কিছু না হোক, আপনার একটা প্রণয়কাহিনী শোনা গেল। আপনি ত' নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান, দিল্লীতে কতদিন থাকবেন?

দত্তচৌধুরী বললেন, তা এখন থাকবো বছর দুই।

নন্দ আর ভিক্টর এসে পৌঁছলো। চায়ের দাম দিয়ে শান্তনু নীচে নেমে এলো। ভিক্টরকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, বাঃ ছেলেটি চমৎকার ত'? আপনার আত্মীয়ের ছেলে বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ!

ভদ্রলোকের স্ত্রীও দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলেন। পিছনে তাঁর দেবর—উভয়েই ক্লান্ত। মহিলাটি এগিয়ে এসে হেসে স্বামীকে বললেন, তোমাকে সেদিন বললুম, ট্রেনে একটি ছেলেকে দেখে এলুম, তার চেহারার সঙ্গে তোমার আদল আসে। এই ছাখো, ঠিক তাই মনে হয় না?

ভদ্রলোক বললেন, আমার চেয়ে তোমরাই ভালো বলবে!

দেবর ও শান্তনু একই সঙ্গে ব'লে উঠলো, সত্যি অদ্ভুত একটা মিল আছে! বাপ আর ছেলের যেমন মিল—ঠিক তেমনি। আশ্চর্য!

দত্তচৌধুরী একেবারে থতমত। শান্তনু সমস্তটাই যেন মনে-মনে লেহন ক'রে নিচ্ছিল, কিন্তু বিন্দুমাত্র সংযম হারালে তার চলবে না। অলক্ষ্যে সে কেবল এক-একবার নিঃশব্দে ভদ্রলোককে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করছিল। কিন্তু দত্তচৌধুরী মহাশয় একটু অন্যমনস্কভাবে কেবল একসময় উঠে কয়েকটি চকোলেট কিনে ভিক্টরের হাতে দিলেন, এবং চিবুকটি নেড়ে সমাদর করলেন। তারপর বললেন, চলো, এবার যাওয়া যাক্।

বিদায় নেবার সময় মহিলা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন, ছবি নিয়ে আসবেন কিন্তু পরশু দিনে?

শান্তনু হাত তুলে নমস্কার সহ সম্মতি জানালো।

পায়ের নীচে মাটির তলাটা, সামনে ওই মিনারের উদ্ধত চূড়া, তারও ওপরে সমগ্র বিশ্বভুবন তখনও থরথর ক'রে কাঁপছে। কেন কাঁপছে, সঠিক অন্তভূতি নেই। শান্তনু একবার থমকে দাঁড়ালো। বোধ করি তার কঠিন হৃদয়ের অন্তস্তলে কোথায় একটি আসন্ন বিচ্ছেদের অতি সূক্ষ্ম সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এবার ছেড়ে দিতে হবে! কিন্তু এই দুঃসহ মিলন ঈশানী স্বীকার করবে কি? এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের আলোড়ন যদি কয়েকটি জীবনে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ নিয়ে আসে? কিন্তু সেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় আর কিছু না হোক, ওই মহিলাটির সুখের ঘরকন্না চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তার চেয়ে এই ভালো, যেমন চলছে চলুক। শান্তনু যদি সমস্ত ব্যাপারটা নিঃশব্দে চেপে যায়, কোনো সমস্যা ওঠে না। ঈশানী ভুলে গেছে তার দশ বছর আগেকার দৈবাৎ ঘটনা, দত্তচৌধুরী তার সমস্ত অতীত মুছে ফেলে দিয়েছেন। লোকটা ধূর্ত নয়, বরং অনেকটা নিরপরাধ,—কারণ সে দ্বিতীয়বার গিয়েছিল ফুলকাঠিতে, এবং মাধুকে বিয়ে করতেও প্রস্তুত ছিল। ভাগ্যের দুষ্ট চক্রান্ত মাধুকে নিয়ে গেছে ভিন্নপথে, নিরুপায় নারী পথে-পথে আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছে,—কিন্তু লোকটার নিজের অপরাধ কোথায়? অসংযমের উন্মাদনার কাছে মেয়ে-পুরুষ উভয়ই আত্মদান করেছে,—যেমন প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর নিত্য জীবনে বটে। কিন্তু পুরুষ তার নৈতিক দায়িত্ব পালনে কার্পণ্য করেনি। এক্ষেত্রে দত্তচৌধুরীর কোনো অপরাধ ঘটেছে,—এ শান্তনু স্বীকার করে না। সেদিন ওদের সামনে ছিল বিশ্বজোড়া সংগ্রামের ঝাপটা, রাজনৈতিক অরাজকতা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি—তারই আবর্তের মধ্যে প'ড়ে একটি মিলনাত্মক প্রণয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। শান্তনু একথা বিশ্বাস করে, উভয়পক্ষের কারো কোনো অপরাধ নেই। সুতরাং এক কালের যে-আগুন ধীরে ধীরে এতদিন ধ'রে নিভে এসেছে, তাকে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলায় শান্তনুর স্বভাবের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পেতে পারে। শান্তনু স্থির করলো, একথা জীবনে সে প্রকাশ করবে না!

সন্ধ্যার পরে রাজেন্দ্রনগরের কাছাকাছি এসে মোটরখানা যখন বাগান-বাড়ীতে ঢুকলো,—শান্তনুর সম্বিৎ ফিরলো। জন আষ্টেক দারোয়ান এখানে ওখানে পাহারা দিচ্ছে—পাছে জনতা আবার ভিতরে ঢোকে। ফটকের বাইরে

জনতিনেক পুলিস কনষ্টেবল পায়চারি করছে; আশেপাশে ক্ষুদ্র একটি জনতা। ফটকের উপর একটি টেলিফোন রিসিভার বসেছে,—অভ্যাগতরা ভিতরে ঢোকবার অনুমতি পাবে কিনা সেই কারণে ভিতরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ রাখার প্রচেষ্টা। দেখে-শুনে শান্তনু মুগ্ধ হয়ে গেল। আর কিছু না হোক, বড়গাছের সঙ্গে তার ফুটো নৌকা বাঁধা! কিন্তু চতুর্দিকে এমনই থমথমে ভাব,—ভয় করে পাছে জনতার সঙ্গে পাহারাদারদের সংঘর্ষ না বেধে ওঠে। কে না জানে, হেলেনের জন্য ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল!

অধীর আগ্রহে ঈশানী শান্তনুদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। সাড়া পেয়ে হুড়হুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে মাঝপথেই শান্তনুকে ধরলো,—কী আক্কেল! বিদেশ বিভূঁয়ে একা আমি এই এত বড় বাড়ীতে, একটু মায়া-দয়া নেই? সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠলো চারদিকে, ভেবে খুন হচ্ছি!

মাথায় তার লাল অশোকের গুচ্ছ এলো খোঁপার সঙ্গে ঝুলে পড়েছে, হীরের দুল জ্বলছে দুই কানে। পরনে ফলসা রংয়ের শাড়ী, তারই সোনালী জরির পাড় যেন তার আপাদমস্তক তরবারির ঝলক তুলেছে। সর্বাঙ্গে যেন সযত্ন মরণশয্যা রচনা ক'রে সে অধীর আগ্রহে প্রহর গণনা করছিল। শান্তনু হাসিমুখে বললে, তাহ'লে বল্ লগ্ন শুভ, ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছি?

সবাই উপরে উঠে এলো। ভিক্টর গেল স্নান করতে নন্দর সঙ্গে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা ও খাবার এসে পৌঁছলো। সেদিকে তাকিয়ে শান্তনু বললে, বুঝতে পারা যাচ্ছে ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করছিলি?

ঈশানী ছুটে গিয়ে শান্তনুর জামা পায়জামা তোয়ালে সাবান ইত্যাদি বের ক'রে নিয়ে এলো। চটি জুতোটা এনে সযত্নে সামনে রাখলো। তারপর হাতখানা ধুয়ে নিজের হাতে পরিপাটি ক'রে প্লেটের উপর খাবারগুলি সাজিয়ে চা ঢালতে লাগলো। এক সময়ে বললে, কিছুতেই তোর মন আর পেলুম না।

শান্তনু খাবার মুখে তুললো। বললে, মন কি তুই চেয়েছিলি? মিহিজামের কথা মনে ক'রে দেখ, তুই চেয়েছিলি সাহায্য!

সেটাকে বুঝি তুই আমার সইকরা দলিল ব'লে এতদিন ঠাউরে এসেছি?

মানুষের মনকে অঙ্কের সঙ্গে বাঁধনে চাস তুই? এইজন্যেই আমি তোকে আমার জীবনের ইতিহাস বলতে চাইনি। জানতুম তুই আমাকে চিরকাল ঘেন্নাই করবি।

ঘেন্না। শান্তনু অবাক।

নয় ত' কি,—ঈশানী কম্পিত কণ্ঠে বললে, একটা নিরপরাধ মেয়ে তার জীবনে একটা ভুল ক'রে ফেলেছিল, তারই জন্যে সে চিরদিন মাথায় অপমান বয়ে বেড়াবে? ক্ষমা, দয়া, বিবেচনা,—কিছু নেই তার জন্যে?

পেয়ালাটা রেখে শান্তনু বললে, চোখে তোর জল এলো কেন? আমি কি করেছি তোর?

কিছুই করিসনি, সেইটেই ত' অপমান! মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে তুই রয়ে গেলি, তার চেয়ে আঘাত আর কিছু আছে? তোর ঔদাসীন্য, তোর নিরাসক্তি, তোর স্বভাব-সংযম,—আমি কি চিরকাল পাথরের গায়ে মাথা ঠুকবো? কপাল ফুটো হয়ে রক্ত গড়াবে, আর তুই সমবেদনা জানাবি? কোনো চাঞ্চল্য নেই তোর? কোন মোহ নেই, মায়া নেই?

শান্তনু একটু হাসলো,—তোকে মাথায় তুলে দিনরাত ধেই ধেই ক'রে নাচলে তুই বুঝি খুশী হতিস? উদগ্র পুরুষের অসংযত আত্মবিস্মৃতি না দেখলে বুঝি তোদের মন ওঠে না?

ঈশানী শান্ত হোলো। বললে, আমি কি তাই বলছি?

উত্তেজিত শান্তনু বললে, তবে কি বলতে চাস, তোর নাচের সঙ্গে তাল দেবো, ঘুঙুর হ'য়ে পায়ে জড়াবো, খোঁপায় রক্তজবা পরিয়ে দেবো, শোবার ঘরে গিয়ে উৎপাত করবো,—না কি সারাদিন শুধু মন-দেয়া-নেয়ার লুকোচুরি খেলায় 'পাগলে মাতালে আকাশে পাতালে হট্টগোল, দে দোল দোল, দে দোল দোল!' কি চাস তুই?

ঈশানী বললে, এতক্ষণ কী করছিলি সেখানে?

এবম্বিধ কৈফিয়ৎ দাবী করলে শান্তনু বরাবর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত ক্ষিপ্তকণ্ঠে সে ব'লে উঠলো,'নন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস কর, ট্রেনের সেই সুন্দরী তরুণী মহিলাটির সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করছিলুম।

নাম কি মহিলার ?

কে জানে কি নাম ! মেয়ে হ'লেই হোলো

কে সে ?

শান্তনু চেঁচালো,—তোর সতীন।

ফিক ক'রে ঈশানী এবার হেসে ফেললো। বললে, তুই তাকে বিয়ে করছিস নাকি ?

কুমারী মেয়ে হলে হয়ত বিয়ের লোভ দেখিয়ে বসতুম !

ও, বুঝলুম। একথায় আমাকে খোঁচা দিতে চাস। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর কোনো মেয়ের নখের আঁচড় তোর নির্দয় পাথরে কোনোদিন দাগ কাটতে পারবে না।—ঈশানী বললে, যে কোনো মেয়ের সঙ্গেই তুই ঘনিষ্ঠতা কর না কেন, আমার ভয় নেই।

শান্তনু হাসলো, তোর আবার ভয় কিসের ? তোর নাচের ঠমকে দুই পায়ের চারিদিকে ভালোবাসা জড়ো হয়—তোর ভাবনা কি ?

এবারে শান্তকণ্ঠে ঈশানী বললে, নিরুপায় মেয়েমানুষকে বার বার আঘাত ক'রে তুই উল্লাস বোধ করিস কেন বল তো ?

শান্তনু তাকালো। সহাস্যে বললে, সমস্ত দিল্লী শহর যার জন্য উন্মত্ত সে যে মেয়েমানুষ,—এ ত' দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু চারিদিকে অসংখ্য স্তাবক আর কল্যাণকামী অনুরক্তের দল থাকতে নিজেকে নিরুপায় বলছিস কেন ?

ঈশানী বললে, তুই অজ্ঞান তাই প্রশ্ন করিস। জনসমুদ্রে যারা মনের মানুষ খুঁজতে চায় তারা ছেলেমানুষ ! আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু ছেলেমানুষ নই।

ভিতরে ঝনঝনিয়ে টেলিফোন বেজে উঠলো। ওধার থেকে নন্দ গিয়ে টেলিফোন ধরলো, তারপর রিসিভারটা রেখে এসে খবর দিয়ে গেল, রমেনবাবু ডাকছেন।

ঈশানী গিয়ে টেলিফোন ধরলো। রমেনবাবু বললেন, পাবলিকের ভয়ানক চাপ। আজ ভিড় জমেছে 'রীগলে'। আগামী চারদিনের সমস্ত টিকিট বিক্রি

হয়ে গেছে। টিকিট নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট চলছে। তুমি আজ তোমার ওখানেই রিহার্সেল দিচ্ছ ত'?

ঈশানী শুধু বললে, হাঁ, আপনার কোনো ভয় নেই।

রমেনবাবু বললেন, আর এক কথা, তোমার 'সোলো' নাচগুলোর সঙ্গে শান্তনু বাঁশী বাজাতে রাজি আছে, বলতে পারো?

টাকা ছাড়া শান্তনু রাজি হবে না।—ঈশানী জবাব দিল।

নিজের নামের উল্লেখ শুনে শান্তনু এ ঘরে এসে দাঁড়ালো। রমেনবাবু বললেন, শান্তনু আছে তোমার ওখানে?

ঈশানী বললে, না, তিনি বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেননি।

কত টাকা শান্তনু চাইবে তোমার মনে হয়?

বাঁশী তিনি কোথাও বাজান না। তবে আমি অনুরোধ করলে হয়ত রাজি হ'তে পারেন। আপনি কত টাকা দিতে চান বলুন, আমি তাঁকে ব'লে দেখবো।

ধরো দৈনিক পঞ্চাশ টাকা?

বেশ, তাঁকে ব'লে দেখবো। তবে এ টাকায় তিনি রাজি হবেন আমার মনে হয় না।—ঈশানী চতুর কটাক্ষহাস্যে একবার শান্তনুর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করলো।

রমেনবাবু বললেন, তা'হলে একশো পর্যন্ত বলা রইলো। কেন না বাঁশী মিষ্টি না হ'লে তুমি নাচে বাধা পাবে। তবে বলা রইলো, তুমি আমার হয়ে একটু বিশেষ অনুরোধ ক'রে যতটা কমাতে পারো। কাল সকালে আবার ফোন করবো।

আচ্ছা—ঈশানী ফোন ছেড়ে দিল।

শান্তনু সবিস্ময়ে বললে, বলিস কি, দৈনিক একশো? এক সঙ্গে কখনও চোখে দেখিনি! আবার হাসছিস তুই? পঁচিশ টাকা পেলে বর্তে যেতুম,—সখের জিনিস কিনে ভালো-মন্দ খেয়ে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে দিব্যি কলকাতায় ফিরতুম।

আমাকে ফেলে একলা যাবি ?

তুই ত' মোটা টাকা পেয়ে পাখা মেলে প্লেনে চলে যাবি। তোর আবা
ভাবনা কি। যতদিন যৌবন ততদিন রাজভোগ।

ঈশানী বললে, কিন্তু বুড়ি হবো যেদিন, কে দেখবে ?

শান্তনু হাসিমুখে ঈশানীর আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। বললে, থাম
জ্যাঠামি করিসনে। পুরাণে মহাকাব্যে কোথাও শুনেছিস, উর্বশী-মেনকারা বুড়ো
হয়েছে ?

ঈশানী চ'লে গেল অন্য ঘরে। কিছুক্ষণের জন্য সে নিরুদ্দেশ। ইত্যবসরে
শান্তনু স্নান ক'রে পায়জামার সঙ্গে রেশমী পাঞ্জাবী চড়িয়ে নিল। নন্দ তাকে
খাইয়ে গেল এক গ্লাস লিমন্ জুস। ও-মহলে ভিক্টর কোনো এক ঘরে নিজের
পড়াশুনো এবং ছবি আঁকা নিয়ে বসে গেছে।

ঈশানী ঠিক এমনি সময় তার রেশমী ঢিলা পায়জামা এবং টাইট্-বডিস্ প'রে
বেরিয়ে এসে বললে, আর দেরি নয়, শীগগির আয়। রমেনবাবু তাড়া লাগিয়েছেন।

প্রকাণ্ড বড় হল ঘরে এসে শান্তনু চমৎকৃত হোলো। হলজোড়া পার্শিয়ান
কার্পেট পাতা। চারদিকের দেওয়ালে সোনালী ফ্রেমে বড় বড় তৈলচিত্র
ঝুলছে। বড় বড় ভারতীয় নেতাদের ছবি,—তারই ফাঁকে ফাঁকে নানা বিদেশী
চিত্র। চার-পাঁচখানা পূর্ণ দৈর্ঘ্য আয়না—ওদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ
চেহারা প্রতিফলিত হবে। এধারে ওধারে তাকিয়ে শান্তনু দেখলো, ঘরময়
অসংখ্য ফুলের তোড়া, রাশি রাশি শ্বেত ও রক্তরঙীন পদ্ম, গোলাপের ঝাড়,
সূর্যমুখীর স্তবক, আরো কত অজস্র পুষ্পলতা। সমস্ত হল্ মৃদুমধুর সৌরভে
পরিপূর্ণ। ঈশানী সবুজ আলোগুলি জ্বেলে দিল। সমগ্র কক্ষ এক পলকে
স্বপ্নলোকে পরিণত হোলো।

শান্তনু বললে, এ ঘর কখন সাজালো ?

ঈশানী বললে, তিন লরী মাল নিয়ে এসে জন পঁচিশেক লোক একঘণ্টার
মধ্যে সবটা সাজিয়ে দিয়ে গেছে। এর দরকার ছিল তাই কর্তাদের কাছে খবর
পাঠিয়েছিলুম।

কেন?

ঈশানী তার সর্বাঙ্গে তরঙ্গ তুলে হাসলো। বললে, আজ যে আমার ফুলশয্যে।

শান্তনু বললে, ফুলশয্যের দ্বিতীয় অংশীদার কই?

ঈশানী বললে, পোড়াকপালীর ভাগ্যে কি একটা বেআইনী স্বামীও জুটবে না? নে, নে—শীগগির বাঁশী ধর্—ওই যে ওখানে রেখেছি!

গুনগুনানি গানের সঙ্গে ঈশানী নাচের উপক্রমণিকাটা ধ'রে দিল। বাঁশী নিয়ে সুর বাঁধলো শান্তনু।

সবগুলি আলো জ্বলছে, কিন্তু সমস্তটাই গোধূলির মতো অস্পষ্ট। নির্ভুল-ভাবে দেখা যাচ্ছে দু'জনকে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট নয়,—শুধু ছায়া নড়ছে। সৃষ্টির আদি রহস্যতল ভেদ করে ধীরে ধীরে পাতালকন্যা উঠছে পদ্মের কোরকের ভিতর দিয়ে তার প্রাকৃত দেহ নিয়ে। চাহনিতে জীবন-মৃত্যুর নিগূঢ় রহস্যটা আত্মসমাহিত। দেবলোকে শঙ্খরোল ওঠে পাতালকন্যার প্রাণের ইসারায়। বাঁশীতে অশ্রুতপূর্ব সুর চড়িয়ে বলা হচ্ছে, পৃথিবীর জন্ম হোলো!

সেই পৃথিবীর প্রাণপ্রতিমা হলেন শ্রীমতী রাধা! বাঁশীর সূক্ষ্ম মধুর টান শ্রীমতীর হৃদয়কে প্রকাশ ক'রে জানালো, তিনি চিরবিরহিণী। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম ভাষ্য হোলো ক্রন্দসী। লাখো লাখো যুগের কান্না নিয়ে ক্রন্দসী! সৃষ্টির সূত্রপাত হোলো বেদনার থেকে। মিলনের বাসনায় নিত্যকালের বিরহিনী কামনা করছেন তাঁকে চোখের জলে,—যাঁর নাম পুরুষোত্তম! বাঁশীর সুরের উদ্বেলতায় একথা ব'লে দেওয়া হচ্ছে। মিলনের জন্য আকুল-ব্যাকুলতা প্রতি প্রাণীর অন্তরে চিরস্থায়ী, সেই ব্যাকুলতাকে অনির্বাণ দীপশিখার মতো জাগিয়ে রাখার জন্য অনন্ত বিচ্ছেদ-বেদনা নিয়ে পুরাণমহাকাব্যের সৃষ্টি। শরাহত চক্রবাকের রক্তের লেখনে অনাদি অন্তহীন বিরহ-কাব্যের উৎপত্তি—কে না জানে। কিন্তু নাচের ছন্দে সুর মিলিয়ে শ্রীমতীর আনন্দকেও প্রকাশ করা হচ্ছে, সেটি অনাগত মিলনের জয়োল্লাস। পায়ে পায়ে আনন্দ, চোখে চোখে বেদনার অশ্রু; বিরহ-মিলনের সেই প্রলাপ বাঁশীর মধুর তানে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

সমগ্র দিল্লী মহানগরী বাইরে প'ড়ে রইলো। অজস্র অর্থ দিচ্ছে যারা, অপরিমেয় যশ আর প্রতিষ্ঠা, নগণ্য মানুষের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি, জীবনের পক্ষে যা কিছু কাম্য আর লভ্য, আনন্দের সহস্র উপকরণ,—তারা রইলো বাইরে অনাদৃত। ভিতরে বসেছে ইন্দ্রসভার আসর, নীলাভ মায়ালোকে নন্দনবাসিনীর নৃত্যের তালে-তালে মুক্তাশ্রু ভেঙ্গে পড়েছে আতপ্ত কপোলের কোণে-কোণে। বাসনা-বিবশ তনুলতায় লাবণ্যের মধুর মরণ এলায়িত বিহ্বলতায় থর থর করছে।

কম্পমান হৃৎপিণ্ডের শোণিতের দোলা লাগছে নর্তকীর নাচের ছন্দে বার বার। বেদনার সঙ্গে বাসনা, উল্লাসের সঙ্গে উদ্বেলতা—এরা জড়িয়ে ধরেছে ওই পুষ্পস্তবকনম্রা মাধবী লতাকে। দলিত দাক্ষারসের মতো কপাল বেয়ে গালের পাশ দিয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে গলার নীচে—সেই বিন্দুগুলি ঝলমল করছে বৈদূর্যমণির মতো।

পুরুষোত্তমের নিত্যকালীন বংশীধ্বনি হঠাৎ থামলো। শান্তনু একই সুইচে অনেকগুলি আলো জ্বেলে দিল। ঈশানী ঘর ছেড়ে পালালো।

মিহিজামের জনবিরল মাঠে ও পথের প্রান্তে পাতা ঝরছে অনেক। ভোরের হাওয়ায় এখনও শীতের কাঁটা থাকে। কিন্তু বেলা যতই বাড়ে, রৌদ্রদগ্ধ নিঃঝুম বসন্তকাল নেমে আসে।

শুকনো মাঠ ধূ ধূ করছে। পশ্চিমদিকে রেলপথ সোজা চ'লে গেছে জামতাড়া পেরিয়ে যশিদির দিকে, এবং তার ওপাশে 'চিত্তরঞ্জনের' নতুন উপনিবেশ গ'ড়ে উঠছে। কিন্তু এপারে পূবদিকের প্রান্তর এখনও অনেকটা বসতিবিরল, এখনও এদিকের নিরিবিলি পথে ও প্রান্তরে যথেষ্ট লোকসমাগম দেখা যায় না।

স্বল্পসংখ্যক চেঞ্জার যারা এসেছিল, তারা সবাই প্রায় চ'লে গেছে। আ দু'এক ঘর, তারাও যাই-যাই করছে। এদিকে ইলেকট্রিক হয়নি, ইঁদারার ছাড়া জলের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়, শীতের শব্জী প্রায় সবই উঠে গে শনি-মঙ্গলের সাঁওতালি হাট ছাড়া আর কোথাও বিশেষ কিছু পাওয়া যা এই সমস্ত কারণে এই ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যকর শহরটির আকর্ষণ অনেকটা কমে গেছে

ষ্টেশনের দিক থেকে একটা কাঁচা-পাকা রাস্তা চ'লে এসেছে এঁকেবেঁকে মাঠের ধার দিয়ে। দু'এক ঘর শ্রমিক সাঁওতালি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পথটা সোজা এসে এক বা ফিরে উত্তরমুখো নতুন কলোনীর দিকে চ'লে গেছে।

এই বাগানবাড়ীতে আজও রয়েছে একদল ছেলে [illegible]' সভা, কিন্তু ওরা গৃহস্থ নয়। ওরা বছরে দু'তি স্থানে 'তাঁবু' ফেলে—এবার এসেছে মিহিজামে। স রমেনবাবু, এবং পরিচালিকা ঈশানী রায়। ওদের হৈ হৈ প্রায় দেড় মাস, এবার ওদের যাবার সময় হয়েছে। ওে

নিত্য-মুখরিত। ওরা গান গেয়ে বেড়ায় মাঠে মাঠে, দল বেঁধে … তা!
পেরিয়ে পাহাড়তলীর ওদিকে সাঁওতাল পাড়ায় এবং সপ্তাহে দু … কর
গিয়ে যে কোন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য যে কোনো মূল্যে … ওর
আনে। ওদের সঙ্গে আছে তিন-চারজন চাকর আর পাচক, বামন …
—ওদের ভাবনা কিছু নেই। সকাল থেকে ওদের ঘরে ঘরে গান- …
লুডো-ক্যারম-তাস-পাশা, বিকেলে মাঠে মাঠে দৌড়ঝাঁপ, এবং … কা
নাচ ও নাটকের রিহার্সেল। ওদের স্বাস্থ্যশ্রীর দিকে তাকালে শ … টা
আসে। রাত্রের ঠাণ্ডাতেও দেখা যায় মেয়েদের এলোচুলের …
ঘাম জড়ানো, এবং ছেলেদের বোতাম খোলা পাঞ্জাবীও ভিজে সপসপ … চলু

ওদের সব কাজের ফাঁকে আরেকটি কাজ ছিল। নতুন চেঞ্জার …
অথবা কোন্ কোন্ চেঞ্জার চলে গেল, এর হিসেব রাখা। নতুন …
আসতো, ওদের অনেকেই গিয়ে গায়ে প'ড়ে আলাপ ক'রে বসতে … কা
নয়ে গল্প, তাই নিয়ে সমালোচনা। কারো কোনো বৈশিষ্ট্য …
দিকে ওদের অখণ্ড মনোযোগ লেগে থাকতো। এমনি ক'রেই …
গেছে। … আগে

দের যাবার সময় হয়ে এসেছিল। … খুব

ক এমনি সময়টায় একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলকাতা থেকে …
লো মিহিজামে। পশ্চিমের মাঠের প্রান্তে সূর্য তখন …
সবাই আসর বসিয়েছিল বাগানের সামনে মাঠে,—পথে … বে
থেকে ধীরে ধীরে এদিকে আসছে একটি গৃহস্থ, … গি
াড়ীতেই এসে পৌঁছেছে। ওদের পিছনে দু … র সঙ্গে
লো চেঞ্জার।

তা'রা এলো কাছাকাছি। একটি সুশ্রী যুবক, … কিছুদূর
চুল,—কাঁধে একটি শিশু। তার পিছনে … মতন
মেয়ে।—কেন, এক জোড়া চটিজুতো কত … এবং
পিছনে একটি কৃশকায়া রুগ্না বৌ,—পায়ে রা …

সন্ধ্যার পর গীতালী সঙ্ঘের সভ্যরা সবাই ঘরে উঠেছে, এমন সময় শান্তনু আবার এসে দাঁড়ালো বাগানের ফটকে। তার দুহাতে দুই বালতি। কিন্তু প্রবীণ বয়সের সেই ভদ্রলোক রমেনবাবুকে এবার কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শান্তনু এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। ভিতরের ঘরগুলিতে এক একটি পেট্রোমাক্স জ্বলছে, তাদের অত্যুগ্র আলো বাইরে এসে ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওধারে রান্নাবাড়ীর দিকে কোনো কোনো কলকণ্ঠীর উল্লোল হাসি মাঝে মাঝে ফেনায়িত হয়ে উঠছিল।

শান্তনু ফিরে যাবে কি না ভাবছে,—অথচ জল না পেলে তা'র কোনোমতেই চলবে না, এমন সময় ঈশানী এলো বেরিয়ে। শান্তনু এগিয়ে এসে বললে,—ভারি মুস্কিলে পড়েছি, ওখানে জলটল কিছু নেই। দু'বালতি জল আমি নিয়ে যাবো।

ঈশানী বললে, কেন, ইঁদারা নেই আপনাদের ওখানে?

ইঁদারাটা হোলো পাশের বাড়ীতে, কিন্তু মালী চাবি দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি নিজেই জল তুলে নেবো।

ঈশানী বললে, অত বড় বালতি, আপনি পারবেন কেন? ইঁদারার জল অনেক নীচে।

শান্তনু বললে, তা হোক, পারবো।

মুখ ফিরিয়ে ঈশানী ডাকলো, নন্দ? বাবুর ওখানে দু'বালতি জল দিয়ে আয় ত?—না না, রাখুন আপনি। আপনার গায়ে অনেক জোর আছে, মেনে নিলুম।

নন্দ এসে বালতি দুটো নিয়ে গেল।

শান্তনু বললে, তাহলে আরেকটা অনুরোধ জানাই। এদিকে কোথায় কেরোসিনের দোকান আছে আমাকে ব'লে দিন। আমাদের সঙ্গে মোমবাতি ছিল, সে আর খুঁজে পাচ্ছিনে।

তা'হলে অন্ধকারে আছেন বলুন?—ঈশানী ব্যস্ত হয়ে বললে, আচ্ছা দাঁড়ান—আসছি এক্ষুণি।

মিনিট তিনেক পরে এক বোতল কেরোসিন এনে সে শান্তনুর হাতে দিল। বললে, দোকান আছে বটে কিন্তু ষ্টেশন ছাড়িয়ে। আপনি আর সেখানে যাবার চেষ্টা করবেন না।

জলের বালতি নিয়ে নন্দ আগেই চ'লে গেছে। এবার শান্তনু পা বাড়ালো। কিন্তু পা বাড়ালেই হাঁটা যায় না,—নিজের ওই সুশ্রী হাত দুখানা দিয়ে যে অপরিচিত মেয়েটি কেরোসিনের বোতল এনে হাতে দিল, তাকে যে এখনই কষ্ট ক'রে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, এই লজ্জাটুকু শান্তনুকে পেয়ে বসলো। ধন্যবাদ জানাতে যাওয়াটা হাস্যকর, কৃতজ্ঞতা আরো অর্থহীন,—সুতরাং শান্তনু একবার ফিরে তাকালো মাত্র।

ঈশানী বললে, আর কিছু যদি দরকার হয়, বলুন?

শান্তনু থতিয়ে গেল। তারপর বললে, এর আগে বাচ্চাদের জন্য আপনারা দুধ পাঠিয়েছেন, এখন আবার কেরোসিন নিয়ে যাচ্ছি,—এসব জিনিষের দাম ত' আছে! তাই লজ্জা পাচ্ছি।

ঈশানী একটু হাসলো। বললে, এদেশে কিন্তু অনেক সময় জলও দাম দিয়ে কিনতে হয়। অসময়ের জল—দাম অনেক।

কথাটা ঠিক কি ওজনের বোঝা গেল না। শান্তনু আবার তাকালো। ঈশানী তার নিরুপায় চেহারাটা লক্ষ্য ক'রে যেন একটু কৌতুক বোধ করলো। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সে বললে, আচ্ছা আসুন, বাচ্চারা সব অন্ধকারে রয়েছে।

ধিক্কার দিল শান্তনু নিজেকে। মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে সে আজও কথা বলতে শিখলো না। অসময়ে উপকার পেয়ে সে নগদ মূল্যে তা'র পরিশোধ দিতে চায়, এই অসৎ শিক্ষা সে সঙ্গে এনেছে।

দিন দুই পরে আবার রমেনবাবুর সঙ্গে ঈশানীকে সে দেখলো। ফলের ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে পিছনে পিছনে চাকর চলেছে। ষ্টেশন থেকে ফিরছে সবাই।

এই যে মশাই,—রমেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বেশ জমিয়ে এবার বসেছেন ত'?

শান্তনু কাছে এলো। বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

বেশ, তাহলে মাসেক খানেক থেকে যান—এখানে হজম-টজম হয় ভালো।

থামুন আপনি।—ঈশানী তাঁকে ধমক দিল, লোক দেখলেই হজমের কথা তুলবেন না।

রমেনবাবু বললেন, আরে ওইটেই ত' আসল। বদহজমের অসুখ থাকলে তোমার নিজের চেহারায় এই লাবণ্য থাকতো, কোথায়? তোমার গানে ওই মধু পেতে কোত্থেকে? এই যে ফলের ঝুড়ি সঙ্গে যাচ্ছে, এ কি কোনো কাজে লাগতো? হজম ভালো ব'লেই ত' মিহিজাম এমন মনোহর। তোমরা সব ছেলেমানুষ!—যাক, মশায়ের কি করা হয়?

শান্তনু বললে, বিশেষ কিছু না।

গান-বাজনার বাই আছে? বাঁশীটে ত' সেদিন সঙ্গে দেখলুম। ওটা কি তবে তোলাই থাকবে?

শান্তনু সবিনয়ে একটু শুধু হাসলো।

তা বেশ, তা বেশ। ক্যামেরায় ছবি তোলেন, সেও একটা সখ বৈ কি। একটা কিছু নিয়ে থাকলেই হোলো। কোন্‌দিকে যাচ্ছেন?

শান্তনু বললে, এই একটু বাজারের দিকে।

ঈশানী বললে, এটা ত' বাজারের রাস্তা নয়। আপনাকে অনেক ঘুরে যেতে হবে।

রমেনবাবু বললেন, আরে, উনি ঘুরতেই ত' বেরিয়েছেন। তা তুমিও ত' তেল-সাবান কিনতে যাবে, যাও না ওঁর সঙ্গে।

আসুন।—ঈশানী শান্তনুর দিকে তাকাল। চাকরকে সঙ্গে নিয়ে রমেনবাবু বাসার দিকে অগ্রসর হলেন, মাঝখানে একটা ব্যবধান রেখে শান্তনু চললো ঈশানীর সঙ্গে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার উল্লাস লেগে র'য়েছে।

মাঠে প্রখর রোদ। কিছুদূর গিয়ে শান্তনু বললে, আপনাকে কষ্টই দিলুম।

হাসিমুখে ঈশানী বললে, না না, কষ্ট কিসের। তবে সেই ছাতাটা সঙ্গে থাকলে এই রোদ্দুরে আমার মাথাটা রাখা যেতো বটে।

এসব কথা বড়ই জটিল, শান্তনু অতটা বোঝে না। একটু পরে সে বললে,

আপনাদের দল ত' অনেক বড়। এখানে অসুবিধে হচ্ছে না? ধরুন, এত জিনিষপত্রের অভাব।

ঈশানী বললে, আমাদের দলের কারোকে দেখলে মনে হবে না যে, এদেশে কারো অসুবিধে হচ্ছে। বরং সকলের চেহারাই ফিরে গেছে। আসুন, এই বাগানটার পাশ দিয়ে যাই।

মাঠের পথটা এক সময় সঙ্কীর্ণ হয়ে বাগানের দিকে ঘুরলো। এখানে গোলাপের চাষ হয়। এখান থেকে ফুল রপ্তানী হয় কলকাতায়।

ফস ক'রে এক সময় ঈশানী বললে, কই আপনি ত' সেদিনকার দেনা শোধ করলেন না?

শান্তনু সহাস্যে বললে, দেনা শোধ? ও, বলুন কি করতে হবে?

পথ মুখরিত হয়ে উঠলো ঈশানীর হাসির আওয়াজে। কৌতুকবোধ ক'রে শান্তনু বললে, আমি ভেবে রেখেছি একটি উপায়ে আপনাদের দেনা শোধ করবো।

ঈশানী মুখ ফিরিয়ে তাকালো।—কি?

আমার ক্যামেরায় আপনাদের ছবি তুলে দেবো।

আপনার কাঁচা হাত আমাদের ওপর দিয়ে পাকিয়ে নিতে চান বুঝি?

কাঁচা হাত!—শান্তনু হেসে ফেললো, অনেক কাগজওয়ালা আমার তোলা ছবি ছাপে, নিতান্ত কাঁচা হাত হ'লে তা'রা নিত না। আমাকে অনুমতি দিন, আপনার ছবি আগে তুলি।

ঈশানী বললে, আমাদের দলে অন্য মেয়েও আছে, তাদের বাদ দিয়ে একলা আমার ছবি তোলা ভালো হবে না। তাছাড়া আমার ছবি আমি তুলতেও দিইনে।

শান্তনু কতক্ষণ চুপ ক'রে হাঁটতে লাগলো।

ঈশানী বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশী হলুম। কিন্তু এসব ছবিটবি তোলার সখ ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের। আমাদের মানায় না।—আসুন—

ঈশানী আগে আগে চললো। শান্তনু পিছন থেকে বললে, কোনো মেয়ের ছবি আমি আজ পর্যন্ত তুলিনি।

নাই বা তুললেন। ঈশানী ফিরে তাকালো,—মেয়েছেলের ফটো নিয়ে লোকে ব্যবসা করে, আপনি সে-দলে নাই রইলেন।—ছেলেপুলে নিয়ে বাইরে এসেছেন, তাদের শরীর-স্বাস্থ্য ফেরাবার চেষ্টা করুন, ওতে বেশী কাজ দেবে।

দক্ষিণের পথটায় ওরা দুজনে এসে পড়লো। এ পথটা গিয়ে মিলেছে ষ্টেশনে। দু'একটি দোকানপত্র আছে এখানে-ওখানে। ওদেরই একটিতে এসে ঈশানী উঠলো। পাশে এসে দাঁড়ালো শান্তনু।

সাবান ইত্যাদি কতকগুলো জিনিষপত্র কিনে ঈশানী বললে, কই, আপনি কি নেবেন নিন?

শান্তনু বললে, আমি তরি-তরকারী কিনে নিয়ে যাবো।

সেসব আজ কোথায় পাবেন? কালকে হাটের বার, হাট ছাড়া কিছুই পাবেন না। তখন বললেন না কেন আমাদের ম্যানেজারকে? তিনি যা হয় ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। বেচারি, আপনি দেখছি বিদেশে এনে বাড়ীর সবাইকে কষ্টই দিচ্ছেন! এখন উপায়? কী নিয়ে বাড়ী ঢুকবেন? তাছাড়া এত বেলা হোলো!

ঈশানী চঞ্চল হয়ে উঠলো।—

শান্তনু নিরুপায় হয়ে বললে, জানি আমার কপালে লাঞ্ছনা আছে ফিরে গিয়ে। কিন্তু এসব আমি কিছু পেরে উঠিনে।

ঈশানী রাগ ক'রে বললে, পেরে ওঠেন না? তার মানে? সংসার কি আপনাকে ক্ষমা করবে এর জন্যে? শুধু ক্যামেরা হাতে নিয়ে ছবি তুলে বেড়ালে ঘরকন্না চলে?

এবার আমি যাই।—শান্তনু অগ্রসর হ'তে চাইলো।

দাঁড়ান মশাই, বাহাদুরী করবেন না।—দোকানে হিসাব চুকিয়ে ঈশানী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। পুনরায় বললে, চলুন।—তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, ওদের দুধ আছে ঘরে?

শান্তনু বললে, আছে।

কিন্তু দুধ থাকলেই ত আর ঘর চলবে না। রান্নার জিনিষপত্র চাই। আসুন

আমার সঙ্গে। আজকের মতন আপনাদের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। আপনি বড় অদ্ভুত লোক দেখছি। তিন-চারদিন হোলো এসেছেন, অথচ ঘরকন্না গুছিয়ে তোলেননি? শীগ্‌গির আসুন।

রৌদ্রে রাঙ্গা হয়ে উঠলো ঈশানীর মুখখানা। মাঠের পথ কঠিন মাটির ডেলায় আকীর্ণ, দ্রুত চলা যায় না। চুলের লহর বেয়ে ঘামের ফোঁটা নেমে এলো কপালে। পনেরো মিনিটকাল লাগলো বাগানবাড়ীতে এসে পৌছতে। সেদিনের মতো ব্যবস্থা হয়ে গেল।

শান্তনুর কপাল মন্দ। কোনোমতেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশের অবকাশ পায় না। যদি বা নির্জন আলাপের সুবিধা সে পেলো,—আগাগোড়া ধমক খেলো, আগাগোড়া হিতোপদেশ। সে অযোগ্য, সে নির্বোধ, সে বেহিসাবী। কিন্তু এ নিয়ে ভাববারও কিছু নেই। ওরা অন্য সমাজের মানুষ, সে ভিন্ন জগতের লোক।

প্রায় সপ্তাহখানেক যেতে বসলো। ওই বাগানবাড়ীর পাঁচিলের গা দিয়েই শান্তনুকে দিনে অন্তত পাঁচ-সাতবার আনাগোনা করতে হয়। ছোট ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে ওই একই পথে তা'র আনাগোনা। দুধ আনে ভোরবেলা, তারপর যায় একবার ষ্টেশনের দিকে খাবার কিনতে, হাটের দিন হ'লে ছেলে কাঁধে নিয়ে মোট ব'য়েও আনে। কখনো আনলো এক মোট কয়লা, কখনও বা তেল-নুন। ছেলেটা কিন্তু কাঁধে,—আশ্চর্য, একটু ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই। ভারবাহী জীব সন্দেহ কি!

একদিন আবার ধরলো ঈশানী। হাসিমুখে বললে, ছেলে বুঝি বড্ড আদুরে?

ছেলে মাত্রেই তাই!—শান্তনু জবাব দিল।

কিন্তু ওকে হাঁটতে-ছুটতে দিন? পা খোঁড়া ক'রে রাখছেন কেন?

হাঁটলে ওর কষ্ট হবে। জ্বরে পড়তেও পারে।

ঈশানী চুপ ক'রে তাকালো। তারপর বললে, আপনার স্নেহের অনাচারে ওর ইহকাল-পরকাল কিন্তু ঝরঝরে হয়ে যাবে। নিজের পায়ে হাঁটলে তবেই শিশু বড় হয়।

শান্তনু হেসেই অস্থির।—ওসব বইপড়া বিদ্যে চিরকালই ত' শুনে এলুম।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্য সহকারে শান্তনু ছেলেটাকে নিয়ে চ'লে গেল। আজ সে যেন নিজের কথায় দৃঢ়তা খুঁজে পেয়েছে। বাৎসল্যটা অন্ধ নয়, ওটাই হোলো শক্তি,—ওটাই শান্তনুকে সবল রেখেছে, ওটাতেই জোর পেয়েছে। আজ যেন ঈশানী আঘাত খেয়ে চুপ ক'রে রইলো। একটি কথায় সমস্ত তিরস্কার শান্তনু ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

তরুণ-তরুণীদের হৈ চৈ আর শোনা যাচ্ছে না তেমন। হাটতলায় কোলাহল নেই, মাঠে মাঠে ওরা আর ছুটোছুটি করে না, বাড়ীর মধ্যে গান-বাজনা বন্ধ, নাচ আর নাটকের মহড়া থেমে গেছে।—দুদিন ধ'রে সন্দেহ করছিল শান্তনু। সেদিন সকালে নন্দকে ধরলো সে।

তোমাদের বাড়ী যে এত ঠাণ্ডা, নন্দ? তা'রা সব গেল কোথায়?

নন্দ বললে, তা'রা সবাই চ'লে গেছে আজ তিন দিন হোলো।

শান্তনু বললে, চ'লে গেছে? কই জানতে পারিনি ত'?

ভোরের গাড়ীতে গেছে রাত থাকতে উঠে।

ও।—শান্তনু একবার ভুরু কুঁচ্‌কে দাঁড়ালো। যাক্, সে ওদের কাছে ঋণী রইলো। অসময়ে সে বার বার ওদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। মনে থাকবে। যদি আবার কোনোদিন কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেখা হয়, সে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবে।

শান্তনু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে চ'লে যাচ্ছিল।

নন্দ বললে, আমার দিদিমণি যাননি কিন্তু। তিনি হৈ চৈ ভালোবাসেন না। তা ছাড়া তিনি ওদের দলেরও নন্।

কোথায় তিনি?—শান্তনু উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো।

আছেন ভেতরে—আসুন না?

শান্তনু বললে, না, এখন থাক্—আমি একবার ডাক্তারের ওখানে যাচ্ছি, ছেলেটার একটু জ্বর হয়েছে কাল থেকে। অন্য সময় দেখা হবে।

শান্তনু তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

নন্দ বোধ হয় ভিতরে গিয়ে ব'লে থাকবে, ঈশানী দ্রুতপদে বেরিয়ে এলো। ছেলেটার নাম ক'রেই শান্তনুকে সে খোঁচা দিয়েছিল, সুতরাং ছেলেটার অসুখ শুনে সে একটু ব্যস্তই হোলো। ওদের বাড়ীতে সে যায়নি একবারও, কারণ তা'র যাওয়াটা পছন্দসই নাও হতে পারে। তা ছাড়া শান্তনুও তাকে একটিবার আমন্ত্রণ করেনি। কিন্তু আজ ছেলেটার অসুখের সংবাদ শুনেও চুপ ক'রে থাকাটা তা'র সৌজন্যে বাধলো। অন্তত মিনিট পাঁচেকের জন্য গিয়ে না দেখে এলে অশোভন হয়।

ঈশানী বেরিয়ে এসে পাঁচিলের পাশ দিয়ে গিয়ে সোজা 'মাধবীকুঞ্জে' উঠলো।

একতলা বাড়ী যেমন হয়। ঘর-দরজা তেমন ভালো নয়। ওরই মধ্যে যৎসামান্য ঘরকন্না অগোছালো হয়ে রয়েছে। সেই কৃশকায়া বৌটি এসে হাসিমুখে বললে, আসুন. আসুন,—ভারি খুশী হলুম। কি ভাগ্যি আমাদের!

ঈশানী বললে, কতদিন মনে করেছি এসে আলাপ ক'রে যাবো, তারপর একদিন নেমন্তন্ন করবো,—নানা গোলমালে হয়ে ওঠেনি। শুনলুম নাকি আপনার ছেলেটির অসুখ?

বৌটি বললে, হ্যাঁ, তবে সামান্যই—একটু গা গরম হয়েছে। আর কিছু নয়। বিদেশ-বিভুঁই কিনা, ভয় করে। এখানে এসে পর্যন্ত আপনাদের সাহায্য পাচ্ছি, আপনাদের কাছে আমাদের অনেক ঋণ জমা হয়েছে।

হাসিমুখে ঈশানী বললে, বেশ ত', ঋণ বেড়ে চলুক, একদিন শোধ করবেন।

ঈশানীর মাথায় সিঁদুরের চিহ্ন নেই, সুতরাং পরিচয়টা আর ব'লে দিতে হয় না। তবে একটু অস্বাভাবিক লাগে বৈ কি। বয়স হয়ত পঁচিশ ছাড়িয়ে গেছে। গলাটা খালি, ডান হাতে একগাছি ফিনফিনে সোনার চুড়ি, বাঁ হাতে একটি রিষ্টওয়াচ। কিন্তু আশ্চর্য, রূপে ও স্বাস্থ্যশ্রীতে সমস্ত চেহারাটা জমজ করছে। আঙুলের ডগায় পর্যন্ত স্বাস্থ্যের আভা।

বৌটি বললে, দাঁড়ান্, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই হ্যাগো, শুনছো, একবার এঘরে এসো ত? দেখে যাও সোনার সরস্বতী কা'কে বলে!

স্ত্রীর ডাক শুনে একটি ভদ্রলোক হাসিমুখে এঘরে এলেন। কিছু ভাববার আগে, কিছু বলবার আগে,—একেবারে এসে সহাস্যমুখে তিনি ঈশানীর সামনে দাঁড়ালেন। শান্তনু নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক। অবাক-বিস্ময়ে ঈশানী একবার মুখ তুলে তাকালো, এবং আড়ষ্ট হাত তুলে নমস্কার জানালো। শান্তনু নয়,—অন্য ব্যক্তি।

ভদ্রলোক বললেন, আমার খুড়তুতো ভাইটির সঙ্গে এঁদের পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু সে একেবারে অপদার্থ, কোনো কাজের যোগ্য নয়। হতভাগা সময়মতো বাজার-হাট করেনি, ঘরকন্নার এতটুকু খোঁজখবর নেয়নি। ওর ওপর ছেড়ে মস্ত ভুল করেছি। বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলে তবে আমার রাগ যায়। শুনলুম আপনারা নাকি অনেক সাহায্য করেছেন!

বৌটি রুষ্টকণ্ঠে বললে, কপাল মন্দ, তাই অমন অলক্ষুণে দেওরের হাতে এই দুর্ভোগ হলো!

ঈশানী এরই মধ্যে একটুখানি সামলিয়ে নিল। বললে, উনি তাহলে করেন কি সারাদিন?

বৌটি বললে, দেখুন না গিয়ে, হয়ত মাঠের ধারে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে, নয়ত পদ্য লিখছে,—আর নয়ত সব অকাজের কাজ! ছবি আঁকা চলছে!

আপনার খুড়তুতো দেওর উনি?

হ্যাঁ, আমার মরণ। আমি বলি কাজকর্ম যদি কিছু করে ত করুক, নৈলে দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। জ্ঞাতিগুষ্টির ছেলেকে আমরাই বা বসিয়ে বসিয়ে কদ্দিন পুষবো, আপনিই বলুন না!

ঈশানী বললে, সে ত নিশ্চয়ই। তবে বিয়ে থা দিয়ে দেখুন না, যদি ভালো হয়ে যান্?

বিয়ে থা?—ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠলেন, অমন ছেলেকে মেয়ে দিচ্ছে কে? চাল্ল নেই, চুলো নেই, খাওয়া-পরা দেবার ক্ষমতা নেই,—ওর গলায় মালা দিয়ে কি সে-মেয়ে নিজের গলায় দড়ি দেবে?

বৌটি বললে, হোক না বাঙ্গলা দেশ, তবু মেয়ে অত সস্তা নয়!

অজস্র গালিবর্ষণ চললো অনেকক্ষণ। এক সময় ঈশানী উঠে দাঁড়ালো। বললে, বড় আনন্দ হলো আলাপ ক'রে। এবার আমি যাই। আপনার ছেলেটিকে দেখতে এসেছিলুম সব কাজ ফেলে। ভয়ের কারণ নেই শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

ভদ্রলোক বললেন, মাঝে মাঝে এলে ভারি খুশী হবো।—

পালাতে পারলে তখন ঈশানী বাঁচে, দম আটকে এসেছে। কোনোমতে নমস্কার জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো পথে।

বাড়ীতে ঢোকবার আগে মাঠের সামনে সে একবার থমকে দাঁড়ালো। একটা অত্যন্ত কৌতুকজনক প্রতারণার মধ্যে সে এতদিন জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শান্তনুও কোনোদিন এ আলোচনা তোলেনি, সে নিজেও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল একটা অনুমান এবং ধারণার ওপর।

ঈশানী কেমন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো!

পাচক রামতীরথ ভিতর থেকে বেরিয়ে হাটের দিকে যাবার আয়োজন করছিল, ঈশানীকে দেখে বললে, মা, ও-বাড়ীর বাবু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ও-বাড়ীর বাবু? ওঃ, কোথায় তিনি?

বাইরের ঘরে বসিয়েছি।

ঈশানী তাড়াতাড়ি ভিতরে এলো। শান্তনু কুণ্ঠিত হ'য়ে একখানা চৌকির প্রান্তে চুপ ক'রে বসেছিল। ঈশানীকে দেখে মুখ তুললো। বললে, ক্ষমা চাইছি, আপনার এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি।

অন্যায় যখন ক'রেই ফেলেছেন তখন একটু বসুন।—পুরুষ মানুষ অদ্ভুত জীব! জ্ঞানে-অজ্ঞানে প্রতারণা না ক'রে আপনারা থাকতে পারেন না।

শান্তনু আরো কুণ্ঠিত হয়ে উঠলো। বললে, কই, আমি ত আপনাকে কোনো সময় প্রতারণা করিনি!

ঈশানী বললে, করেছেন, তবে টের পাননি।—যাক গে, ওরে নন্দ, এখানে

চা দিয়ে যা। আজ একটু গরম পড়েছে, কি বলুন? হঠাৎ যে আপনি? ব্যাপার কি?

শান্তনু বললে, নন্দর কাছে শুনলুম আপনি আমাদের ওখানে। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে ভাই আর ভাজের গালমন্দ নাই শুনলুম,—তাই আপনার এখানেই ব'সে অপেক্ষা করছিলুম।

আপনার ধারণা ভুল। তাঁরা আপনার কাব্যরচনার সুখ্যাতি করছিলেন।

মিথ্যে কথা! বিশ্বাস করিনে।

সত্যিই বলছি—ঈশানী হাসিমুখে বললে, রামায়ণের লক্ষ্মণের পরে আপনিই হলেন আদর্শ ভাই আর দেওর,—একথাও তাঁরা জানিয়ে দিলেন! কই দেখি, পকেট থেকে কবিতা-টবিতা কি আছে বা'র করুন,—শুনি।—কিছু না থাকে, হাতে আঁকা ছবিই একখানা দেখান না? সময় কাটুক।

শান্তনু বললে, আপনার কি এখানে সময় কাটাবার মতন কিছু নেই?

না, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু ছিলও না। ঈশানী চৌকির কোণে একসময় ব'সে পড়লো।

নন্দ এবার এসে দুজনের চা দিয়ে গেল। শান্ত কণ্ঠে ঈশানী বললে, ওঁদের ছোট ছেলেটিকে কি আপনি সত্যিই ভালোবাসেন?

শান্তনু চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বললে, ওরা চায় না যে, ছেলেটা আমার কাছে থাকে। তাই দেখতে পেলে কেড়ে নিয়ে যায়,—আর ছেলেটাকে মারে। ওকে নিয়ে আসি লুকিয়ে, ওরা জানতে পারে না। যদি কখনও খাবার কিনে দিই, ওরা দেখতে পেলে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। আদর করলে ভাবে, আমি বুঝি ছেলেকে ভাগিয়ে নিচ্ছি।

আপনার ভালোবাসা পদে পদে অপমানিত হয়, এতে আপনার আঘাত লাগে না? ধরুন, ওরা যদি পছন্দ না করে, তাহলে ত আপনাকে স'রে যেতেই হবে একদিন।

যাবো।

গেলে সইতে পারবেন?

শান্তনু বললে, সয়ে যাবে একদিন।

ঈশানী এবার পেয়ালাটা তুলে নিল। প্রশ্ন করলো, আপনার মা-বাবা নেই? ভাই-বোন?

এবারে শান্তনু একটু সজাগ হয়ে উঠলো। বললে, এসব বড্ড ব্যক্তিগত কথা। কেউ নেই বললে আপনি সান্ত্বনা দেবেন, আমি কিন্তু তা'র জন্যে আসিনি।

ঈশানী বললে, সে আমি জানতে পেরেছি। এক মুঠো ভিক্ষেয় আপনার মন উঠবে না। তবে আপনার ব্যক্তিত্ব যদি এতই প্রবল, ওদের উচ্ছিষ্টের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?

শান্তনু চুপ ক'রে চায়ে চুমুক দিতে লাগলো। এক সময় বললে, দেখুন, মনের জটিলতা নিজেও অনেক সময় বুঝিনে। তা ছাড়া কা'র জীবনে কোথায় কি কথা লুকিয়ে থাকে, বলাও বড় কঠিন।

পেয়ালাটা রেখে শান্তনু এক সময় উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমি যাই—

না, দাঁড়ান্।—ঈশানী বললে, আমার কাছে নাকি আপনার অনেক ঋণ, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন?

আপনাকে সাহায্য!—শান্তনু হো হো ক'রে হেসে উঠলো,—আমাকে পরীক্ষা করছেন বুঝি? আপনার চারদিকে এত লোক, এত আড়ম্বর, যা চোখে দেখলুম এতদিন ধ'রে,—আর আপনি চাচ্ছেন আমার সাহায্য?

ঈশানী বললে, আপনার সাহায্য পেলে আমার বড় উপকার হোতো!

শান্তনুর পক্ষে এ পরিস্থিতি বিশ্বাস করা কঠিন। এ যেন একটা অলস কবিকল্পনার মতো। রাজকন্যা সাহায্য চাইছে এক রাখালের কাছে,—যে ব্যক্তি জীবনে নিঃস্ব! এটা কেবল এই হ'তে পারে যে, হাতের মুঠোর মধ্যে তাকে পেয়ে বোকা বানানো হচ্ছে। এরপর দু'এক কথায় বেশী অগ্রসর হ'লে বাড়ীতে চাকর-বাকর আছে! অর্থাৎ—

শান্তনু দরজার দিকে তাকালো।

ঈশানী বললে, দেখুন, অন্য কিছু ভাববেন না। একটা কথা সত্যি ক'রে বলি, ওরা চ'লে গিয়ে আমি বেঁচেছি। আমি ওদেরই দলের, সন্দেহ নেই। পাঁচ বছর কাটলো ওদেরই নিয়ে। তবু একটা কথা আমার থেকে যাচ্ছে, এ আমি চাচ্ছিনে!

কি চাচ্ছেন?—সোজা প্রশ্ন করলো শান্তনু।

একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে চাচ্ছি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে সাহায্য করে।

শান্তনু আবার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলো,—আপনি কি আজও সংসার করেননি?

সংসার!—

হঠাৎ ঈশানী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। পুনরায় বললে, আপনি না কবি, শিল্পী? এ কি আপনার অদ্ভুত প্রশ্ন?

ক্ষমা করবেন, মেয়েছেলের কল্পনার দৌড় বিয়ে পর্যন্ত।—শান্তনু বললে, তা'র বাইরে আর কিছু নিয়ে তা'রা মাথা ঘামায় না।

সর্বনাশ!—ঈশানী বললে, দেখছি আগাগোড়াই আমার ভুল। যতটা আড়ষ্ট আপনাকে মনে করেছিলুম, আপনি তা' মোটেই নন। এসব কী বলছেন আপনি?

ঈশানীর নির্মল হাস্যমুখ দেখে শান্তনুর কণ্ঠে অসমসাহসিকতা দেখা গেল। সে বললে, বেশ ত' আমার জানা রইলো। বন্ধু সমাজে ব'লেও রাখবো। আমার দ্বারা কোনো সাহায্য হয়, আনন্দই পাবো। তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন না? আজকাল অনেক বয়স্থা কুমারী আর ইচ্ছাবতী বিধবারা গোপনে খবরের কাগজে পাত্র পাবার জন্য বিজ্ঞাপন পাঠায়! আপনি সেদিকে একটু মন দিতে পারেন! আপনার কল্যাণ কামনা ক'রেই বলছি।

হাসি চাপতে গিয়ে ঈশানীর দম আটকে আসছিল। মুখে হাত চেপে সে বললে, শিশু আপনার কেন প্রিয়, এখন বুঝতে পাচ্ছি। শিশুর মতো অজ্ঞান না হ'লে শিশুর সঙ্গে মেলে না।

শান্তনু সহাস্যে বললে, কিন্তু আপনার এই সাহায্য চাওয়াটা যে ভয়ের কথা, এ মানেন ত ?

ঈশানী বললে, ভয়ের কথা কেন ?

শান্তনু উঠে দাঁড়ালো। বললে, ক্ষমা করবেন, এসব আলোচনা মিথ্যে। এইটুকু আমার সীমা, এর বাইরে পা বাড়াতে চাইনে !

ঈশানী বললে, আবার কখন আসছেন ?

শান্তনু বললে, আসতে পারি, তবে ওই সাহায্যের কথাটাই যে মনে দুর্ভাবনা আনে।

খুব হেসে উঠলো দুজনে।

বাগানের ফটক পর্যন্ত ঈশানী এগিয়ে এলো। তারপর বললে, যার মনে কোনো দুরভিসন্ধি নেই, তাকে কিন্তু ভয়ানক খোঁচা দিয়ে যাচ্ছেন। এবার এসে ক্ষমা চাইবেন।

নমস্কার জানিয়ে শান্তনু হাসিমুখে হন হন ক'রে চ'লে গেল।—

২

তিন চার দিন পর্যন্ত ওদিক থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঈষৎ উদ্বেগ আছে ঈশানীর মনে, একটু বা অস্বস্তি, শান্তনুর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে। রমেনবাবু লিখছেন, তুমি না এলে রিহার্সেল আর জমছে না। ওদের কলেজের পরীক্ষা আসন্ন, পরীক্ষার পর থেকে ওদেরকে নিয়মিত রিহার্সেলে আনা দরকার। তুমি এসে বসলে ওরা এদিকে মন দেবে।

দুটো হাটের দিন চ'লে গেল। ঈশানী নিজেই গিয়ে এদিক ওদিক খুঁজেছিল,—শান্তনু হাটেও আসে না। ও-বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ আনবে সে কোন্ সুবাদে? নন্দকে পাঠালেও অর্থটা খারাপ দাঁড়াতে পারে। ঈশানী চুপ ক'রে অপেক্ষা করছিল।

মাঠ পেরিয়ে রামতীরথ গিয়েছিল ওপারের পাহাড়তলীর দিকে, যেদিকে সাঁওতালপাড়া। কথায় কথায় রামতীরথ সেদিন বললে, শান্তনুবাবুকে সে ওদিকে ঘুরতে দেখে এসেছে।

কিছু বললেন তোমাকে?

না, মা, তিনি আমাকে দেখতে পাননি। আমিও তাঁকে বিরক্ত করিনি। বই-কাগজ নিয়ে পাহাড়ের ধারে নিজের মনে কাজ করছিলেন।

নন্দকে সঙ্গে নিয়ে ঈশানী বিকালের দিকে গেল সেইদিকে। কিন্তু যে-ভয়ে পালাও তুমি, সেই দেবী আমি! হঠাৎ পাহাড়ের বাঁকে দেখা হয়ে গেল দাদা আর বৌদিদির সঙ্গে। তিনটি রোগা ছেলেমেয়ে আশে-পাশে ট্যাংট্যাং করছে। ওরা বেরিয়েছে সান্ধ্যভ্রমণে। থমকে হাসিমুখে দাঁড়ালো ঈশানী। দিনান্তের রাঙ্গা আলোয় পাহাড়ের পাশে তাকে মানিয়েছিল বনলক্ষ্মীর মতো। বসন্ত-মঞ্জরীর গুচ্ছ গোঁজা ছিল তা'র এলো খোঁপার প্রান্তে।

বৌদিদি এগিয়ে এলেন, সহাস্যে বললেন, সাঁওতালি মেয়েদের স্বাস্থ্যের দেমাক দেখে চোখ ক্ষয়ে গেল, আপনাকে দেখিয়ে ওদের অহঙ্কার ঘোচাতে চাই। চ'লে যাবেন ব'লে সেদিন আমাদের নোটিশ দিয়ে এলেন, কিন্তু আপনি গেলে মিহিজাম যে অন্ধকার হয়ে যাবে?

ঈশানী বললে, আর দিন দুই আছি। এবার সত্যি সত্যিই নোটিশ এসে গেছে। আমাকে এবার যেতেই হবে।

দাদা ছিলেন দূরে, তিনি কাছে এলেন। বললেন, কলকাতায় ফিরে কোথায় আপনার দর্শন পাওয়া যাবে?

ঈশানী বললে, মুস্কিল, আমার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। বরং আপনাদের ঠিকানাই আমাকে দিন্, আমিই চেষ্টা করবো দেখা করতে।

দাদা কাগজ-পেন্সিল বা'র ক'রে একটি ঠিকানা দিলেন পাইকপাড়ার ওদিকে। ঈশানী সেটা রেখে দিল ভ্যানিটি ব্যাগে। ছোট ছেলেটি পাশে এসে দাঁড়ালো যেটি শান্তনুর প্রিয়। ঈশানী চিবুক নেড়ে তা'কে আদর জানালো। তারপর বললে, আপনার লক্ষণ-দেওরটি এবার ঘরকন্নায় মন দিয়েছেন?

স্বামি-স্ত্রী দুজনের চেহারাই দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে উঠলো। বললেন, মন থাকলে ত' দেবে? আপনি পর মানুষ, আপনাকে আর কি বলবো! অত বড় ছেলে, রুজি-রোজগারের দিকে মন নেই। আর করবেই বা কেন? জ্ঞাতগুষ্টির ছেলে, ঘরের শত্তুর! এক পয়সার সাহায্য নেই, কেবল বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াও।

দাদা বললেন, আমারও প্রতিজ্ঞা, সামনের মাস থেকে যদি মাসিক খরচ না দেয়, তবে যেখানে খুশি চ'লে যাক্—আমাদের ওখানে আর জায়গা হবে না।

ঈশানী প্রশ্ন করলো, উনি পড়াশুনা করেছেন কদ্দূর?

দাদা বললেন, সেইটিই ত' দুঃখ! বি-এ পাস করেছিল বেশ মন দিয়ে। কিন্তু পেট চলবে কেমন ক'রে একথা ভাবলো না কোনোদিন। আর কিছু না হোক, ইচ্ছে করলেই একটা যাহোক মাষ্টারিও পায়;—কিন্তু ওই, কোনো কাজ করবে না। এরা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, ঘরের শত্রু!

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বৈ কি। কিন্তু ঈশানী মুখ বুজে যদি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে এক অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি অশান্ত গালিবর্ষণই চলতে থাকবে। এটা যেন কেমন রুচিতে বাধে। কটূক্তির পিছনে প্রীতি নেই, আক্রোশটাই প্রধান,—সুতরাং এখানে আর দাঁড়ানো চলে না। ঈশানী নমস্কার জানিয়ে এবার বিদায় নিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এর পর পাহাড়ের আশে পাশে মাঠে-ময়দানে সে-লোকটাকে খুঁজে বেড়ানো মিথ্যে। ঈশানী চললো সোজা ষ্টেশনের দিকে। এই পথটা ধ'রেই শ্রমিক সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ মোটর-ট্রাকে চ'ড়ে যায় 'চিত্তরঞ্জনের' দিকে। নন্দ চললো পিছনে পিছনে।

শান্তনুকে যতখানি মলিন ক'রে তা'র সামনে তুলে ধরা হোলো, সে ততখানি মলিন কিনা সন্দেহ আছে। লোকসমাজে যে-ব্যক্তি নিন্দিত, মেয়েমহলে তার প্রতি বিচার ভিন্ন রকমের। অযোগ্য ব'লেই সে অনাদৃত হবে, একথা সত্য নয়। তবু গুণী ব্যক্তির পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা বেমানান বৈ কি। দেশের কর্ম-জীবনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, আলস্য-বিলাস নিয়ে এর থেকে যে-ব্যক্তি দূরে স'রে থাকবে, তা'র ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়,—এতে আর সন্দেহ কি। শান্তনুর সঙ্গে দেখা হ'লে একথা সে অবশ্যই তাকে বোঝাবার চেষ্টা পেতো।

ঈশানী নানা পথ ঘুরে অবশেষে বাড়ী ফিরে এলো।

রাত্রের দিকে চিঠি লিখতে ব'সে গেল সে রমেনবাবুকে। সে শীঘ্রই যাচ্ছে, তবে এখনও দিনস্থির করেনি। 'গীতালী সঙ্ঘের' উন্নতি হোক, এই তা'র কামনা। সে অনেক পেয়েছে ওদের কাছে,—স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং উপকার। ওদের অজস্র স্নেহে তা'র জীবন পরিপূর্ণ। তবে এবার কিছু-দিনের জন্য সে ছুটি চায়, ছুটি তা'র বড় দরকার। তাকে হয়ত নানা জায়গায় যেতে হবে, এবং নানান্ কারণে কিছুকাল তাকে অজ্ঞাতবাস করতে হবে। এর জন্য আগে থেকেই সে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

চিঠিখানা বন্ধ ক'রে নন্দর হাতে দিয়ে সে বললে, কাল ভোরের ডাকেই যেন চ'লে যায়

অসংখ্য কাজ তা'র প'ড়ে রয়েছে, কোনোটাই শেষ হয়নি। গত দু'মাসের হিসাবপত্র, কাগজের তাড়া গোছানো। ব্যাঙ্কের চিঠি এসেছে দুখানা, জবাব দেওয়া হয়নি। বন্ধুদের অসংখ্য চিঠি অনেকগুলো খোলাও হয়ে ওঠেনি। বইগুলো এলোমেলো ছড়ানো, গোছাবার লোক নেই। প্রসাধনের অসংখ্য মূল্যবান উপকরণ, কিন্তু ওগুলো নাড়াচাড়া করতে আর তা'র মন চায় না।

ঈশানী একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরুপায়ভাবে একখানা মোটা বই নিয়ে তা'র খাটের উপর গা এলিয়ে দিল।

বহু রাত অবধি সে বই নিয়ে জেগে রইলো।

ভোরের দিকে আকাশ সবেমাত্র স্বচ্ছ হচ্ছে, এমন সময় বড় একটা ঘটি হাতে নিয়ে নন্দ বাইরে বেরিয়ে এলো। এমনি সময়ে সে রোজই বেরোয় গয়লাবাড়ীর দিকে। কিন্তু বাগান পেরিয়ে মাঠে এসে পড়তেই দেখলো, অত ভোরে শান্তনু একটি স্যুটকেশ হাতে নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে।

নন্দ বললে, কলকাতা যাচ্ছেন বাবু?

হ্যাঁ,—তোমার দিদিমণি উঠেছেন নন্দ? একবার দেখা ক'রে যেতুম।

নন্দ বললে, তিনি ঘুমোচ্ছেন, অনেক রাত অবধি জেগে পড়াশুনা করেছেন কিনা। উনি শরীরের ওপর বড্ড অযত্ন করেন। ডেকে দেবো তাঁকে?

শান্তনু বললে, ডাকলে বিরক্ত হবেন না ত?

না না, আপনি এসেছেন শুনলেই তিনি ছুটে আসবেন। আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

নন্দ তাড়াতাড়ি ভিতরে যাচ্ছিল, সহসা পিছন থেকে শান্তনু আবার ডাকলো,—শোনো নন্দ—?

নন্দ ফিরে এলো,—কেন, বাবু?

থাক গে, আমি এখন যাই। ওঁর ঘুম ভাঙ্গাবার দরকার নেই।—শান্তনু বললে, কলকাতায় ফিরে গেলে আবার দেখা হবে। আমি তাড়াতাড়ি যাই, টিকিট কেনা বাকি।

শান্তনু দ্রুতপদে চলতে লাগলো।

ওই একই পথে খানিকদূর গেলে গয়লাবাড়ী। সুতরাং নন্দ চললো শান্তনুর সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতার ঠিকানাটা গছিয়ে দিতে নন্দ ভুল করলো না। একথা জানালো, তাদের বাড়ীতে লোকজন আছে বটে, তবে দিদিমণি একলা।

শান্তনু চলতে চলতে প্রশ্ন করলো, একলা কেন ?

উনি ত বরাবরই একলা বাবু! দিদিমণি বলেন, কলকাতায় উনি একলাই এসেছিলেন, কেউ ওঁকে সাহায্য করেনি।

তারপর ? তোমাদের মাইনে-পত্র দেয় কে, নন্দ ?

কেন, উনিই দেন্।

উনি টাকাকড়ি পান্ কোত্থেকে ?—শান্তনু জানতে চাইলো।

নন্দ ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে একবার তাকালো। কি বলছেন, বাবু! আপনি বুঝি শোনেননি কিছু ? ওঁর দুই পায়ের কাছে এসে টাকা জড়ো হয়। সে টাকা খায় কে ?

শান্তনু প্রশ্ন করলো, এত টাকা কেমন ক'রে পান্ উনি ?

নন্দ বললে, হা আমার কপাল! আপনি তাহলে আগাগোড়া কিছুই জানেন না বলুন ?

জানবার চেষ্টাটা খুব ভালো নয়, নন্দ। তাছাড়া বুঝতেই পাচ্ছ আমরা সামান্য সাধারণ লোক। টাকাকড়িওলা লোকের সঙ্গে ভাব-আলাপ থাকলে নানা লোক নানা সন্দেহ করে। বুঝতে পারো ত' ?

গয়লাবাড়ী এসে গেছে। নন্দ একটু আহতকণ্ঠে বললে, বাবু, দিদিমণিকে তেমন মানুষ ঠাওরাবেন না, উনি সাক্ষাৎ দেবী। ওঁর দান-খয়রাৎ দেখলে নাস্তিকেরও মন ফিরে যায়।

শান্তনু হাসিমুখে বললে, তাহলে তোমার দিদিমণিকে বলো, আমিও গিয়ে একদিন সেলাম ঠুকে হাত পেতে দাঁড়াবো। আচ্ছা, আজ চলি।

শান্তনু হনহন ক'রে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। নন্দ একবার থমকে দাঁড়ালো। আশ্চর্য হয়েছে সে। এতদিন ধ'রে এত আলাপের পরেও একজন আরেকজনের সঠিক পরিচয় জানে না, এ তা'র কাছে সত্যই দুর্বোধ্য।

দুধের ঘটি নিয়ে নন্দ ফিরে এসে দেখলো, কাগজপত্র নিয়ে এরই মধ্যে দিদিমণি বারান্দায় ব'সে গেছেন। রামতীরথ চায়ের সঙ্গে প্রাতরাশ দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোধ করি কোনো হুকুমের অপেক্ষায়।

মুখ তুলে ঈশানী বললে, নন্দ, ওবাড়ীতে একবার যা ত? গিয়ে বল্ কাল আমরা চ'লে যাবো সকালের গাড়ীতে। কলকাতায় ওঁদের কোনো কাজ থাকলে আমরা ক'রে দিতে পারবো।

ঘটিটা রামতীরথের কাছে গছিয়ে নন্দ চ'লে যাচ্ছিল, ঈশানী আবার বললে, যদি পারিস অমনি ওবাড়ীর ছোটবাবুকে একবার এখানে ডেকে দিস্।

নন্দ বললে, ছোটবাবু! তিনি যে একটু আগে কলকাতা চ'লে গেলেন এই গাড়ীতে।

কার কথা বলছিস?—ঈশানী মুখ তুলে তাকালো।

শান্তনুবাবুর কথা বলছেন ত? তিনি যাবার আগে ভোরবেলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আপনি তখন ঘুমিয়ে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ঈশানী বললে, আমাকে তক্ষুণি ডাকলিনে কেন?

ডাকতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তিনিই বারণ করলেন।

বারণ করলেন? ও—ঈশানী একেবারে জুড়িয়ে গেল—তাহ'লে থাক, তোকে আর যেতে হবে না। গায়ে প'ড়ে অত উপকার করার আর দরকার নেই। নিজের কাজে যা।

কাগজপত্র ফেলে রেখে ঈশানী নিজেই উঠে চ'লে গেল। ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার। একটা লোক বিনা অপরাধে দিনরাত লাঞ্ছনা সইছে, এবং অপমানের ভাত মুখে দিচ্ছে,—এর থেকে শান্তনু নিষ্কৃতি নিল। শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এ-অপমান বরদাস্ত করা কেমন ক'রে সম্ভব, ঈশানীর জানা নেই। কোথাও কোনো একটা কৈফিয়ৎ এর আছে, সেটা অজ্ঞাত। মনে পড়ছে, গত তিন দিন থেকে মাঝে মাঝে ঈশানী ওবাড়ী থেকে দাদা ও বৌদিদির তীব্র চাপা তিরস্কারের কণ্ঠ শুনেছে। বিস্ময়ের কথা, শান্তনু নীরব। হয় তার কোনো একটা গভীরতর

অপরাধ ওদের কাছে জমা আছে, আর নয়ত সে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ওদেরকে ক্ষমা করতে জানে।

রামতীরথ হাটে যাবার আগে ঈশানীর সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে, আজ মঙ্গলের হাট, মা।

ঈশানী বললে, শোনো রামতীরথ, আজকের মতন সামান্য জিনিস আনো, কাল ভোরে আমরা যাবো। তুমি তাড়াতাড়ি রান্না সেরে মালপত্র গোছাও, পাওনাদারদেরও মিটমাট ক'রে দাও। কাল সকালের এক্‌স্‌প্রেসেই যাবো। ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় আনিয়ে নিয়ো।

যে আজ্ঞে।

ঈশানী তাড়াতাড়ি স্নান করতে চ'লে গেল।

* * *

ট্রেন এসে থামলো হাওড়া ষ্টেশনে। মধ্যাহ্নের রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেছে। যে-শ্রেণীর লোক নব বসন্তকে সম্বর্ধনা জানায়, তা'রা ফাল্গুনের চড়া রোদে নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতার পথে কখনও হাঁটেনি। দুরাশার সঙ্গে নৈরাশ্য, ক্ষুধার সঙ্গে চিত্তগ্লানি—এরা পথে পথে ছড়ানো।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পুল পার হয়ে শান্তনু চললো বাড়ীর দিকে। হেঁটেই যেতে হবে, সন্দেহ নেই। দাদা ও বৌদিদির কল্যাণে গাড়ীভাড়া জুটেছিল বটে, কিন্তু একেবারে গোণাগুণতি—বেকারের পক্ষে ট্রামবাসে চ'ড়ে বাড়ী ফেরাটা বিলাস, দাদা একথা বিশ্বাস করেন। সুটকেসটা ভারী লাগছে বৈ কি। হাত ব্যথা করলে কাঁধে তুলে নিতে হবে। পাইকপাড়ায় পৌঁছবে সে অপরাহ্নে। বেশ ত, কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে চলো, মন্দ কি? যদি ঘর্মাক্ত হও, জামার হাতায় কপালের ঘাম মোছ। 'ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে। নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক, নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।'

কবিতাটা মনে পড়ে গিয়ে শান্তনু তা'র নিজের হাঁটু ছুটোয় বেশ জোর পেয়ে গেল। নাঃ, কিছু রোজগার না করলে আর কিছুতেই চলছে না। কবিতা লিখে টাকা পাবার মতো খ্যাতি তা'র এখনও হয়নি। ফটোগ্রাফী ছাড়া গতি

নেই। কিছুদিন আগে দুটি শুঁড়ির ছেলেকে বাড়ীতে পড়াবার একটা কাজ তার জুটেছিল। দুবেলা খাওয়া, তাদের বাড়ীতে থাকা, সামান্য কিছু হাতখরচ। বড় জোর দশ টাকা। এর চেয়ে চাকর ভালো। ছেলে পড়াবার বিরক্তিকর দায়িত্ব নেই,—ফাই-ফরমাস খাটো,—মাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা। মনিবের গৃহিণী যদি অম্লশূলে কি বাতব্যাধিতে ভোগেন, তবে পঁয়ত্রিশ টাকাও পাওয়া যায়।

তামাসা থাক্। সুটকেসটা আর সে বইতে পারছে না। এটা মিহিজামের পথ হ'লে ভালো হোতো, ঈশানীর ওই চাকরটাকে পাওয়া যেতো। যাক্, বেঁচে গেছে সে। আর একটু হ'লেই তা'র পদস্খলন হোতো ঈশানীর ফাঁদে পা দিয়ে। কিন্তু মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারা গেল না। অবশ্য ওরা বড়লোক, খেয়াল-খুশি নিয়ে ওরা ঘর করে। ওরা চড়ুইভাতিতে খরচ করে পাঁচশো টাকা, পুতুলের বিয়ে দেয় বাজনা বাজিয়ে, কুকুর কিনতে বিলেতে ছোটে, কিন্তু ভিখারী ভিক্ষা চাইলে ওরা গভর্নমেণ্টকে গালি দিয়ে বলে, দেশ থেকে ভিখারী তাড়াও। 'এ আমার এ তোমার পাপ, বিধাতার বক্ষে এই তাপ বহু যুগ হ'তে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়। ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের···'

আবার কবিতা আসে মাথায়। শান্তনু হন হন ক'রে চলতে লাগলো। মোট কথা, কিছু উপার্জন করা দরকার। উপার্জন করলেই সব ঠাণ্ডা! দাদার কণ্ঠে মধু ঝরতে থাকবে, বৌদিদির বিগলিত স্নেহধারা,—এমন কি ওই যে সেদিনের শ্রীমতী ঈশানী রায়,—তিনি পর্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখবেন। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটিকে বুঝতে পারা গেল না কোনোমতেই। সত্যি, মিহিজাম অবিনশ্বর হয়ে রইলো তা'র অন্তরে। এমন একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা,—যেটা চিরকাল আপন পরমার্থকে বহন ক'রে চলবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পিছনে ঈশানীর কী ভীরু চাহনি, কণ্ঠে প্রসন্ন স্নেহের কী আশ্চর্য মাধুর্য। যেমন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক থাকে অন্ধকার আকাশে মানুষের নাগালের বাইরে, মিহিজাম তেমনি রইলো তা'র জীবনে। ঈশানীর সঙ্গে ওই দিগন্তজোড়া প্রান্তর, ওই বাসন্তী রাত্রির মায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্না, বন-বাগানের ওই জনবিরল একান্ত নিভৃত পরিবেশ,—এরা রয়ে গেল জীবনে চিরকাল নিগূঢ় ক্ষুধার মতো।

শান্তনু বাড়ী এসে পৌঁছলো অপরাহ্ণকালে। কপাল থেকে ঝরছে তা'র ঘাম, প্রিয়দর্শন চেহারাটা আগাগোড়া ক্লান্তি আর অবসাদে ভরা ; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় চোখ দুটো ব'সে গেছে।

সরু পথ পেরিয়ে ভিতর দিকে তাদের সেকালের ভদ্রাসন। সামনে কাঁচা মস্ত উঠোন, আশে পাশে চূণ-বালিধ্বসা ঘরের দেওয়াল—অত্যন্ত জরাজীর্ণ আবহাওয়া। এ-বাড়ীতে তারা পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দা। একটিমাত্র ভগ্নী ছিল, তা'র বিয়ে হয়ে কোন্ গ্রামের শ্বশুরবাড়ীতে চ'লে গেছে, দশ-বারো বছর হোলো তা'র কোনো খোঁজ-খবর নেই। বাল্যকাল থেকে শুনে এসেছে, এ-বাড়ীর একাংশের সে নাকি মালিক—কিন্তু এও শুনছে আজ বিশ বছর ধ'রে যে, মামলা-মোকদ্দমায় আর ট্যাক্স-খাজনার দেনায় এ-বাড়ীর মাথা নাকি ছাপানো। সুতরাং এ সম্পত্তির অংশ পাবার আশা-ভরসা তা'র বড়ই কম।

শান্তনু ফিরে এসেছে মিহিজাম থেকে, এ সংবাদ অবশ্য ভিতরে তখনই পৌঁছলো। কিন্তু হঠাৎ একটা চাপা কোলাহল তা'র কানে এলো। অত্যন্ত ক্লান্ত সে, এখন আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করার মতো তা'র মন নেই। জামাটা ছেড়ে সে তক্তার উপর গা ছড়িয়ে দিল। প্রায় তিন সপ্তাহ সে বাইরে ছিল,—ঘরে কেউ ঢোকেওনি, ঝাঁটও দেয়নি। স্যাঁতসেঁতে গন্ধটা তা'র নাকে আসছে। কিন্তু চুপ ক'রে সে প'ড়ে রইলো অনেকক্ষণ। বোঝা ব'য়ে হাতখানা এখনও কনকন করছে।

সমস্ত বাড়ীটা তা'র বিরুদ্ধে। জেঠাইমা, মামা এবং অন্যান্য জেঠতুতো ভাইবোন, এ বাড়ীর আশ্রিত এক জ্ঞাতি ভগ্নীপতি, একপাল নাবালক,—সব মিলিয়ে মস্ত পরিবার। শান্তনুর অংশে শান্তনু একা। একা ব'লেই তা'র অস্তিত্বটা বাড়ীর সকলের পক্ষে অসুবিধাজনক।

ঘরের বাইরে কে-কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। চাপা কণ্ঠ ও হাসাহাসি আশেপাশে। সহসা ওদেরই ভিতর থেকে তা'র জেঠতুতো বিবাহিতা বোন মিনু ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে হাসলো,—ছোড়দা, তুমি বিয়ে করলে কবে ?

শান্তনু শুয়েছিল, উঠে বসলো।—বিয়ে ? মানে ?

মিন্টু বললে, তা নয়ত কি ? একটা বৌ আছে তোমার, কেউ কিচ্ছু জানতে পারেনি এতদিন। তুমিও চেপে আছো।

শান্তনু ধমকে উঠলো, কি বকছিস ?

হঠাৎ জেঠাইমা ঘরে ঢুকলেন। চেঁচিয়ে বললেন, ধমক অমনি দিলেই হোলো ? সিঁদুর পরা বৌ তোমার খোঁজে আসছে দিনে তিনবার, বিয়ে করোনি আবার কি ?

মিন্টু বললে, ডুবে-ডুবে বুঝি এতদিন জল খাওয়া হচ্ছিল ?

শান্তনুর প্রিয়দর্শন সৌম্য চেহারাটা দেখতে দেখতে কঠোর হ'য়ে উঠলো। বললে, এ সব তোমাদের মিথ্যে কথা, ধাপ্পাবাজি !

জেঠাইমাও আগুন হয়ে উঠলেন।—ধাপ্পাবাজি ? কুড়ি দিনে কুড়িবার এসে তোমার খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছে, পাড়ায় পাড়ায় জানাজানি, চারিদিকে হাসাহাসি,—সবার মাঝখান দিয়ে বৌ এসে বাড়ীতে ঢুকে কান্নাকাটি ক'রে যাচ্ছে,—একে ধাপ্পাবাজি কে বলে ?

শান্তনু বললে, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে, জেঠাইমা।

আমিও চাইনে, শান্তনু। কিন্তু এ-বাড়ীতে কোনো ইতিজাতের মেয়ে নিয়ে এসে উঠবে, এও আমি চাইনে ব'লে রাখলুম।

জেঠাইমা হন্ হন্ ক'রে ভিতরে চ'লে গেলেন। মিন্টু গেল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। কে একজন যাবার সময় ব'লে গেল, বেশ ত, বেলা গড়িয়ে এলো, বৌ এখনি আসবে—তখন হাতে-নাতে প্রমাণ।

শান্তনু কোনো কিছু গ্রাহ্য করলো না। তক্তার উপরে পুনরায় কিছুক্ষণ সে প'ড়ে রইলো, তারপর আবার উঠলো। স্নানের আয়োজন ক'রে এক সময় সে গিয়ে স্নান ক'রে এলো। সমস্ত সময়টা আড়াল থেকে সবাই যে তা'র গতিবিধি লক্ষ্য করছে, এটা সে বুঝতে পারছিল বৈ কি। চাপা হাসি আর টুক্‌রো মন্তব্য এধার-ওধার থেকে তা'র কানে আসছিল।

কিছুক্ষণ পরে ওই মিন্টুই এলো ভাতের থালা হাতে নিয়ে। থালা নামিয়ে আসন পেতে দিয়ে সে বললে, রাগ ক'রো না ছোড়দা, আগে দুটি খেয়ে নাও।

জলজ্যান্ত একটা মেয়ে তোমার বৌ ব'লে পরিচয় দিয়ে বাড়ীতে এসে দাঁড়াচ্ছে, এত বড় একটা ঘটনার সবটাই মিথ্যে তুমি বলতে চাও?

শান্তনু আসনের উপর ব'সে ভাতের থালায় হাত বাড়ালো। তারপর বললে, জলজ্যান্ত মেয়েটা হয়ত সত্য। কিন্তু বৌ আর বিয়ে কোনোটাই সত্য নয়!

তুমি বিয়ে করোনি? সুষমা তোমার বউ নয় বলতে চাও?

না।

তাহলে কী কাণ্ড বাধিয়েছ, শুনি? কে ওই মেয়েটা?

কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে এক ঢোক জল খেয়ে এবার শান্তনু বললে, এ রকম ক'রে আমাকে আক্রমণ করা তোমাদের উচিত হয়নি। জেঠাইমা শান্তভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন।

মিনু বললে, কেমন ক'রে তিনি শান্ত হবেন? চারদিকে যে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে। তুমি চৌধুরী বাড়ীর ছেলে, পাড়ায়-পাড়ায় এ-বাড়ীর নাম-ডাক, গিজগিজ করছে আত্মীয়-কুটুম্ব,—মায়ের মেজাজ কেমন ক'রে ঠিক থাকবে? এবার বলো দিকি ব্যাপারটা আগাগোড়া?

বিয়ে আমি করিনি, মিনি।

বেশ। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, একটা মেয়ে হঠাৎ মাথায় সিঁদুর দিয়ে এসে বলবে, সে তোমার বৌ? তুমি ত' লেখাপড়া জানা ছেলে! এটার মধ্যে কি কোনো কথাই নেই, তুমি বলতে চাও?

মিনু বেশ গুছিয়ে বসলো। শান্তনু বললে, তুই বুঝি ভাতের থালা সামনে দিয়ে মন ভুলিয়ে কথা বা'র করতে চাস?

মিনু বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার বোকামি। যেমন তুমি বোকা চিরকাল! চাপা রইলো কিছু? হাঁড়িটা যে হাটের মাঝখানেই ভাঙলো, ছোড়দা? লুকোতে পারলে? গেল কালও সে মেয়েটা তোমার খোঁজ নিতে এসেছিল, তা জানো?

শান্তনু বললে, তোরা কি সবাই মিলে শুনতে চাস যে, আমি বিয়ে করেছি? তাহ'লে শোন্, বিয়ে আমি করিনি।

তা'র কপালে তাহ'লে সিঁদুর উঠলো কেমন ক'রে ?

শান্তনু বললে, এক পয়সা দামের সিঁদুর যে-কোনো মসলার দোকানে পাওয়া যায়। যে-কোনো মেয়ে সেটি কিনে কপালে মাখতে পারে। ওটার নাম নারী-স্বাধীনতা।

শান্তনু উঠে হাত ধুতে চলে গেল। মিনু চুপ ক'রে ব'সে রইলো। মিনিট দুই পরে ফিরে এসে শান্তনু জামাটা গায়ে দিয়ে বেরোবার উদ্যোগ করলো।

মিনু বললে, তুমি চ'লে যাচ্ছ, কিন্তু সে-মেয়েটা এলে এবার আমরা কি বলবো ?

থমকে দাঁড়ালো শান্তনু। বললে, এই কথা বলো যে, এ বাড়ীতে আর যেই থাক্, তোমার স্বামী থাকে না।

একথা সে শুনবে ?

শান্তনু বললে, তা'হলে আরেকটু কড়া ক'রেই কথাটা শুনিয়ে দিয়ো। বলো, তুমি পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তিকে স্বামী মনে করতে পারো, কিন্তু পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তি তোমাকে স্ত্রী ব'লে মনে করে না।

দ্রুতপদে শান্তনু বেরিয়ে চ'লে গেল।

একখানা কাগজের আফিসে কতকগুলি ফটোর জন্য কিছু টাকা শান্তনুর পাওনা ছিল। সেই টাকাগুলি আদায় করতে লাগলো ঘণ্টা দুই। তারপর আর তা'কে রোখে কে! মাঝে মাঝে হঠাৎ সে ধনবান হয়ে ওঠে। যেমন আজকে। কিছুদিন আগে এক শিক্ষকের বেনামীতে নোট বই লিখে দিয়ে বেশ কিছু টাকা সে পেয়েছিল। বাড়ীতে ফিরে সেদিন সে মস্ত ভোজ দিয়েছিল।

কিন্তু আজকে তা'র বাড়ীর অপ্রীতিকর ঘটনায় সর্বশরীর তা'র মাঝে মাঝে ঘুলিয়ে উঠছিল। সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশানী সেদিন তা'কে কথায় কথায় ব'লেছিল, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা না থাকলে মানুষ হয়ে ওঠে ঘটনার ক্রীড়নক। নিজের অজ্ঞাতেই নিজের দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করে—যেটার পরিণাম তা'র উপলব্ধির বাইরে। তা'র অনিচ্ছায় তাকে নিয়েই তা'র জীবনের ইতিহাস রচিত হচ্ছে, যেটার ওপর তা'র কোনো হাত নেই।

কালীঘাটের আশে-পাশে নানা পথ চ'লে গেছে নানাদিকে, তারই কোনো একটা গলিতে ঢুকে শান্তনু সোজা এসে পৌঁছলো এক বাড়ীতে। সামনে উঁচু রোয়াক, তারই এক প্রান্তে দরজা। ভিতরের উঠোনের চারপাশে কয়েকটি গৃহস্থ-ভাড়াটের বাসাড়ে ঘরকন্না। উঠোনে এসে দাঁড়ালে ভিতরের ঘরগুলো অন্ধকার মনে হয়।

শান্তনুকে দেখে একটি বয়স্কা বিধবা মহিলা মাথায় একটু ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এলেন। শান্তনুর সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠ চেহারার নিজস্ব একটা আকর্ষণ ছিল। সেজন্য আশেপাশে দু'একটি গৃহস্থের মেয়েছেলে একবার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে গেল। শান্তনুকে সবাই চেনে।

শান্তনু বারান্দার শানের উপরে উঠে এসে কথা পাড়লো। একটু উত্তেজিত-ভাবে বললে, আপনার মেয়ে নাকি আমার বাড়ীতে প্রায় রোজই আনাগোনা করছিল? ব্যাপার কি?

বিধবা মহিলা বললেন, ঘরে এসে বসো, বাবা। বুঝতেই পাচ্ছ, তোমার খোজখবর না পেয়ে সুষমা বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কেন বলুন ত?—সোজা তাকালো শান্তনু। তা'র মনে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছিল, সেটার উত্তেজনা তা'র মুখের ওপর সুস্পষ্ট।

আমি সুষমাকে ডেকে দিই, বাবা।—মহিলা দ্রুতপদে পাশের ঘরে গেলেন।

মিনিট তিনেক, তারপরেই একটি তরুণী মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সহাস্যমুখে। শ্যামবর্ণ চেহারা, বছর কুড়ি-বাইশ বয়স, মুখখানায় লাবণ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কপালে সিঁদূরের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু শান্তনুর মুখে গাম্ভীর্যের কঠিন ছাপ দেখে সুষমা নিজেকে সম্বরণ করলো। বললো, ভেতরে এসো। মায়ের মুখের ওপর কিছু বলোনি ত?

শান্তনু বললে, কিছু বলিনি, কিন্তু এবার বলতে বাধ্য হবো। কী কাণ্ড তোমরা বাধিয়েছ বলো ত?

আঃ, আস্তে কথা বলো। তুমি ব'লে গিয়েছিলে তিন দিন বাদে ফিরবে। কুড়ি-বাইশ দিন করলে কেন?

তা'তে হয়েছে কি? আমার জন্যে কোনো মেয়ে অস্থির হবে, এটা শুনতে আমার নিজের ভালো লাগে না।—শান্তনু বললে, তাছাড়া তুমি নাকি মাথায় সিঁদুর দিয়ে ও-বাড়ীতে ব'লে এসেছ, আমি তোমার স্বামী? এর মানে কি? তোমার মা এ বিষয়ে কি বলেন? তুমি আমার স্ত্রী—একথা কবে প্রমাণিত হোলো?

চাপাকণ্ঠে শান্তনু কথা বলছিল। তবু একটু ভয় পেয়ে সুষমা বললে, চেঁচিয়ো না বলছি! আমাকে সবাই যখন জিজ্ঞেস করে তখন আমি কি জবাব দিই? যাবার সময় তুমি আমার মাকে ব'লে গিয়েছিলে যে, সুষমার জন্যে আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ওর কোনো একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে! তোমার কথায় তিনি যা ভেবে নেবার, তাই নিয়েছেন!

শান্তনু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, তা'তে কি এই বোঝায়, তুমি আমার কাঁধে চ'ড়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে? আমার বাড়ীতে যেতে তোমাকে কে বলেছিল? সিঁদুর মাথায় দিলে কেন তুমি? আমাকে স্বামী ব'লেই বা সেখানে জাহির ক'রে এলে কেন? মতলব কি তোমাদের?

সুষমা একটু ভীত হয়ে তাকালো বাইরের দিকে। তারপর বললে, থাক গে, এসব কথা এখানে দরকার নেই। বাইরে চলো, তারপর আগাগোড়া ব্যাপারটা আমি সব বলবো। চা খাবে?

শান্তনু বললে, না।

তবে দাঁড়াও, আমি আসছি।—এই ব'লে সুষমা পাশের ঘরে গেল। সে ঘরে সুষমার মা ছিলেন,—দুজনের মধ্যে কি যেন কথাবার্তা হোলো। তারপর মিনিট পাঁচেক পরে সুষমা এ-ঘরে এসে দাঁড়ালো। কুমারী মেয়ে যেমন বেরোবার সাজসজ্জা করে, ঠিক তেমনি। বললে, চলো।

পথে বেরিয়ে গলির মোড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় এসে সুষমা এক সময় বললে, তোমাকে আমি জব্দ করবো, একথা তুমি ভেবে নিয়েছ কেন?

শান্তনু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, বাড়ীতে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই, সে-খবর রাখো?

তোমার বাড়ী না গিয়ে আমি কি করতে পারতাম ?

তাই ব'লে সিঁদুর প'রে গেলে ? স্ত্রী ব'লে জানিয়ে এলে ?

সুষমা বললে, তাছাড়া কোন্ সুবাদে গিয়ে দাঁড়াবো তোমার বাড়ীতে ? আমার এখানে ত' আর সিঁদুর পরিনি ! ঘোমটাও দিইনি। মা জানে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে। যদি না করো, নাই করলে !

কিন্তু আমার বাড়ীর লোক কি বলবে ?

সুষমা এবার একটু হাসলো। বললে, তোমার একটু নিন্দে হয়েছে, এই ত। তুমি কবি, শিল্পী, একটু-আধটু অখ্যাতি না থাকলে তোমাকে লোকে যে গ্রাহ্য করবে না। চলো, বাগানে ঢুকি। আমাদের চেনা বেঞ্চিতে গিয়ে বসি।

ওরা দুজনে বাগানে এসে ঢুকলো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আলো জলেছে চারদিকে। গাছের আড়ালে একখানা বিশেষ বেঞ্চে ওরা এসে বসলো। পরিহাস শুনেও শান্তনু চুপ ক'রে রইলো। সুষমা বললে, আমার খুড়তুতো ভাই যোগেনদাকে তুমি জানো। ও আমাদের সব খরচ চালায়। এখানে থাকাও আর আমাদের চলছে না। ছোট ভাইকে মা স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছে। দাদা আর দিল্লী থেকে খরচ পাঠায় না। সেখানে নাকি বৌদির খুব অসুখ। আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে মা নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে যেতে পারতো।

শান্তনু বললে, তোমার কি ব্যবস্থা ?

যা হোক একটা কিছু। তোমাকে ত কতবার বলেছি, আমাকে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দিলে অন্ততঃ নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুবিধে পাই !

দক্ষিণের হাওয়া আসছে মৃদু মৃদু। মিহিজামের আকাশ থেকে সেই চাঁদ এসেছে শান্তনুর সঙ্গে। কিন্তু সেইদিকে কা'রো ভ্রূক্ষেপ নেই।

শান্তনু বললে, তোমাদের সব রকমের সমস্যা আছে। কিন্তু আমাকে সেই জালে জড়াচ্ছ কেন ? নিজেই ভাব করলে আমার সঙ্গে, আমাকে টানতে-টানতে ঘোরালে নানা জায়গায়, যখনই চ'লে যেতে চেয়েছি তখনই পিছু পিছু ধাওয়া করেছ,—এখন আবার সিঁদুর মেখে বাড়ীতে গিয়ে ব'লে এলে, আমি তোমার স্বামী ! এর নাম বুঝি তোমাদের ভালোবাসা ?

সুষমা বললে, আমাকে কি তোমার একটুও ভালো লাগে না?

শান্তনু বললে, ভালো লাগলেই বা কি? এমন কি কোনো কারণ ঘটেছে, যার জন্যে তুমি আমাকে স্বামী ব'লে মনে করতে পারো?

সুষমা বললে, তুমি আমার ভালোবাসাকে পায়ে থেঁৎলেছ এতদিন, তা জানো?

সেজন্যে নিজেকেই তুমি ধিক্কার দাও, আমাকে নয়। তোমার ভালো হোক, এই আমি চেয়েছি। তুমি আমাকে ভালোবেসে পাগল হও, এ আমি চাইনি।—শান্তনু বললে, পাছে তোমার মনে কোনোদিন বিকার বা বিভ্রম আসে, এজন্যে তোমার একটি আঙুলও আমি ছুঁইনি।

সুষমা বললে, তুমি আমাকে ঘেন্না করো, সে আমি জানি। মাকে আমি সব কথাই এবার বুঝিয়ে বলবো। এও বলবো যে, মা, তুমি শান্তনুর দুরাশা ত্যাগ করো।

শান্তনু বললে, সে-দুরাশা তুমিই জাগিয়েছ তাঁর মনে।

হ্যাঁ, আমারই ভুল। চোরাবালির ওপর ঘর বাঁধতে গিয়েছিলুম। প্রথম দিন কেন তুমি হাসিমুখে তাকিয়েছিলে? আমি যখন নেমন্তন্ন করলুম, তুমি মুখ ফিরিয়ে কেন চ'লে যাওনি?

অনুশোচনায় সুষমার চোখে কান্না এলো।

শান্তনু বললে, আমার ভদ্রতাকে ভালোবাসা ব'লে ভুল করেছ তুমি, সে কি আমার দোষ? একেই বুঝি তোমরা প্রেম বলো? দু'দিন একটু মিষ্টি ক'রে আলাপ করলেই অমনি তোমরা ভাবো, প্রেমে প'ড়ে গেলুম? ছেলেরা ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে, দুঃখ সয়, উপবাস করে, জগদ্দল পাথরের বোঝা ব'য়ে বেড়ায়, ঘাম গড়ায়, রক্ত ঝরায়, বুক-ফাটা চোখের জলে দেনা শোধ করে,—সেদিকে তোমাদের চোখ পড়ে না?

আঁচলে চোখ মুছে সুষমা বললে, তোমাদের জন্যেই ত' আমাদের দুঃখ।

না।—শান্তনু বললে, তোমাদের আরামের লোভ, ঘরকন্নার লোভ, তাই দুঃখ পাও। কোনোমতে একটা স্বামী পেয়ে গেলেই ঘরে উঠবো, এই

অভিসন্ধি নিয়ে তোমরা মানুষ হও। পুরুষ পছন্দ করবে, তাই লেখাপড়া শেখো। গান শেখো পুরুষের মন পাবার জন্যে। নাচলে পুরুষ আনন্দ পায়, এ তোমরা জানো। সোনার গয়না গায়ে চড়ালে আজকাল ছেলেরা তামাসা করে, তাই তোমরা গয়না খুলে ফেলছো। এই পরের মুখ চাওয়াটা ত্যাগ করো, নৈলে তোমাদের উন্নতি নেই।

সুষমা বললে, তুমি ত' মিহিজাম থেকে একখানা চিঠিও লিখতে পারতে!

কেন লিখবো?

মাঝে মাঝে চিঠি পেলে কি আর তোমার বাড়ীতে যেতুম?

তোমার যাওয়ার ফলে এই হোলো যে, ও-বাড়ী ছেড়ে আমাকে চ'লে যেতে হবে শীঘ্র।

উদ্বিগ্ন হয়ে সুষমা বললে, কোথায় যাবে?

শান্তনু বললে, যাবো যেখানে খুশি। তুমি তা'র কৈফিয়ৎ নাই নিলে!

তুমি কি সত্যিই চাও না, আমি তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি?—সুষমা মুখ তুলে তাকালো।

শান্তনু পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব দিল, অন্ধ আকর্ষণ বাদ দাও, তোমার পারিবারিক সমস্যায় আমাকে জড়িয়ো না, কথায় কথায় ভালোবাসার কথা তুলো না। তা হ'লেই আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে।

সুষমা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তারপর এক সময় নিজের মনেই বললে, আমার আর কোনো উপায় নেই। যোগেনদা তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচে। কাকার ভরসা একেবারেই নেই। দাদা হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ছোট ভাইটা মানুষ হবে না। আমার নিজের একটা ব্যবস্থা হ'লেও অনেকটা সুবিধে হোতো। কিন্তু সব দিক অন্ধকার।

আবার দুজনে চুপ। চাঁদ এসেছে প্রায় মাথার ওপর। মস্ত বাগানটা ধীরে ধীরে জনবিরল হয়ে আসছে। দুজনের জীবনে আশা-আশ্বাস বিশেষ কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। শান্তনু এক সময় গা ঝাড়া দিল। বললে, এবার আমি উঠি।

উঠে দাঁড়াবার আগ্রহ সুষমার বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। শুধু বললে, কাল আবার আসছো ত?

রোজ রোজ আসার কিছু দরকার দেখিনে।

তুমি কি না এসে আমাকে ব্যস্ত করতে চাও?

শান্তনু বললে, তুমি নিজের ওপরে জোর পাও, এই আমি চাই। আমি এলে তোমার কাজ হবে না। তুমি একা ভাবো তোমার ভবিষ্যৎ, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি,—আমার ভরসা রেখো না। যদি কখনও তোমার উপযুক্ত কাজকর্মের সন্ধান পাই, আমি নিজেই এসে জানাবো।

অনুযোগ ক'রে সুষমা বললে, একলা আমি কেমন ক'রে আমার উপায় স্থির করবো, তা কই বললে না?

ঘা খাবে, হোঁচট খাবে, দুঃখ-দুর্দশা সইবে—দেখবে তাদেরই ভেতর থেকে নিজের উপায় খুঁজে পাচ্ছ।—শান্তনু একটু অধীর হয়ে বলতে লাগলো, কিন্তু আর যাই করো দয়া ক'রে কপালে সিঁদুর লেপে আমার বাড়ী আক্রমণ করো না।

এবার সুষমা উঠে দাঁড়ালো। দু'পা এগিয়ে যেতে যেতে বললে, শিক্ষা, আমার খুবই হোলো। যদি আমার কোনো উপায় থাকতো তোমাকে ঠিকই ছেড়ে দিতুম।

শান্তনুও অগ্রসর হোলো। বললে, ছাড়তে তোমাকে বলিনি। আমিও তোমার মুখ দেখবো না, এমন প্রতিজ্ঞাও করিনি। দুজনেই থাকি, হোক না দেখাশুনো মধ্যে মাঝে! কিন্তু তোমার ওই প্রেম আর প্রণয়ের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এর শৃঙ্খল আমার সইবে না। তবে আবার আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার কোনো একটা কাজ-কর্মের জন্য আমি সত্যি সত্যিই মন দিয়ে চেষ্টা করবো।

কম্পিতকণ্ঠে সুষমা বললে, কোনোদিন তোমাকে যদি দেখবার ইচ্ছে হয়?

আমি নিজেই আসবো, তুমি যেয়ো না। তুমি গেলেই লোকলজ্জা, আমা

মন আরো বিরূপ হয়ে উঠবে। মেয়ে আর ছেলে—এক সঙ্গে দেখা হ'লেই ঝঞ্ঝাট আর গণ্ডগোল। এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও।—শান্তনু পুনরায় বললে, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দুজনে বাগান থেকে বেরিয়ে এলো।

ট্রাম লাইনটা পেরিয়ে এপারের ফুটপাথে উঠে শান্তনু বললে, ভালোবাসা সহজ—যেখানে বাস্তব সমস্যা প্রবল নয়। অনেক কবি আর শিল্পী আছে যারা মনের মতন চাকরি পেলে আর কাব্য শিল্প নিয়ে মাথা ঘামায় না। অনেক প্রেমিকা আছে যারা দুটি একটি সন্তানের জননী হলে প্রেমের কথা ভুলে যায়। অর্থ নৈতিক দুরবস্থার জন্যে যদি কোনো মেয়ে প্রণয়ের নামে পুরুষ মানুষের অবলম্বন খোঁজে, তাকে কি সহজ ভালোবাসা বলবে তুমি? একথা আমি বিশ্বাস করি, সুষমা, তুমি যেদিন উপার্জন ক'রে তোমার সংসারের অভাব ঘোচাতে পারবে, সেইদিনই তোমার এই সব প্রাণ-সমস্যার প্রতিকার হবে।

সুষমা আর কোনো সম্ভাষণ জানালো না। গলির মুখের কাছে এসে শান্তনু বললে, এবার আমি যাই। আমি নিজেই ঠিক সময়ে তোমার খবর নেবো।

একটি কথাও সুষমা বললে না এবং একটি বারও আর মুখ ফেরালো না। শান্তনু চ'লে গেল।

মেয়েটা অবুঝ, মেয়েটা সরল,—সেই কারণে আপন হঠকারিতার সম্ভাব্য পরিণামটা বুঝতে পারেনি। শান্তনু নিরুপায় বেকার, কিন্তু যদি তার হাতে কোনো উপায় থাকতো তবে এই মেয়েটির কল্যাণকর্মে সে নিজেকে নিয়োজিত করতো। এ মেয়ে অতি সাধারণ, অত্যন্ত সহজবোধ্য, চিরকালের অবলা। ভান-ভণিতা নেই জীবনে, বিলাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, তারুণ্য-সজ্জায় পুরুষের মন ভোলাবার চেষ্টা করে না, প্রণয়-বিলাপের গদগদ ভাষা শেখেনি কোনোদিন। এরা নিতান্তই স্নেহের বস্তু।

শান্তনু এক পথ থেকে গেল অন্য পথে। প্রত্যাখ্যান থেকে এসেছে তার প্রতিক্রিয়া। সমস্ত মনটা তা'র বেদনায় টনটন করছে। তা'র একমাত্র কামনা রইল, সুষমার দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচুক, ওর ভবিষ্যৎ আনন্দময় হোক।

৩

বেকারের পক্ষে সময়ানুগত্য রক্ষা করার কথা ওঠে না। কোনো একখানা বই নিয়ে অধিক রাত্রি জাগা, তারপর অনেক বেলায় বিছানা ছেড়ে ওঠা। প্রভাত সূর্য কা'কে বলে সেটি জানা নেই। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে শান্তনু ঘন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল।

অনেকক্ষণ হ'তে চললো, বাইরে কি যেন একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। শান্তনু সেদিকে একবার চোখ খুলে আবার পাশ ফিরে নাক ডাকালো। তথাকথিত 'বৌ'কে সে নিষেধ ক'রে দিয়ে এসেছে, সুতরাং আর কোনোই উদ্বেগের কারণ নেই। এমন তুরীয় 'স্ত্রী' আর ক'জনের ভাগ্যে ঘটে, বলাও কঠিন।

বাইরে একটা কথাবার্তা চলছিল। এই নোংরা গলির মধ্যে ভোরের দিকে এক ঝাড়ুদার ছাড়া আর কেউ ঢোকে না এবং তা'রা কলের পুতুলের মতো কাজ করে চলে যায়।

কে যেন এক ব্যক্তি এসে একটি বিশেষ নম্বরের বাড়ী খুঁজছিল এবং এ-বাড়ীতে নম্বর লটকানো না থাকলেও শান্তনু চৌধুরী আছে কিনা এই নিয়ে একটা আলোচনা চলছিল। পাড়ার কোনো কোনো নাবালক এই ভোরবেলায় এ-বাড়ীর কড়া নাড়ছে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শান্তনুকে জাগতে হলো। তা'র ধারণা, ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। কিন্তু আশ্চর্য, কোনো মতেই তা'র স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে চায় না। তা'র প্রতি অনেকের আক্রোশ এই কারণে যে, এ-বাড়ীর কা'রো সঙ্গে তা'র চেহারার সাদৃশ্য নেই, সে একেবারে দলছাড়া গোত্রছাড়া। সে যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ পাকায়, তাহ'লে এক জেঠিমা ছাড়া আর সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বাড়ীর কেউ এখনও বিছানা ছাড়েনি। শান্তনু শোয় বাইরের দিকের পরিত্যক্ত নোংরা ঘরখানায়,—যেখানা ছেড়ে গেলে একমাত্র গোয়াল ঘর হ'তে পারে! বৌদিদি বলেন, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। উপমা প্রয়োগে বাঙ্গালী মেয়ের জুড়ি নেই,—বৌদির অন্তর্দৃষ্টি একেবারে নিখুঁৎ।

মুখ ধুয়ে জামাটা গায়ে চড়িয়ে শান্তনু বাইরে এসে একেবারে হতভম্ব। সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমান্ নন্দ। নন্দও নত নমস্কার জানিয়ে কুশলবার্তা বিনিময় ক'রে অবশেষে নিবেদন করলো, এক্ষুণি আপনাকে যেতে হবে, ছোটবাবু।

শান্তনু বললে, কোন্ চুলোয়, নন্দ? এত ভোরবেলায় মুরগী ছাড়া আর কেউ ওঠে না, তা জানো? কোথায় আমাকে নিয়ে গিয়ে জবাই করতে চাও?

নন্দ জিভ কেটে বললে, ছোটবাবু, ওকথা বলতে নেই। আমাকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন রাত থাকতে উঠিয়ে, পাছে বেলা হ'লে আপনি বেরিয়ে যান। সেখানে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন। যেমন আছেন এইভাবেই চ'লে আসুন।

শান্তনু বললে, দশমাইল দূরে গিয়ে চা খাবো সকালবেলায়? সেই চা চিনি দিয়ে না মধু দিয়ে তৈরী, নন্দ? কই, নেমন্তন্নর পত্র কোথায়?

নন্দ বললে, চিঠি দিলে পাছে আপনি বেঁকে বসেন, সেজন্য গাড়ী দিয়ে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে। চলুন ছোটবাবু, চা খেতে দেরি হ'লে আপনার শরীর খারাপ হবে।

বাঃ, নন্দ, তুমি ত' দিব্য সুশিক্ষিত কিঙ্কর! দাঁড়াও, চটি জোড়াটা পায়ে দিয়ে আসি।

গলির বাইরে একখানা মস্ত মোটর দাঁড়িয়েছিল। দুজনে এসে গাড়ীতে উঠলো। নন্দ যথারীতি বসলো ড্রাইভারের পাশে। গাড়ী ছুটলো ঊর্দ্ধশ্বাসে দক্ষিণ কলকাতার দিকে। নতুন রাস্তাটা ধ'রেই চললো—যে রাস্তা দিয়ে সেদিন শান্তনু স্যুটকেস ঘাড়ে ক'রে অত রৌদ্রে হেঁটে এসেছিল হাওড়া ষ্টেশন থেকে। প্রভাতকালের কলকাতার পথঘাট সুন্দর, প্রথম আবিষ্কার করলো শান্তনু।

মিনিট কুড়ি লাগলো পৌছতে। মস্ত বড় বাড়ীর গেটের মধ্যে গাড়ী এসে ঢুকলো। সামনের বাঁধানো উঠোনের কোণ দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে

দোতলার দিকে। গাড়ী থেকে নেমে নন্দকে অনুসরণ ক'রে শান্তনু সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে চললো। নীচের ফ্ল্যাটে থাকে এক ধনী পাঞ্জাবী পরিবার। একটি পায়জামা পরা মহিলা তাদের দেখে আবার ভিতরে গেল।

দোতলায় উঠে সামনেই খোলা বারান্দা দক্ষিণমুখী। রক্তিম রোদের আভা এসে পড়েছে সেখানে। আশে পাশে অন্যান্য বাগানবাড়ীর গাছের জটলা. তাদেরই ভিতরে প্রভাতী পাখীর কাকলী তখনও চলছে।

নন্দর সাড়া পেয়ে দ্রুতপদে ঈশানী বেরিয়ে এলো। শান্তনু সহাস্যবদন ঈশানী বললে, কি ভাগ্যি, আমার মাথায় বুদ্ধি ঢুকলো। কোনো কিছুতেই যার লোভ নেই, তাকে চায়ের লোভ দেখানো ছাড়া আর কি উপায় ছিল ?

নন্দ কোন্ মুহূর্তে যেন গা ঢাকা দিয়েছে। শান্তনু বললে, কলকাতা কিন্তু আমার নিজের রাজত্ব, এখানে মন্ত্রিত্ব পেলে মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারতুম। সুতরাং ভয়ে ভয়ে কথা বলতে আমি বাধ্য থাকবো না, তা আগেই ব'লে রাখছি।

ঈশানী সহাস্যমুখে বললে, পরোয়া করিনে, আমিও তা'র জন্যে প্রস্তুত। দশ বছর আগে যে মেয়ে সর্বহারা হয়ে এই শহরের পথে পথে ঘুরেছে, চোখের জল ছাড়া যার আর কোনো সম্বল ছিল না,—সেও আর কোনো কিছুতে ভয় পায় না, আমিও ব'লে রাখলুম।

শান্তনু থমকে গেল। বললে, কথাটা শুনতে মন্দ লাগলো না। শুনলে সজাগ হয়ে উঠবে অনেকে। শুনি গল্পটা কিরূপ ?

হাসিমুখে ঈশানী বললে, মেয়ে মানুষের আত্মকাহিনীর ওপর অত লোভ কেন ? এসো, ঘরে বসি।

তিন চারটি ঘর ছাড়িয়ে একটি ঘরে এসে দু'জনে ঢুকলো। পরিপাটি আসবাবপত্রের এমন অজস্র বিলাস সহসা চোখে পড়ে না। নিজের পায়ের ছেঁড়া চটি এবং জীর্ণ সজ্জাটা এবার শান্তনুর খারাপ লাগছে। সুতরাং একটু আড়ষ্ট হয়ে একটি গদি আঁটা চেয়ারে সে বসলো। তারপর হাসিমুখে বললে, এত তাড়াতাড়ি আত্মীয়-সম্ভাষণ শুনে একটু অবাক হচ্ছি কিন্তু।

ঈশানী বললে, তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা, রেখে-ঢেকে কথা বলতে চাও না।

কারণেই দাদা আর বৌদিকে চটিয়ে রেখেছ, এখন বুঝতে পারি। আচ্ছা,
ওপর ওরা খড়্গহস্ত কেন, বলো ত?

নু বললে, এত তাড়াতাড়ি শুনতে চাইলে বলতে পারবো না। ওটা
ত্তি মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার। রসকস বড় কম।

র আড়ষ্টতা কমেনি। ঈশানী সে কথা বুঝলো। কাছাকাছি ব'সে
ত্মীয় সম্ভাষণ করেছি কেন জানো? তুমি আমার সমবয়সী। আরেক
পরিচয়ে তুমি মিনমিনে কথায় আমাকে খুশী করতে চাওনি। আমাকে
করেছ তুমি প্রথম থেকে নিজের অহঙ্কারে। সত্যি বলবো, তোমাকে
লেগেছে।

শান্তনু বললে, বুঝলুম। তবে এর থেকেই ত' অনেকে জাল বোনে!

নী সহাস্য বাঁকা চোখে তাকালো। মানে?

নু এক ঝলক হাসলো। পুনরায় বললে, সেই পুরনো গল্প। ছেলেরা
জাল, আর মেয়েরা মায়াজাল!

নী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে, কী নিষ্ঠুর তুমি!
শেষের কটা দিন তুমি থাকলে কত আনন্দ পেতুম, আর তুমি কিনা
পালিয়ে এলে? মেয়েদের ওপর কি একটুও দয়ামায়া নেই? যে
তোমার গলায় মালা দেবে, তা'র দুঃখে এখনই আমার কাঁদতে

বললে, বিয়ে করবো কি না, আগে সেই মতলবটা স্থির হোক।

কথা অমন সবাই বলে। তারপরে হঠাৎ একদিন, 'বদলে গেল
ন বিয়ে করবে না শুনি?

শান্তনু বললে, নিজেই খেতে জানি, কিন্তু অন্যকে খাওয়াতে

বললে, সে যদি উপার্জন ক'রে নিজের ভাত নিজেই খায়, তাহ'লেও
না?

টা শান্তনুর মনে ঝলসে উঠলো। সে কিছুক্ষণ আনমনাভাবে

তাকিয়ে রইলো একদিকে। বাস্তবিক, এর পরে হঠাৎ আর কোনো যুক্তি এনে ফেলা যায় না।

রামতীরথ চা এবং অন্যান্য খাদ্য এনে হাজির করলো। তারপর শান্তনু উদ্দেশে হাসিমুখে নমস্কার ঠুকলো। শান্তনু ওদের সকলের কাছে প্রিয় হ উঠেছে।

ঈশানী বললে, দাঁড়াও, আমি এসে তোমাকে চা ঢেলে দেবো। ইতিমধ লোভে প'ড়ে যেন হাত বাড়িয়ো না।

ঈশানী তাড়াতাড়ি উঠে গেল এবং পাঁচ-সাত মিনিট পরে সে যখন ফি এলো, তখন তা'র ভিন্ন সজ্জা। মুখখানা পরিচ্ছন্ন, মাথা আঁচড়ানো। চোখ অতি শান্ত সুরুচির আভা। ক্ষিপ্রহস্তে সে নীচু টেবিলের ওপর নানাবিধ অব নিরামিষ খাদ্যসামগ্রী সাজিয়ে নিল। তারপর বললে, যদি অনুমতি করো তা আমিও ব'সে যেতে পারি তোমার সঙ্গে।

দু'জনেই হেসে উঠে খেতে ব'সে গেল। এক সময় ঈশানী বললে,বে আমার তখনকার কথার জবাব দিলে না ত?

শান্তনু বললে, মেয়ে যদি উপার্জনশীল হয়, তবে তার রুচি-অভিরুচির ওঠে। আমার ধারণা, অযোগ্যের গলায় সে মালা দেবে না। আর উভ যদি উপার্জন করে তবে ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ওঠে। আমি বলি, এ সব এখন থাক্। উৎকৃষ্ট ভোজ্যবস্তু বিবাহ অপেক্ষাও লোভনীয়।

ঈশানী অতি যত্নে শান্তনুর সামনে খাবার গুছিয়ে দিল। তারপর ব তুমি ভারি চালাক, মনের কথা ধরা দিতে চাও না। পছন্দসই মেয়ে যদি তোমাকে জব্দ করতে দেরি হোতো না।

শান্তনু বললে, ব্যাপারটা কিন্তু সঠিক আমার বোধগম্য হচ্ছে না। পরিচয়ের পর কোনো একটি মেয়ে যদি আবার বিয়ের ঘটকালি নিয়ে তাহ'লে ঠিক কারণটা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এবার যেন সবটাই রহস্যম হচ্ছে।

দু'জনে আহারাদি সেরে চা নিয়ে বসলো। বাইরে বেশ রোদ

ঈশানী বললে, কোন রহস্য নেই, অতি সহজ কথা। তুমি বিশ্বাস করো, ’রো ঘর যদি গুছিয়ে দিতে পারি, সেই আমার আনন্দ।

শান্তনু বললে, এখানে অন্য লোক থাকলে এই কথা জিজ্ঞেস করতো, অন্যের গুছিয়ে দিতে যার এত আনন্দ, নিজের ঘরটা সে কি মনের মতন ক’রে াতে পেরেছে ?

ব অন্য লোক কেউ থাকলে সে জবাব দিতুম।—মনে হোলো ঈশানীর একটি ক নিশ্বাস পড়লো।

ত ায়ে চুমুক দিল শান্তনু। তারপর বললে, একটা কথা জানার বড় লোভ চ্ছে।

ঈশানী মুখ তুললো। শান্তনু প্রশ্ন করলো, এতগুলো সাজানো-গোছানো ঘর ছি, আর কা’রা থাকে এখানে ?

আমি ছাড়া আর কে থাকবে ?

একা ?

ঈশানী বললে, একা কি মানুষ থাকতে পারে এত বড় ফ্ল্যাটে ? চাকর, র, ড্রাইভার, রাতদিনের ঝি—এরা যাবে কোথায় ?

না স্তু—শান্তনু একটু থতিয়ে গেল।

তু ানী ধমক দিল, অমনি অদম্য কৌতূহল, কেমন ? এর পর যে কথাটা ই েটা মুখে আটকে আছে কেন ?

প্রস্তুত হয়ে চুপ ক’রে থাকার পাত্র শান্তনু নয়। সে হাসিমুখে বললে, নে মনে হচ্ছে অর্ধেক রাজত্ব, আর রাজকন্যে। ব্যাপারটা কি ? মত র থাকলে একটু ভরসা পেতুম, এখন যেন বিপদ-আপদের গন্ধ পাচ্ছি।

-আপদ। ঈশানী হেসে ফেললো।—কিসের বিপদ ? এদিক-ওদিক জানি যে ?

এবার একটু দম নিল। বললে, মিহিজামে থাকতে আমার ধারণা বিয়ে ানা সমাজে তোমার একটু নাম ডাক আছে। সেই জন্যেই ত’ সু করা মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করলে অনেক ঝঞ্ঝাট !

নাম আমার আছে কিনা জানিনে, তবে ঝঞ্ঝাট কিসের ?

যে ব্যক্তি আনাগোনা করে তা'র সম্বন্ধে অনেক মিথ্যে রটনা রটে এবং অনেক অযথা অপবাদ ঘাড়ে চাপে।

ঈশানীর মুখখানা এবার গম্ভীর হয়ে এলো। বললে, একথার পর আর তামাসা চলে না। একটা কথা বলি আমার নিজের কোনো অপবাদ নেই। এখানে আমি থাকি একা। এক-আধজন যদি কেউ কখনো আসে, তা'রা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সমাজের লোক। একটা কথা মনে রেখো শান্তনু, অপবাদ যারা রটনা করে তারা দুর্বল, আর অপবাদের ভারে যারা নুইয়ে পড়ে তারাও মেরুদণ্ডহীন। নাও, আরেকটু চা খাও।

শান্তনুর সামনে চা ঢেলে দিয়ে একটু শান্তভাবে ঈশানী পুনরায় বললে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকা ক'রে নিচ্ছি, এজন্যই তোমার মনে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে, সে আমি বুঝি। মিহিজামেও তোমার এই সন্দেহ দেখেছি, এখানেও তুমি আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিচার করে নিচ্ছ। কিন্তু আমি সত্যিই বলছি, আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে না।

শান্তনু চুপ ক'রে রইলো। আন্তরিকতায় ঈশানীর কণ্ঠস্বর যেন কেঁপে উঠেছে। আজকের সকালটা আশ্চর্য মনে হচ্ছিল। সমস্ত নৈরাশ্যকর জীবনের মধ্যে দু'একটি মুহূর্তও যদি দিব্যদীপ্তিতে জ্বলে ওঠে তবে সেইটিই ত' জীবনের পরম মূল্য। মিহিজামের সেইকালটুকুকে মনে হয়েছিল রূপকথা, কিন্তু আজকের এই সকালের আনন্দলোক, এও যেন অনেকটা অবাস্তব।

মুখ তুলে শান্তনু একটু হাসলো। বললে, মিহিজামে তোমাকে এমন সব কথা ব'লে এসেছিলুম—অল্প পরিচয়ের মধ্যে যে সব কথা কোনো ভদ্র মেয়েকেই বলা চলে না। কিন্তু তুমি হাসিমুখে সব মেনে নিয়েছিলে।

ঈশানী বললে, তোমার কথায় পরিহাস ছিল, ঘৃণা-বিদ্বেষ কিছু ছিল না—তাই সমস্তটাই ভালো লেগেছিল।

কিন্তু আজ কি জন্যে আবার ডাকিয়ে আনলে শুনি ?

উদ্দেশ্য একটা আছে বৈ কি—ঈশানী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না, না, ভয় পেয়ো না,—কোনো দুরভিসন্ধি নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

শান্তনু বললে, আমি কিন্তু ব'লে রাখছি, মেয়েছেলের বিরুদ্ধে ঘটকালি আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

কাচের পাত্র যেমন সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, ঠিক তেমনিভাবে ঈশানীর গাম্ভীর্যটাও হেসে চুরমার হোলো। শান্তনু সেই হাসির মধ্যেই আবার যোগ ক'রে দিল, জীবনে অনেক রকম দুর্গতি আমার ওপর দিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু ধনবতী এক মেয়েকে ঘাড়ে নিয়ে পাত্র খুঁজে বেড়াবো,—এ দুর্ভোগের মধ্যে আমাকে এনো না, দোহাই তোমার।

হাসির পর হাসির তরঙ্গে ঈশানীর মুখ-চোখ রাঙ্গা। কী বিদীর্ণ সেই হাসির চেহারা। 'জাহ্নবী তা'র মুক্তধারায়, উন্মাদিনী দিশা হারায়'। সেই হাসির জের টেনেই ঈশানী বললে, যদি বলি বিয়ে নয়, তার চেয়ে আরো সাংঘাতিক ?

মানে ?—শান্তনু চোখ পাকালো,—প্রণয় কাহিনী ? না না, ও সব প্রণয় কাহিনীর দৌত্যগিরি আমার দ্বারা চলবে না।

মুখে তাড়াতাড়ি আঁচল চাপা দিয়ে ঈশানী হাসি চাপবার অনেক চেষ্টা করলো। তারপর বললে, এর বেশি আর কিছু বুঝি ভাবতে পারলে না ? তোমার কবিকল্পনার দৌড় বুঝি এই পর্যন্ত ?

শান্তনু নিরুপায় হয়ে পিছনে ঠেস দিয়ে বসলো। তারপর নৈরাশ্যের সঙ্গে বললে, তাহ'লে বুঝবো আমাকে বাঁদর নাচ নাচাবার জন্যেই আজ এখানে ডেকে এনেছ !

ঈশানী বললে, নাচবার ছেলে তুমি নও, একথা জানি ব'লেই তোমাকে কাছে এনেছি। আমি নিজেই যেতুম তোমার ওখানে, কিন্তু পাছে তোমার পাড়ায় কানাকানি হয় এজন্যে নন্দকে পাঠিয়েছিলুম। শোনো, এবার তামাসা রাখো। তোমার দাদা-বৌদির সঙ্গে আলাপ ক'রে তোমার বাড়ীর আবহাওয়া আগাগোড়া বুঝতে আমার এক মিনিটও লাগেনি। ও-বাড়ীতে তুমি কোনোমতেই টিকতে পারবে না, এ ব'লে রাখলুম।

শান্তনু বললে, কিন্তু ওটা আমার পৈতৃক ভিটে, ওর টান অন্যরকমের। যত দুর্ভাগ্যই হোক, ওটা নিজের বাড়ী। যতই অপমান সহ্য করি, ওখানে আমার আত্মিক অধিকার।

ঈশানী বললে, পৈতৃক ভিটে ব'লেই ওই অন্ধকূপে উপবাস ক'রে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকবে? মনুষ্যত্বের অপচয়কে ভয় করো না?

শান্তনু বললে, ওটাকে তুমি ভাসিয়ে দিতে বলো কিসের ভরসায়?

ঈশানী বললে, ওটা নিজের থেকেই ভেসে যাবে শান্তনু, তুমি কোনোমতেই ধ'রে রাখতে পারবে না। তোমরা ভাই-বোনে যখন নাবালক, তখন তোমার বিধবা মাকে দিয়ে নানা প্রকার সই-সাবুদ ওরা ক'রে নিয়েছে। বারো বছরের ওপর ট্যাক্স-খাজনা দিয়েছে, তোমার বোনকে পার করেছে, তোমার বিধবা মায়ের খরচ যুগিয়েছে।—এর পরেও তোমার সম্পত্তির ওপর আত্মিক অধিকার আছে বলতে চাও?

শান্তনু বললে, শুনেছি, একবার আমাদের অংশটা নাকি নিলামে উঠেছিল।

তবে ত' আরো ভালো। বেনামী ক'রে সেটা কিনেও রেখেছে। এখন লোকলজ্জার ভয়ে তোমাকে তাড়াচ্ছে না। কিন্তু তুমি হাত বাড়ালেই এবার তাড়া খাবে।

শান্তনু অবাক হয়ে ঈশানীর কথা শুনছিল। এবার বললে, তুমি এত জানলে কোত্থেকে?

আমি।—ঈশানী বললে, ষোল বছর তখন আমার বয়স। গ্রামের বাড়ীর থেকে একদিন তাড়া খেয়ে একেবারে একা চ'লে এসেছিলুম নেড়িকুকুরের মতন। মনে পড়ে সেদিন সন্ধ্যেবেলা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়েছিলুম। অনভিজ্ঞ, নির্বোধ দিশাহারা এক গাঁয়ের মেয়ে আমি, কোনো পথ সেদিন চিনতুম না।

শান্তনু আগ্রহে বললে, তারপর? কি করলে?

থাক, শান্তনু—ঈশানী স্মিতমুখে বললে, ইংরেজি উপদেশটা মনে করো। কাঁদলে একা কাঁদো নিজের দুঃখে, কিন্তু তুমি যদি হাসো, পৃথিবীসুদ্ধ তোমার সঙ্গ

হাসবে। সে সব কথা মনে করলে সেদিনকার ওই অর্বাচীন মেয়েটার চোখে আজও জল আসে।

ঈশানী উঠে অন্য ঘরের দিকে চ'লে গেল।

অসীম কৌতূহল নিয়ে শান্তনু পিছন দিক থেকে তার দিকে তাকালো। সমস্তটা বিস্ময়,—আগাগোড়া। এমন উদ্বেলিত প্রাণবন্যা,—যেন অভিভূত করে সমগ্র সত্তাকে। এ লীলায়িত তনুলতার বর্ণনা করতে গেলে নিগূঢ় আসক্তি প্রকাশ পায়,—না থাক্, ও-ব্যাপারটায় শান্তনুর উৎসাহ কম। কিন্তু কোথায় যেন আছে শাণিত ইস্পাতের কাঠিন্য ওই দেহবল্লরীর অন্তরালে, সেটার আভাস পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

বেলা বেড়ে গেছে অনেক। এবার শান্তনুকে যেতে হয়। যেতে হবে অনেক দূর। বড়লোকরা যদি বা নিমন্ত্রণ করে, আসা-যাওয়ার দুর্ভোগটা তারা বিবেচনা করে না। এ বাড়ীতে নিয়মিত যদি শান্তনুকে আনাগোনা করতে হয়, তবে ত' সে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হবে। কোথায় পাবে যখন-তখন ধোপদস্ত জামা আর আস্ত ধুতি? রুমাল চাই একখানা ভদ্রগোছের। অবিলম্বে নতুন জুতো না কিনলে চলবে না। নিত্য দাড়ি কামাবার খরচ এবং সময়ের অপব্যয়। পকেটে নিয়মিত কিছু অর্থ। না, অসম্ভব। ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক মেলা-মেশা এই কারণেই অসম্ভব। পদে পদে পায়ে কাঁটা ফুটবে, পদে পদে আড়ষ্টতা এবং ব্যবহারিক আচরণের এক চুল এদিক-ওদিক হ'লেই ব্যাস,—হাসির পাত্র! অনুকম্পা! দারিদ্র্যের মধ্যে আর কিছু না হোক, স্বাচ্ছন্দ্যটা অবাধ। তার দায় কিছু নেই, নেই আড়ষ্টতা। ওজন করা হাসি, অঙ্ক কষা ভালোবাসা, হিসাব করা অভ্যর্থনা,—দরিদ্রের ঘরে এ সব কিছু নেই। দু হাত বাড়িয়ে তারা ডাকে, হৃদয়ের আসনে তারা বসায়, অন্তর উজাড় ক'রে তারা ভালোবাসে। বিদুরের অন্ন ভাগ ক'রে আনন্দের ভোজে তারা ডেকে নেয়।

শান্তনু উঠে দাঁড়ালো। নিজের মনই তার দোলায়মান। সমস্ত হাসি এবং পরিহাসের প্রশ্রয়ের আড়ালে সে কি ঈশানীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছে না?

কিন্তু অনন্ত যৌবন। উর্বশীর পক্ষে একা এই ঐশ্বর্য সম্পদ নিয়ে নিভৃতে বাস করাটা কি সন্দেহজনক নয়? ও মেয়েটির বিগত অতীতের থেকে কি এক প্রকার নিগূঢ় রহস্যজনক গন্ধ সে পাচ্ছে না? কে, কি ও কেন। দুরভিসন্ধি নেই বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা? সত্য পরিচয় কি? জাতি গোত্র কেমন?

নন্দ এসে ঢুকলো। খাবারের উচ্ছিষ্ট সমেত পাত্রগুলি একে একে গুছিয়ে নিয়ে চ'লে যাবার আগে বললে, ছোটবাবু, দিদিমণি গেছেন রান্নাঘরে, এখুনি আসছেন। আপনাকে বসতে বললেন।

শান্তনু বললে, কিন্তু আমাকে অনেক দূর পথ যেতে হবে, নন্দ। তোমার মহিলা-মনিব নিরাপদে এবার স্নানাহার করুন, আমি ততক্ষণে বিশ্বপথে বেরিয়ে পড়ি। তাঁকে ব'লো।

তাঁর সে হিসেব আছে।—পর্দাটা সরিয়ে দ্রুতপদে ঈশানী এসে ঢুকলো। শান্তনুকে আবার ফিরে দাঁড়াতে হোলো। নন্দ চ'লে গেল।

ঈশানী বললে, তোমার নিজের মনেই গণ্ডগোল। তুমি কি উমেদারি করতে এসেছিলে যে পদে পদে অস্বস্তি? এসো ভেতরে।

ভেতরে। কেন? কি করবো ভেতরে গিয়ে?

সে কি কথা, একটু বিশ্রাম করবে না? ভয় নেই, একা থাকো যতক্ষণ খুশি। আমি একটুও জ্বালাবো না।

শান্তনু বললে, কিছু মনে করো না, ব্যাপারটা এবার যেন একটু ঘোরালোই মনে হচ্ছে।

চোখ পাকিয়ে ঈশানী বললে, আমাকে অবলা ব'লে বার বার ভুল ক'রো না, শান্তনু। ভেতরে এসো।

আমি কিন্তু এর জন্যে একেবারেই তৈরী হয়ে আসিনি।

ঈশানীর অনুসরণ ক'রে শান্তনু পূর্বদিকের বারান্দা পেরিয়ে একটি ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর ঈশানী হাসিমুখে বললে, খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো, তারপর কাজের কথা হবে।

আবার কিসের খাওয়া?—শান্তনু জানতে চাইলো।

প্রাতরাশের পর মধ্যাহ্ন ভোজন।—এই ব'লে ঈশানী বেরিয়ে যাচ্ছিল। ব্যস্ত হয়ে শান্তনু ডাকলো, শোনো, শোনো,—

ঈশানী হাসিমুখে বললে, আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ ওই বড় আয়নায় নিজের চেহারা দেখো, আর ভুল সংশোধন করো। আর এক কথা, ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে মেয়েছেলেকে অমন ব্যস্ত হয়ে ডাকতে নেই।

ঈশানী চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো শান্তনু। এর পরে আর কিছু বলবার নেই। এদিক ওদিক সে একবার তাকালো। সামনেই গৌতম বুদ্ধের সেই অস্থিচর্মসার কঙ্কালের একখানা বড় ছবি। আরেকখানি ছবি বিদেশী। দান্তে আর বিয়াত্রিচের প্রথম সাক্ষাৎকার। আয়নার পাশে সুসজ্জিত সেক্রেটারিয়েট টেবিল—উপরে কয়েকখানি বাঙ্গালা ও ইংরেজি বই গোছানো। টিপাইয়ের উপর একটি কাচের কুঁজো আর গেলাস। একপাশে পরিষ্কার বিছানা দুগ্ধফেননিভ। দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাইরে বহুদূর পর্যন্ত সুদূর গাছপালা দেখা যায়।

শান্তনু তার আড়ষ্ট পায়ে জোর আনলো। দু'পা এগিয়ে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক ক'রে পান করলো। এর চেয়ে সুষমার সান্নিধ্য নিরাপদ। কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে বলা চলে? একজন বিনা বিবাহে সিঁদুর চড়াচ্ছে মাথায়, আরেকজন প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে অগাধ জলে তলিয়ে দেবার চেষ্টা পাচ্ছে। একজন তাকে কোনোমতেই ছাড়তে চায় না, অন্যজন কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবে না। এরা কেবলমাত্র দুটি মেয়ে নয়, দুটি তরঙ্গ। দুটি তরঙ্গের আঘাতে আহত-প্রতিহত হয়ে কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে বলা কঠিন। কিন্তু এই পরিস্থিতি তার কাম্য ছিল না। এর কোনোটাই ভালোবাসা নয়। দুটোর একটাতেও কোনো রস-কল্পনা নেই। একদা রঙীন চোখ ছিল তার,—সেই চোখের দৃষ্টি শুচিশুদ্ধ। অর্বাচীন, অভিজ্ঞতা-বিহীন এবং অজ্ঞান তার মন। একদা অমরাবতীর বাতায়ন থেকে কোনো এক কালে কোনো এক মেয়ে তাকে ডাক দেবে, সেই আহ্বানে জ্যোৎস্না রাত্রে রাজহংসের মতো শুক্লপক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে যাবে সে দূর গগন প্রান্তে,—

মেয়েদের সম্বন্ধে এই ছিল তার কল্পনা। পুষ্পলতায়, চন্দ্রশোভায়, উদ্যান-বীথিকায় কচিৎ দর্শন মিলবে তার,—যাকে দেখলে তার বক্ষোরক্তে বীণাবাদিনীর সুরের মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে। কোথা সেই কপোতের ক্লান্ত কণ্ঠ,—শূন্য মনের পরম বেদনা যেখানে উচ্ছ্বসিত? কোথা সেই মধুরভাষিণী বনবিহঙ্গী! কোথা বা সেই সুচিত্রবর্ণা পরিহাসিনী মধুপতঙ্গী।

কিন্তু এরা তা' নয়, এরা অত্যন্ত সুলভ। এদের জন্য তপশ্চর্যা নেই; এরা মায়াকাননের ইন্দ্রজালের অন্তরালে থাকে না,—এরা বড় সুস্পষ্ট, বড়ই প্রত্যক্ষ। রস-কল্পনার অসীম আনন্দ-লোক থেকে এরা নেমে আসেনি,—এরা থাকে কালীঘাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে। এরা আকারের বাঁধনে ধরা দিয়েছে ব'লেই শান্তনুর মন বার বার ধাক্কা খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহবাদী মনোভাব শান্তনুকে যেন অস্থির ক'রে তুললো। তার সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেন শৃঙ্খলিত—এটি তাকে ভূতের মতো সহসা পেয়ে বসলো। আজই এর সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার, আজই এর নিষ্পত্তি হওয়া চাই; শান্তনু ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সেই প্রকার মিষ্টহাস্য নিয়েই ঈশানী আবার ফিরে এলো। কিন্তু ঘরে শান্তনু নেই। এদিক-ওদিক তাকালো ঈশানী। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। ফিরে গেল অন্য ঘরে। ঘুরে এলো ড্রয়িং থেকে। না, শান্তনু কোথাও নেই। উপর দেখে নীচে গেল ঈশানী। বাঁধানো উঠোনের ওপ্রান্তে গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য ক'রে দেখলো গাড়ীর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে তেওয়ারী, যেমন সুবিধা পেলে প্রত্যেক ড্রাইভার ঘুমোয় গাড়ীর মধ্যে।

শান্তনু কোথাও নেই। ঈশানী আবার ফিরে উপরে উঠে এলো। নন্দ গিয়েছিলো বাইরে। ফিরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, দিদিমণি, ছোটবাবুকে ত' দেখছিনে।

ঈশানী বললে, না, তিনি নেই।

ওদিকে রামতীরথের ঘরে রান্নাবান্না সব তৈরী, এবং নন্দই সব আয়োজন

করেছে। কিন্তু মুখ ফুটে নন্দ আর কোনো প্রশ্ন করলো না। ঈশানীর দিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাজে চ'লে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো পাইকপাড়ার সেই গলিতে পৌঁছতে। পৈতৃক ভিটের রাজপথ এটি। গলির ওপ্রান্তে গরু-মহিষের খাটাল। এদিকের নালা-নর্দমা দিবারাত্র দুর্গন্ধে ভরা। মাছি ভন ভন করছে সর্বত্র। কলেরার মহামারী দেখা দিলে এখানে প্রথম রোগী মরে; টাইফয়েডের প্রথম বলি এখানে। পিছন দিকে চৌধুরী গোষ্ঠিদের সেই জরাজীর্ণ শিবমন্দির,—বৃষ্টির দিনে কেবলমাত্র ছাগল ঢুকে শিবের কোলে আশ্রয় নেয়।

শান্তনুর পৈতৃক ভিটে। নেড়িকুকুরের দল আর রুগ্ন মূঢ় গৃহস্থ থাকে গায়ে গায়ে। জগৎজোড়া অভিযান চলেছে মানুষের, চলেছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, খ'সে পড়েছে ইংরেজের সাম্রাজ্য, নতুন মানব-বংশের জাগরণ-কল্লোল শোনা যায় দিকে দিকে, জরা-ব্যাধি বিকারের বিরুদ্ধে প্রাণবন্যার প্লাবন আঘাত করছে সকল জীর্ণ সংস্কারকে,—কিন্তু শান্তনুর প্রাচীন পৈতৃক ভিটের দরজায় সে-চেতনা আজও এসে পৌঁছয়নি। এখানে সকল কলহ-কলঙ্ক-মালিন্যের আশে পাশে পরম নিশ্চিন্ততা। সেই আদি ও অকৃত্রিম পুরাতন পৃথিবী এখানে নিরুদ্বেগ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শান্তনু এসে বাড়ীতে ঢুকলো। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে টা টা করছে চারদিক। আর কিছু না হোক, অনাহত নিরুদ্বিগ্ন জীবন এখানে। প্রাণ-সমস্যার কোনো ভীড় এখানে নেই।

একটু অবাক হয়ে গেল শান্তনু। তার দরজায় দুটো মোটা তালা লাগানো। এ দুটো লোহার সিন্দুকের তালা, তার পৈতৃক আমলের। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, তার সেই নোংরা বিছানাটা একপাশের বারান্দায় পুঁটলী পাকানো প'ড়ে রয়েছে। পুরনো কয়েকখানা পাতা খসানো বই পথের ধারে বেশ গুছিয়ে রাখা। স্যুটকেসটা খোলা। ভিতরে দু-একটি জামা-কাপড় এবং তার ক্যামেরাটা। পুরনো তারিখের কয়েকখানা খবরের কাগজ ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া।

খান দুই বাঁধানো খাতা বইয়ের গোছার পাশে। ছাবর প্যাকেটটা তার ওপর।

শান্তনু থমকে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা সঠিক তার বোধগম্য হোলো না। সে ডাকলো, মিনু ?

বলা বাহুল্য, মিনু কাছাকাছিই ছিল। ডাকামাত্র সে সামনে এসে দাঁড়ালো। —কি, ছোড়দা ?

এ-সব জিনিষপত্র এখানে কেন ? ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে ত' ব্যাপারটা ?

মিনু বললে, আমাদের চিঠি পেয়ে বড়দা ফিরে এসেছে মিহিজাম থেকে। তোমার ঘরটা মেরামত ক'রে এবার ভাড়া দেওয়া হবে।

শান্তনু বললে, আমি থাকবো কোন্ ঘরে ?

আর কোন ঘর ত' খালি নেই !

সহসা ফুটন্ত রক্তের উচ্ছ্বাসে শান্তনুর মাথাটা ন'ড়ে উঠলো। সে বললে, তাহ'লে এই দাঁড়ায়, আমার নিজের বাড়ী থেকে আমাকে বা'র ক'রে দেওয়া হচ্ছে, এই না ?

চারদিকে স্তব্ধ নীরবতা। নতমুখে মিনু দাঁড়িয়ে।

দাদা-বৌদিদি কোথায় ?

মুখ তুলে মিনু বললে, ওরা বোধ হয় খেতে বসেছে।

শান্তনু বললে, ওদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে আয়, আমার পৈতৃক অধিকার থেকে আমাকে সরানো হচ্ছে কেন ? এর ফলাফল কি তারা বোঝে না ?

সহসা ওপরের বারান্দা থেকে দাদা গলা বাড়িয়ে বললেন, ফলাফল হাইকোর্ট থেকে জানবার চেষ্টা করতে পারো,—আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে ফলাফল নাই শুনলে ?

বাড়ী তোমার একার নয় !

এর জবাবও সেখানে পাবে !

শান্তনু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মিনু তাড়াতাড়ি বললে, তোমার পায়ে পড়ি ছোড়দা, তুমি চুপ করো। দাদা সত্যিই বলেছে, এ-বাড়ীতে তোমার অংশ

দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে। নাম খারিজ করার জন্যে তুমিই ত' বছর কয়েক আগে নিজের হাতে সই ক'রে দিয়েছিলে, মনে নেই ?

মিনুর কথায় হঠাৎ শান্তনু জুড়িয়া গেল। বললে, ও, তা হবে, মনে নেই। তখন নাবালক ছিলুম, অনেকগুলো সই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল !

নাবালক কেন হবে ? সাবালকের প্রমাণ আছে কাগজ-পত্রে ! দলিলের বয়েস অন্য রকম হয়, তুমি কিচ্ছু জানো না !

মিনুর কথায় অন্তত বিবাদটা থেমে গেল। নিশ্বাস ফেলে শান্তনু বললে, বেশ, তাহ'লে চ'লেই যাচ্ছি, বলবার কিছু নেই।—বলতে বলতে স্যুটকেস থেকে তার প্রিয় ক্যামেরাটা কেবলমাত্র সে তুলে নিল।

মিনু বললে, শুদ্দুরের মেয়ে বিয়ে করেছ তুমি, সেই জন্যেই এই কাণ্ড, তা জানো ছোড়দা ? দাদা আরো আগুন হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে, তুমি এ-বাড়ীতে থাকলে কোনো ছেলেমেয়ের আর বিয়ে হবে না। সমাজে একঘরে হ'তে হবে। একেই ত' পাড়াময় ঢি ঢি তোমার জন্যে !

কোনো কথা আর শান্তনুর মুখে এলো না। বোধ করি এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রের ছায়ার নীচে অন্ধকার ভগ্ন ভিটার আশপাশে তার প্রেতচ্ছায়াময় জনক-জননী তাকে শেষ বিদায় দেবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেইজন্য বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল তার দুটো চোখ। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করলো। একবার এদিক ওদিক তাকালো। দাদা-বৌদিদি যখন ফিরেছে, তখন কোথাও না কোথাও ছোট ছেলেটা খেলা করছে। শান্তনুর ক্ষুধার্ত দুটো চোখ চঞ্চলভাবে ছেলেটাকে এখানে ওখানে খুঁজে বেড়ালো। কিন্তু সে কোথাও নেই। অবশেষে নিশ্বাসটা চেপে রেখেই এক সময় ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে শান্তনু বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিলেন বৌদিদি। মুখ বাড়িয়ে তিনি বললেন, দুপুরবেলা এক মুঠো মুখে দিয়ে গেলেই ত' পারতে !

ততক্ষণে শান্তনু গলির ওপ্রান্তে চ'লে গেছে।

সন্দেহ নেই, তার জীবনের গতিতে মরচে ধরেছিল। আজ মাত্র আধ

ঘণ্টার মধ্যে ভাগ্যের চাকাটা চক্ষের পলকে ঘুরে গেল। কিছু ভাববার আগে, কিছু তলিয়ে বোঝবার আগে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে এসে পড়লো এমন এক জীবনে, যেখানে আশ্রয় ব'লে আর কোথাও কিছু রইলো না। এমন একটা নিষ্ঠুর মুক্তি যেটা সম্পূর্ণ অবারিত, যেটার চারদিকে ছায়া এবং আশ্রয়ের লেশমাত্র নেই।

ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে হাঁটতে লাগলো সোজা পথে। ফটোগ্রাফ বিক্রির দরুন তার পকেটে কিছু টাকা ছিল। কিন্তু তার পরিমাণ এমন নয় যে, ওটা নিয়েই সে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বে। একটা কথা মনে পড়ছে, ঈশানীর ধারণাটা কতখানি সত্য। মেয়েমানুষ যেটা সহজ অনুভূতির থেকে বোঝে, পুরুষ সেটি যুক্তির দ্বারা অনুধাবন করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলে। ঈশানী জানতো, দাদা আর বৌদিদির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা শান্তনুকে পথে বসাতে উদ্যত। কিন্তু সেটা যে এত শীঘ্র এমন দানবীয়ভাবে ঘটবে, এ হয়ত ঈশানীও কল্পনা করেনি।

ভালো কথা, ও-গল্পটা ঈশানীর কাছে এখনও শোনা হয়নি। ষোল বছর বয়সে একা মেয়ে গ্রাম থেকে বিদায় নিয়েছিল রিক্তহস্তে কোনো এক সন্ধ্যায় ওই বিদ্যুদ্দামবিস্ফূরিত চঞ্চল কটাক্ষের অন্তরালে সেদিন ছিল সকরুণ অশ্রুসজলতা! এই পর্যন্ত তার গল্প, তারপরে তার সমস্ত আত্মকাহিনী অন্ধকারে ঢাকা। প্রবলের স্পর্ধিত অন্যায় তাকেও কি শান্তনুর মতো আপন ভিটা থেকে একদা বহিষ্কৃত করেছিল?

শান্তনু আপনার অজ্ঞাতেই ঈশানীর বাড়ীর দিকে অভিযান করেছিল। কি এবার গিয়ে কী বলবে তাকে? সম্পদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আপন নিরুপা দশার বর্ণনা করবে? সে যে ভয়ানক চিত্তের দৈন্য! এর নামই ত' মুষ্টিভিক্ষা

শান্তনু তৎক্ষণাৎ অন্য পথে ঘুরলো। কালীঘাটের দিকে সে চললো সুধমাকে ব'লে আসা দরকার তার বর্তমান অবস্থার কথা। কোনো এক ঘাটে তার নোঙর এতকাল বাঁধা ছিল, কিন্তু সেই নোঙর ছিঁড়ে গেল আজ, ত অকূলে ভাসলো। আশা করবার কিছু নেই, আশ্বাস কিছু রইল না।

বাস থেকে নেমে সে চললো সুষমাদের বাড়ীর দিকে। কিন্তু কেন যাচ্ছে সে? প্রাণের টান ত' কিছু নেই! সুষমা তাকে স্বামী ব'লে জানতে চায়, নিরুপায় মেয়ের পক্ষে একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা! এর মধ্যে ত' ভালোবাসার কথা কোথাও নেই! প্রেম নয়, অনুরাগ নয়,—শুধু স্বামী-স্ত্রী হওয়া। দরিদ্রঘরের অন্ধকার মেঝের উপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে একটি ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মেয়ে,—সে কেবল চায় জীবিকানির্বাহে একটি অবলম্বন। একটি স্বামী! স্বামী হ'লেই খুশী। তার ওপর ছেড়ে দাও আপন ভাগ্যের দুর্বহ বোঝা, দুঃসহ দায়িত্ব! তারপর নিজে থাকো নিশ্চিন্ত হয়ে,—মরুক একটা পুরুষ! মেয়েমানুষের স্থূল একটা মাংসপিণ্ডের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিরপরাধ একটা পুরুষ আমরণ দাসত্বের দস্তখৎ করুক, কিন্তু স্ত্রী হ'তে পারলে আমি নিশ্চিন্ত! আমার অন্নবস্ত্র বাঁধা, আশ্রয় কোথাও না কোথাও, আর কোনো ভাবনা নেই। খুশী রাখো স্বামীকে, যখন তখন 'পতি পরম গুরু' ব'লে সম্ভাষণ করো, নির্বোধ পুরুষ তাতেই খুশী। সন্তান ধারণের অসীম অধ্যবসায়সহ স্বামীর পায়ে হাত বুলিয়ে দাও,—ব্যস, চিরকালের অন্নবস্ত্র নিশ্চিত। ঘাম ঝরুক পুরুষের কপাল বেয়ে, ক্ষত-বিক্ষত পায়ে রক্ত পড়ুক, দিনযাপনের গ্লানি তার আকণ্ঠ হোক, জীবিকা সংস্থানের পথে পদে পদে পুরুষের মাথা নত হোক, আমি শুধু রইলুম তার আরামশয্যার সঙ্গিনী!

ধিক্কার দিল শান্তনু। তারপর গলির মুখ থেকে সে ফিরে গেল অন্যত্র। ঘৃণার চেহারা ফুটে রইলো তার মুখের চেহারায়, সমস্ত জন-কোলাহলের মাঝখানে সে দেখতে পেলো ওই ধিক্কার। নিত্য ছুটছে পুরুষ ওই নোংরা বাসনার দিকে। চারদিকের এই বৃহৎ কর্মজীবনের মূল তাৎপর্য ওই। লালাসিক্ত লোভ নিয়ে ব'সে আছে মেয়ে, সেই লোভের কদর্য উপকরণ যোগাচ্ছে পুরুষ! এর নাম নরনারীর মিলিত জীবন। এই খেলা নগরের, এই খেলা সভ্যতার!

এর চেয়ে মৃত্যু হোক, এর থেকে মুক্তি হোক। শান্তনু হন হন ক'রে চললো। এই চক্রান্ত থেকে সে পালিয়ে যাক, সেই ভালো। কোনো অজানা দেশের অচেনা জগতে, বিজন সমুদ্রতীরে, নিভৃত অরণ্যালোকে, পর্বতপ্রান্তের

কোনো পাখীডাকা উপত্যকায়, যেখানে আকাশ পেতে রেখেছে তার জন্য অনন্তশয্যা। সেখানে গিয়ে কোনো নামহারা পরিচয়হারা সন্ন্যাসীর আশ্রম-উপান্তবর্তী নদীকূলে আপন মনে আনন্দের দিনগুলি কাটানো। সভ্য জগৎ থাকুক পিছনে, সে চলুক এগিয়ে।

—আরে, ও মশাই, শুনছেন? কেমন আছেন? এই যে, এই দিকে—সেই যে সেই মিহিজামে আলাপ, মনে আছে ত?

রমেনবাবু একেবারে কাছে এসে গায়ে গ'লে প'ড়ে শান্তনুর একখানা হাত ধ'রে ফেললেন।

শান্তনু হাসিমুখে তাকালো।—ভালো আছেন?

ভালো থাকতেই হবে!—রমেনবাবু বললেন, নিজের শরীরের ওপর নিজের দখল আছে, একথা ভুল। ঈশ্বর একটা দম দিয়ে রেখেছেন, তাই দেহের ঘড়িটা চলছে। আপনার ইচ্ছে অনিচ্ছে যাই থাক, যন্ত্রটা নিজের নিয়মে চলবে! তারপর কোথা চললেন? ক্যামেরাটাও সঙ্গে আছে দেখছি! আপনার বাড়ী ত' সেই পাইকপাড়ার ওদিকে! তা চলুন, আমাদের ওখানে একটু চা খেয়ে যান?

শান্তনু বললে, ভারি খুশী হলুম, আপনার সঙ্গে দেখা হোলো! কিন্তু আমাকে বিশেষ একটা কাজে যেতে হচ্ছে! বেশ ত', অন্য একদিন গিয়ে আপনাদের ওখানে খুব গল্প ক'রে আসবো।

রমেনবাবু হো হো ক'রে হেসে বললেন, ওই দেখুন, সেদিনও যা আজও তাই। আড়ষ্টতা আর আপনার কাটলো না। ভারি লাজুক আপনি, ঈশানী ঠিকই বলতো। কিন্তু আপনার সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে অথচ আপনাকে ধ'রে নিয়ে যাইনি, একথা শুনলে সে-মেয়ে রেগে আগুন হবে। সুতরাং আর কোনো কথা চলবে না মিষ্টার চৌধুরী, না গিয়ে আপনার উপায় নেই।

একটি সম্পূর্ণ বাহুর দ্বারা শান্তনুকে আলিঙ্গন ক'রে রমেনবাবু তাকে একদিকে টেনে নিয়ে চললেন।

ভাগ্যের ক্রীড়নক শান্তনু। চলতি স্রোতে ভাসমান সে। সেই স্রোতের

ধাক্কায় তার ইচ্ছার কোনো জোর থাকে না। সে হোলো নিয়তির খেয়ালের খেলা। কখনও ঢেউয়ের আঘাত, কখনও বা আবর্তের ঘূর্ণীপাকে পাক খাওয়া। সুতরাং রমেনবাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে সে বাধ্য হোলো।

বড় রাস্তাটা তারা পার হোলো। বিপরীত ফুটপাতে গিয়ে উঠে কিছুদূর তারা চললো, তারপর ঢুকলো আরেকটা রাস্তায়। রমেনবাবু বললেন, এই যে, এই আমাদের 'গীতালী সঙ্ঘ'। এ দিকটা একটু নিরিবিলি, রাস্তাঘাটের গোলমাল কম। আসুন—

বয়স্ক লোক রমেনবাবু, তাঁর পীড়াপীড়ি কথায় কথায় প্রত্যাখ্যান করা চলে না। গেট্ পেরিয়ে শান্তনু তাঁকে অনুসরণ করলো। এপাশে ওপাশে অজস্র ফুলের গাছ বসানো। সামনেই বাড়ীর দক্ষিণমুখী পর্চ, তার নীচে দু'একজন চাকর ও দারোয়ান ব'সে আছে। রমেনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু দোতলায় উঠে গেল। ছেলেমেয়েরা অনেকেই এসেছে, কোনো কোনো ঘর থেকে গান-বাজনা শোনা যাচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠলো শান্তনু,—মাত্র এক পেয়ালা চায়ের জন্য, তার বেশী এখানে তার পরমায়ু নেই। মুস্কিল এই, ঈশানী যদি টের পায়। আজ প্রভাতকাল থেকে সুরু হয়েছে একটা বিচিত্র নাটকীয় আলোড়ন, এখন সন্ধ্যার আলো জ্বললো। আজ সমস্ত দিন ধ'রে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, কিন্তু তবু দুরন্ত বন্যার সর্বনাশা তাড়না থেকে সে সারাদিন ধ'রে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলেছে। ছেঁড়া চটি আর দরিদ্র সজ্জা নিয়ে সে তা'র পুরুষ-পরম্পরাগত স্বাধিকার বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে ত্যাগ ক'রে এসেছে। এখানে এই বাড়ীর এত বড় একটা সমাজে কেউ নেই তার জুড়ি। ঈশ্বরদত্ত অধিকার ছেড়ে এসেছে সে শান্তির জন্য। গর্বোদ্ধত অন্যায়ের পদতলে ন্যায় ও নীতির অপমৃত্যু ঘটেছে বটে, কিন্তু শান্তনুর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য আর পৌরুষ অন্তত আর কিছু না পারুক, ওই জরাজীর্ণ বাড়ীর সর্বত্র রক্তের ধারা ঝরিয়ে আসতে পারতো। একটির পর একটি হত্যা ক'রে সে ওই ভ্রাতৃষ্পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসতো বৃহৎ রাজপথে। তার বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্রের বাসা, কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্র নেই তার। সে মানুষ ক'রে তুলতো ওই শিশুকে শাণিত তরবারির

মতো ক'রে। বড় হ'লে রণতুরঙ্গের পিঠে বসিয়ে দিত সেই পুরুষকে। ঝলসে উঠতো তার কঠিন দক্ষিণ হস্তে তরবারি। যেখানে যত অনড় জীবন, যেখানে যত মূঢ়তা আর কূটবুদ্ধি, যেখানে যত আলস্য আর কুসংস্কার,—চিত্তের মালিন্য, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা, নিষ্ক্রিয়তার ষড়যন্ত্র,—ওই নির্দয় তরবারি হোতো তাদের শেষ প্রতিকার।

তারপর উঠে দাঁড়াতো নবীন জীবন, নতুন প্রভাতকাল। এই হোলো তার কবিকল্পনা, এই সত্যের মধ্যেই তার বাসা। সভ্যতার সকল কীর্তি মুছে যায়, সমস্ত আলো একে একে নিভে যায়,—কিন্তু যুগে যুগে মানুষ রেখে যায় কবিকল্পনা, যার ভিন্ন নাম হোলো আইডিয়া। সেও রেখে যাক্ তার এই কল্পনা, তার এই সত্যোপলব্ধি।

একটা বড় হল্-এ এসে রমেনবাবু দাঁড়ালেন। সেখানে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দুজন বর্ষীয়সী মহিলাও রয়েছেন। রমেনবাবু সকলের সঙ্গে শান্তনুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এটা নতুন সমাজ শান্তনুর কাছে।

যেমন-তেমন সাজসজ্জা তার, কিন্তু তার প্রদীপ্ত সুশ্রী চেহারাটার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাকে দেখে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাওয়া যায় না। মেয়েদের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, পুরুষের বন্য কৌমার্য ওরা সহজেই আবিষ্কার করে। ওরা দেখতে পায় সম্ভাবনা, দেখে নেয় কৃতিত্বের ছায়া। ওদের মন হোলো গ্রহণেচ্ছু, মস্তিষ্ক হোলো হিসাবী।

একটি মেয়ে হাসিমুখে বললে, ক্যামেরাটা বুঝি আপনি কাছছাড়া করেন না?

মেয়েটির নাম হেনা, মিহিজামে শান্তনু ওকে দেখেছে। শান্তনু বললে, ওটা আমার ব্যবসা। চায়ের আমন্ত্রণে এসেছি, ব্যবসাটা ভুলিনি। ছবি তুলে বেড়াই যেখানে সেখানে।

বর্ষীয়সী একটি মহিলা প্রশ্ন করলেন, এ ছাড়া আর কোনো কাজ করেন না?

দরকার হয় না।

ওর পরিচ্ছদ সজ্জার প্রতি সবাই তাকালো। একটি তরুণ যুবক টেবলের

তলা দিয়ে আরেকটি যুবকের পায়ে চিমটি দিল। ভাবটা এই, দেখেছ অহঙ্কারের চেহারা। অন্য ছেলেটি চিমটি দিয়েই জবাব দিল, ভয় পাসনে, শূন্যপাত্রের আওয়াজ বেশী!

রমেনবাবু বেরিয়ে গেছেন। অন্য হল্-এ গানের মহড়া চলছে।

এক সময় চা এলো, চায়ের সঙ্গে কেক্-বিস্কুট। হেনা উঠে এসে সযত্নে চায়ের পেয়ালা এবং খাদ্য-সামগ্রী সকলের মধ্যে ভাগ করে' দিল। হেনা বোধ হয় নিজের ফটোখানা বিনামূল্যে আগেই তোলাতে চায়, তাই অতিথি আপ্যায়নে এত আগ্রহ।

দ্বিতীয় মহিলা প্রশ্ন করলেন, আপনার গান আসে?

শান্তনু চায়ে চুমুক দিল। বললে, আজ্ঞে না, গলার আওয়াজটা এতই কর্কশ যে, কোনোদিন বাগ মানাতে পারিনি।

এবার সকলে নিছক আনন্দে হেসে উঠলো। কেউ কেউ বললে, মোটেই না, একথা আপনার একেবারেই মিথ্যে!—বাজনাও আসে না?

বাজনার মধ্যে বাঁশীটা একটু চেষ্টা করেছিলুম।

বাঁশী!—লাফিয়ে উঠলো একটি চঞ্চল মেয়ে।—বাঁশীর লোক আমাদের নেই। আপনি আমাদের বাঁশী শোনান একদিন। কেমন?

একটি যুবক আর থাকতে পারলো না। সে ব'লে উঠলো, ঈশানীদির সঙ্গে আলোচনা না ক'রে তুমি ওঁকে কেন অনুরোধ করছো তপতী?

তপতীর হয়ে আরেকটি মেয়ে জবাব দিল, ঈশানীদি কখনো কারোকে কোনো অনুরোধ করেন না, এ কি ভুলে গেছ?

চুপ ক'রে গেল সবাই।

বর্ষীয়সী প্রথম মহিলা বললেন, তাঁকে এ সবের মধ্যে না জড়ানোই ভালো। তা ছাড়া এখানে তিনি ত' বিশেষ আসা-যাওয়া করেন না, আমাদের সঙ্গে দেখাও হয় না।

একটি যুবক বললে, তা যা বলেছেন। তাঁর পক্ষে অজ্ঞাতবাসে থাকাই ভালো। কোথাও তিনি এসেছেন এ খবর জানাজানি হ'লে পাড়ায় পাড়ায় হৈ চৈ প'ড়ে যায়।

এবার শান্তনুকে একটু হাসতে হোলো,—কেন বলুন ত ?

প্রশ্নটা শুনে সবাই বিস্ময়াহত। সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে সবাই তাকালো শান্তনুর প্রতি। লোকটা কি কলকাতায় বাস করে না ? ঈশানীর দেশজোড়া পরিচয় কি শোনেনি ? এত বড় একজন শিল্পীর সম্বন্ধে কি লোকটা কোনো খবরই রাখে না ?

বাইরে রমেনবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল এবং সেই পলকেই যিনি ভিতরে এসে সহাস্যে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখে সকলেই—বর্ষীয়সী মহিলা দুজন সমেত—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওদের সঙ্গে শান্তনুও মুখ ফিরিয়ে দেখলো, ঈশানী।

ঈশানী হাত তুলে শান্তনুকে নমস্কার জানালো, কতক্ষণ এসেছেন মিষ্টার চৌধুরী ?

এই একটু আগে।—শান্তনু শান্তকণ্ঠে জবাব দিল।

রমেনবাবু ফোনে আপনার কথা বললেন। এঁরা সকলে নিশ্চয় খুশী হয়েছেন আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ?

নিশ্চয়ই।—সকলে একবাক্যে জানালো।

ব্যস, ওই পর্যন্ত।—ঈশানী সংযতবাক, এটা নতুন বটে। সমস্ত সকালের ইতিহাসটা সম্বন্ধে উভয়েই উদাসীন। ঈশানী আর সে মেয়ে নেই। একেবারে ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা, উচ্ছ্বাসের বিন্দুমাত্র বাহুল্য কেউ লক্ষ্য করলো না। শান্তনুর সঙ্গে তার পরিচয় ওইটুকু, ওরা সবাই জানলো। কিন্তু তবু ওরা বিস্ময়বিমূঢ়। ওইটুকু আলাপের জন্য শত শত লোক নিত্য লালায়িত, কিন্তু এই লোকটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। ঈশানীর খ্যাতির প্রতি তার গ্রাহ্যও নেই, এবং সেই দুর্লভ খ্যাতির কোনো খবরও রাখে না। হয় লোকটা অতিমানব, আর নয়ত মূঢ়। মূঢ়ই হবে, কেন না ওর চোখ-মুখ একেবারেই নির্বিকার। ওর চেতনায় কোনো কিছু রেখাপাত করে না।

ঈশানী গিয়ে বসলো একটি টেবলে। আজ বেশ গরম পড়েছে। চুলের গোড়ায়-গোড়ায় মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম জমেছে। ঘরের হাওয়াটা গেল বদলে?

অন্ধকার ছিল এতক্ষণ, এবার প্রদীপ্ত শিখা এসে পৌছলো। সমগ্র হলটি সুগন্ধময়, গৌরবের আভায় উদ্ভাসিত।

হেনা ব'লে উঠলো, ঈশানীদি, মিষ্টার চৌধুরী বাঁশী বাজাতে পারেন কিন্তু।

সম্ভব! ঈশানী গুজন ক'রে হাসলো,—একটু যাও ত' হেনা, রমেনবাবুকে ফাইলগুলো পাঠাতে বলো। দেখে-শুনে চ'লে যাই, আমার তাড়া আছে।

হেনা চ'লে গেল। আর সবাই উঠলো। শান্তনু এবার একটু অধীর হয়ে বললে, আমাকেও যেতে হবে এবার।

ঈশানী বললে, বেশ ত', যাবেন বৈ কি। কলকাতায় রাত দুটো পর্যন্ত গাড়ী পাওয়া যায়। বসুন না একটু?

এই অনুরোধের পিছনে যে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব মুখ-ঢাকা আছে, সেটি শান্তনুর জানা। সমস্ত স্নেহের ষোড়শ উপচার প্রত্যাখ্যান ক'রে সে যে চোরের মতো সকালবেলা ঈশানীর ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে, তার জন্য কঠিন লাঞ্ছনাও লুকানো রয়েছে ওই অনুরোধের আড়ালে। শান্তনু একটু কেঁপে উঠলো।

ছেলেমেয়েদের অনেকেই উঠে চ'লে গেল। রইলো কেবল জন তিন চার। বর্ষীয়সী মহিলা দুটির কিছু আর্জি ছিল। তাঁদের একজন এবার বললেন, আমরা রমেনবাবুকে অনেকবার অনুরোধ করেছি, কিন্তু তিনি আপনার কাছে যাবার অনুমতিও দেননি, আপনার ঠিকানাও দিতে চান না।

ঈশানী একটু গম্ভীর হয়ে রইলো। তারপর একটু হেসে বললে, আমার কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ আমি যেখানে থাকি, সে-বাড়ী আপনাদের ছেলেমেয়ের নৈতিক বিচারক্ষেত্র নয়।

তাঁরা সবিনয়ে বললেন, আজ আমরা অনেক সৌভাগ্যে আপনার দেখা পেয়েছি। এবারের মতো আমাদের ছেলেমেয়ে দুটিকে ক্ষমা করুন। আপনি এ প্রতিষ্ঠানের আসল কর্তা।

শান্তকণ্ঠে ঈশানী বললে, অত্যন্ত ভুল আপনাদের ধারণা। আমার কিছু সাহায্য আছে বটে, তবে অধিকার আমার অতি সামান্য!—যাক গে, একটি কথা আমি নিবেদন করি। নাচ-গান করে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা, তাদের

সম্বন্ধে এখনও অনেকে ভয় পায়, অনেকে ভুরু কোঁচকায়। এখানে আনন্দের চেহারাটা অবাধ ব'লেই নানা লোক এখানে অসংযমের চেহারাটা আবিষ্কার করতে চায়। সেজন্য নৈতিক শুচিতা রক্ষাই এখানকার প্রথম মন্ত্র। লোভের উপকরণ এখানে ছড়ানো ব'লেই কঠিন সংযমের দরকার। আপনাদের ছেলেমেয়ে দুটিকে এই প্রতিষ্ঠানে রাখলে যে বিষবাষ্প সৃষ্টি হবে, আমি তার দায়িত্ব নেবার জন্য এ প্রতিষ্ঠানকে বলতে পারবো না। এখান থেকেই অনেক ছেলেমেয়ে বিয়ে ক'রে সুখী হয়েছে, অনেকে প্রণয়সূত্র রচনা করেছে,—কিন্তু বিন্দুমাত্র অসংযমের পরিচয় কেউ দেয়নি। এটা সাধনা ও সিদ্ধির জায়গা, প্রজাপতির কারখানা এটা নয়!—ঈশানী একটু হাসলো।

মহিলা দুজন আরো যেন কি অনুরোধ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এখানকার ঝি পুঁটুর মা এক তাড়া ফাইল নিয়ে এসে ঢুকলো। ফাইলগুলি রেখে সে চ'লে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখ পড়লো শান্তনুর প্রতি। তৎক্ষণাৎ এক গাল হেসে মাথায় একটা ঘোমটা টেনে পুঁটুর মা বললে, ওমা, আপনি এখানে?

শান্তনু সবিস্ময়ে এই অপরিচিত স্ত্রীলোকটির দিকে একবার তাকালো। ঈশানী মুখ ফিরিয়ে উভয়কে লক্ষ্য ক'রে বললে, কি ব্যাপার? তুমি ওঁকে চেনো নাকি, পুঁটুর মা?

চিনিনে? উনি যে আমাদের মুখুজ্যেপাড়ার জামাই! নীরেনবাবুর বোন সুষমাকে বে' করেছেন। আমরা একই বাড়ীর ভাড়াটে।

শান্তনুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটে গেল। সেও তামাসা ক'রে বললো, জামাই ব'লে ঠিক চিনতে পেরেছ ত'? মানুষ ভুল করোনি? অগ্নি আর নারায়ণ সাক্ষী রেখে কিন্তু বিয়ে হয়, তা জানো ত'?

পুঁটুর মা গদগদ হয়ে বললে, ওমা, তা আর বলতে! ঘরে গিয়েই সুখবরটা দেবো। তবে জামাইটি একালের ছেলে কিনা, বুঝলেন বড়দিদিমণি, সুষমাকে সিঁদূর ছোঁয়াতে কিছুতেই উনি দেন না! এই নিয়ে নানা কথা ওঠে!—আপনি ও-বাড়ী যান না কেন জামাইবাবু? ওরা যে ভেবে খুন।

ঈশানী বললে, আচ্ছা, তুমি এখন যাও, পুঁটুর মা।

পুঁটুর মা চেনা লোক পেয়ে আবার একগাল হেসে চ'লে গেল। শান্তনু কাঠ হয়ে ব'সে রইলো আগুনের ডেলার মতো। মেয়েমানুষের গোয়েন্দা-গিরি তার জীবনকে অসহ্য ক'রে তুলেছে।

বর্ষীয়সী মহিলা দুটি নতমুখেই ব'সে ছিলেন নীরবে। নিঃশব্দে যে সাংঘাতিক নাটক একটু আগে ঘ'টে গেল, সেজন্য তাঁদের কোনো উদ্বেগ নেই। কিন্তু প্রথম কথা বললে ঈশানী। বললে, ভারি খুশী হলুম আপনার স্ত্রীর কথা শুনে, মিষ্টার চৌধুরী। এখানে তাঁকে আনছেন কবে? আসুন একদিন, সবাই মিলে গল্প করি! চলুন, এবার যাই।

দরজার বাইরে বোধ করি অনেকেই অপেক্ষা করছিল—কতক্ষণে ঈশানী বেরিয়ে আসবে। তারা দর্শন পেলেই খুশী হয়! ঈশানী উঠে দাঁড়ালো। এবার মরিয়া হয়ে শান্তনু তীব্রকণ্ঠে তাকে একবার ছোবল মারলো,—এর মধ্যে উঠলেন? থানার দারোগার মতন বেশ ত' বক্তৃতা করছিলেন।

কথাটা শুনে ঈশানী একেবারে হাসিতে ফেটে উঠলো। সে যেন সমস্ত কক্ষে রাশি রাশি মণিমাণিক্য ছড়িয়ে দিল। হাসির আওয়াজেই বুঝতে পারা গেল, এতটুকু চিত্তবিকার তার ঘটেনি। তারপর উঠে এসে সে বললে, আসুন, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, নিশ্চয় রাগ করেছেন। আমার ড্রাইভারকে ব'লে দেবো, সে আপনাকে শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে!

শান্তনু বললে, প্রস্তাবটা মন্দ নয়, সেখানে যাবার জন্যেই ব্যস্ত হচ্ছিলুম!

চাপা পরিহাস আর কেউ শুনতে পেলো না, এই রক্ষা! কিন্তু ঈশানী আবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠে অগ্রসর হোলো।

বর্ষীয়সী মহিলা দুটি কাঁচুমাচু হয়ে পিছন দিক থেকে তাকিয়ে রইলেন। ক্ষুদ্র একটি জনতার ভিতর দিয়ে পথ কেটে ঈশানী ও শান্তনু নেমে চ'লে গেল।

পিছন থেকে তখনই রটনা হোলো, শান্তনু চৌধুরীর নাম শোনোনি? কলকাতায় সবচেয়ে ভালো ফ্লুট্ বাজায়! ঈশানী রায়ের নতুন আবিষ্কার! প্রতিভাই প্রতিভাকে খুঁজে বা'র করে!

৪

তেওয়ারী গাড়ী ছুটিয়ে চলেছে। রাত আটটা বেজে গেছে। গাড়ীর মধ্যে ব'সে রয়েছে দুটি মৃতদেহ—শান্তনু আর ঈশানী। অনেকক্ষণ থেকে ওরা চুপ, ওদের মনে নেই।

এক সময় ঈশানী শান্তকণ্ঠে বললে, তুমি বাঁশী বাজাও, একথা সত্যি?

শান্তনু মৃদুকণ্ঠে বললে, আগে বাজাতুম।

ও, বিয়ের পরে বুঝি বৌ মানা ক'রে দিয়েছে, পাছে হার্টের ব্যামো হয়?

শান্তনু জবাব দিল না।

এক সময় ঈশানী সামনে ঝুঁকে প'ড়ে হিন্দিতে বললে, তেওয়ারী, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চলো, এখন ফিরবো না।

তেওয়ারী তৎক্ষণাৎ ভিন্নমুখে গাড়ী ঘোরালো। শান্তনু প্রতিবাদ জানালো না। এক সময় ঈশানী প্রশ্ন করলো, আজ সারাদিনে বাড়ী ফেরোনি মনে হচ্ছে?

শান্তনুর আহত মন সহসা উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, কিন্তু সে দমন করলো নিজেকে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, যে-ব্যক্তি তোমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে চোরের মতন পালিয়ে এসেছে, তার কোনো কথাই ত' বিশ্বাসযোগ্য হবে না!

গাড়ী চলতে লাগলো অনেকক্ষণ! ঈশানী পথের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, যদি বলি তার জন্যে আমার শ্রদ্ধাই বেড়ে গেছে তোমার ওপর?

শ্রদ্ধা!

কোনও প্রকার স্নেহ-মোহ যার মনকে আচ্ছন্ন করে না, সে ব্যক্তি ত' অশ্রদ্ধার পাত্র নয়!—ঈশানী বললে, তুমি কি সত্যিই বাড়ী যাওনি? সারাদিনই পথে পথে ঘুরলে?

শান্তনু বললে, না, বাড়ী গিয়েছিলুম।

স্নানাহার করেছিলে ?

না।

ঈশানী চুপ ক'রে গেল কতক্ষণ। তেওয়ারী লেকের মধ্যে গাড়ী নিয়ে ঢুকে একটি নিরিবিলি অঞ্চলে এসে দাঁড়ালো। তারপর নিজেই সে গাড়ী থেকে নেমে অদূরে গিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইলো।

সামনেই সরোবর। দক্ষিণ বাতাসের মধুর দোলায় লহরীর মালা সঞ্চালিত হচ্ছে। পূর্ণিমা পেরিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রাভা দেখা দিয়েছে পূর্বদিকে। গাড়ীর ভিতরটা অন্ধকার। শান্তনু বললে, তুমি যে বললে আমাকে গাড়ী ক'রে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দেবে ?

ঈশানী স্মিতহাস্যে বললে, আমাকে পরীক্ষা ক'রো না, শান্তনু। আমি ঠিকই পৌঁছে দেবো। সারাদিন ধরে যে রুক্ষ চেহারা নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়িয়েছ, এ অবস্থায় স্ত্রীর কাছে পৌঁছলে সে মেয়েটিও আঁতকে উঠবে। আমার ওখানে গিয়ে স্নান ক'রে সুস্থ হয়ে নাও, তেওয়ারী তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

শান্তনু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো তারপর ফস ক'রে বললে, তোমার অন্ধ স্নেহ আমার কোনো মিথ্যাচারকেই দেখতে পায় না, এটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে ! মেয়েদের শ্রদ্ধা কি এতই সুলভ ?

তুমি বিয়ে করলে আমার শ্রদ্ধা ক'মে যাবে এই বা কেমন ক'রে ভাবলে ? তোমার জীবনের ঘটনা আমার কোন স্বার্থে ত' বাঁধা নেই ! তুমি অবিবাহিত ব'লেই আমার ভালো লেগেছে, এই নোংরা মনোবৃত্তি ত' আমার ছিল না।

শান্তনু বললে, কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে তোমার এই অন্তরঙ্গতা আমার স্ত্রী যদি বরদাস্ত না করে ?

খুব স্বাভাবিক—ঈশানী বললে, তবে নিজের আচরণের শুচিতা যতক্ষণ আমার নিজের মনে সন্দেহ-সঙ্কুল না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুত্ব ! নৈলে তোমার স্ত্রীর অপছন্দের অপেক্ষা রাখবো না, অনায়াসে তোমার সংস্পর্শ ছেড়ে চিরকালের জন্য স'রে যাবো, শান্তনু।

শান্তনু বললে, তা হ'লে প্রথম প্রশ্ন এই আসে, এই বন্ধুত্বই বা কেন ! যার

ভিত্তি দীর্ঘস্থায়ী নয়, যার আয়ু কেবলমাত্র একজনের সাধারণ খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে, তেমন বস্তু নিয়ে নিত্য উদ্বেগের প্রয়োজন আছে কিছু? যে-শিশু জন্মের থেকেই দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ সঙ্গে আনে, তার পক্ষে শিশুকালেই ত' মৃত্যু ভালো!

ঈশানী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো। তার পাশে শান্তনুও নিশ্চল। অন্ধকারের মধ্যে ব'সে রইলো দুই ছায়ামূর্তি। অনাদি-অনন্ত সৌরলোকের দুই কক্ষচ্যুত গ্রহ যেন কাছাকাছি এসে স্থির হয়ে রয়েছে; দুই অপরিচয় যেন পাশাপাশি। উভয় উভয়ের নিকট সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত।

মুখ বাড়িয়ে ঈশানী তেওয়ারীকে ডাকলো। তেওয়ারী এসে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিল। ঈশানী বললে, বাড়ী চলো।

রাত তখন প্রায় দশটা।

এদিকটা বালীগঞ্জের শেষ প্রান্তে পড়ে, আশেপাশে এখনও ঘন বসতি গ'ড়ে ওঠেনি। ক্বচিৎ কখনো ঠুং ঠুং ক'রে রিক্সার আওয়াজ শোনা যায়, আর নয়ত মোটর। এদিকটা বেশ নিরিবিলি।

বাড়ী ফিরতেই টেলিফোন বাজলো। ঈশানী গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। রমেনবাবু ডাকছেন। সেই বর্ষীয়সী মহিলা দুটি এখনও কাকুতি-মিনতি করছেন এখান থেকে বহিষ্কৃত হ'লে তাঁদের ছেলেমেয়ে দুটির যে সামাজিক দুর্নাম হবে সেটির আঘাত তাঁদের পরিবারে কোনমতে সইবে না। ঈশানী সব শুনে বললে, আমারও ওই একই কথা। তবে আপনি যদি ছেলেমেয়ে দুটোকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থায় আনতে পারেন তাহ'লে দেখুন। মুস্কিল এই, ক্ষমা করলেই অন্যের প্রশ্রয় পাবে!

ঈশানী ফোন্ ছেড়ে স'রে এলো। নন্দ আর রামতীরথ এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। শান্তনু বললে, ওবেলা যা খাইয়েছিলে, সন্ধ্যে পর্যন্ত সেটা হজম হোলো, বুঝলে রামতীরথ?

রামতীরথ বললে, যে-আজ্ঞে!

ঈশানী ব'লে দিল, রামতীরথ, তুমি শীগ্‌গির খাবার তৈরী করোগে।

নন্দ আর রামতীরথ দু'জনেই সোৎসাহে চ'লে গেল। ঈশানী এবার হাসিমুখে বললে, ভাইপোটির বদলে এবার বুঝি ক্যামেরাটার ওপর তোমার মায়া পড়েছে? ওটা কি তোমার সঙ্গের সাথী? কোথায় ছবি তুলছিলে সারাদিন?

ঘরের আলোটা একটু নরম। শান্তনু সেইদিকে একবার তাকিয়ে বললে, ওটা সঙ্গেই আছে, কিন্তু ছবি তোলার জন্যে ওটা সঙ্গে রাখিনি।

তবে?—ঈশানী ভ্রূকুঞ্চন ক'রে তাকালো।

ওটা ছাড়া আমার আর কোনো সংস্থান নেই ব'লেই ওটাকে নিয়ে বাড়ী থেকে শেষবারের মতন বেরিয়ে পড়েছি।

ঈশানী বললে, শেষবারের মতন? মানে? বাড়ী থেকে তাড়া খেয়ে?

শান্তনু বললে, তোমার আন্দাজটাই সত্যি!

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো কতক্ষণ, তারপর বললে, হুঁ, এত শীঘ্র তুমি বেরিয়ে আসবে, এ ভাবিনি। ঝগড়া করেছ?

না।

তাহ'লে উপলক্ষ্যটা কি?

শান্তনু বললে, আমি নাকি শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করেছি।

ঈশানী জানতে চাইলো, তোমার স্ত্রী কি শূদ্রের মেয়ে নন্?

শান্তনু তার একাগ্র দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললে, একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে আমার ওপর চাপানো হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে, আমি জানিনে।

কথাটা কান পেতে ঈশানী শুনলো। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সে বললে, এসো, আগে স্নান ক'রে নাও।

শান্তনু উঠে গেল বাথরুমের দিকে। সঙ্গে তার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, ঈশানী জানে। সে নিজে ঢিলা পায়জামা পরে, তারই একটা বা'র ক'রে নিয়ে এলো। এই পরিধেয়টা নীচেকার পাঞ্জাবী মহিলারা তাকে কিছুদিন আগে সুপারিশ করেছিল। গায়ে জড়াবার জন্য নরম রেশমের একটি লম্বা 'রোব' বার ক'রে আনলো। তারপর সেগুলি সযত্নে রেখে এলো বাথরুমে। নন্দকে ডেকে ব'লে দিল, এক বালতি গরম জল দিয়ে আয় ত' নন্দ!

পরদিন ভোরবেলা শান্তনুর ঘুম ভাঙলো নতুন জগতে। অতি মৃদু গানের সুর আসছে দূর থেকে।

বিছানাটা এত নরম যে, সে যেন আরামের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে মধুমাসের বাতাস এসেছে সমস্ত রাত ধ'রে,—সেই পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে শান্তনুর সুশ্রী মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গানের আওয়াজটা দূরের নয়, ঘরে রেডিয়ো যন্ত্রটা অতি মিহিটানে খুলে রাখা। গত রাত্রে শান্তনু যখন বিছানায় উঠেছিল, কি যেন একটা কাজের ছুতো নিয়ে ঈশানী সেই যে গা ঢাকা দিল, আর আসেনি। তার ক্লান্তির কথা ঈশানী জানতো, সুতরাং এটা তাকে ঘুম পাড়াবারই ফন্দি। মেয়েদের বিচার ব্যবস্থা অন্য রকমের।

শান্তনু উঠে বসলো বিছানায়। নন্দ এসে দাঁড়ালো। বললে, আপনি কি বিছানায় বসে চা পছন্দ করেন, ছোটবাবু?

না—শান্তনু জানতে চাইলো, মেমসাহেব উঠেছেন?

নন্দ হাসলো।—উনি ওঠেন রাত থাকতে। তারপর মেহনত সেরে চান করতে যান্।

শান্তনু তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, মেহনত? সে আবার কি?

আমরা কোনদিন দেখিনি, ওঁর ঘর বন্ধ থাকে। শান্তনু কৌতুক বোধ ক'রে উঠে মুখ ধু'তে চ'লে গেল। ফিরে যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, দেখলো সদ্যঃস্নাতা ঈশানী তার মাথার অজস্র রেশমের গোছা ফিরিয়ে বেঁধে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। হাসিমুখে শান্তনুকে অভ্যর্থনা ক'রে বললে, এসো। ঘুম হয়েছিল?

ঘুম! কোন জ্ঞান ছিল না।—শান্তনু এসে মুখোমুখি বসলো।

ঈশানী বললে, বাঁচলুম। ভয় ছিল, অর্ধেক রাত্রে বুঝি আবার শ্বশুরবাড়ীর দিকে পালাও!

শান্তনু খুব হাসলো। তারপর তামাসা ক'রে বললে, সুন্দরী নর্তকী যদি সারারাত পাহারা দিয়ে রাখে তাহ'লে দু'চার দিন শ্বশুরবাড়ী না গেলেও চলে।

অত্যন্ত নির্মল হাসির ধারায় ঈশানী তার পরিহাসের জবাব দিল। প্রভাতের রাঙা আলো এসে পড়েছে ওদের সর্বাঙ্গে রক্তিম আভায়! অপরূপ লাগছে দুজনকে।

রামতীরথ চায়ের সঙ্গে প্রাতরাশ রেখে দিয়ে গেল।

শান্তনু বললে, তুমি নাকি ঘর বন্ধ ক'রে 'মেহনত' করো?

ঈশানী বললে, নন্দটা বলেছে বুঝি। বছর আষ্টেক ধ'রে একটা বদ্ অভ্যাস করেছি বটে। মাঝে মাঝে এই পোড়া দেহটা যে লোকসমাজে বা'র করতে হয়!

ওদিকটা শান্তনুর জানা নেই! অন্যকথায় সে ফিরে গেল। বললে, আরেকবারও জানতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তুমি জবাব দাওনি। তোমার নাকি ভয়ানক খ্যাতি দেশের সর্বত্র?

ঈশানী তাকে তিরস্কার করলো, সকাল বেলা এসব বাজে কথা কেন তুলছো তুমি? খ্যাতিটাই তোমার কানে উঠেছে, কিন্তু ওই নোংরা খ্যাতিকে যে আমি ধিক্কার দিই, একথা কি কেউ তোমাকে বলেনি?

নোংরা কেন বলছ?

যাক্, এ আলোচনা তোমার মুখে মানাবে না, শান্তনু! তার চেয়ে বরং তোমার স্ত্রীর গল্প করো,—শুনতে আমার ভারি সাধ হয়েছে।

শান্তনু সোজা কথায় এলো। বললে, স্ত্রীর গল্প করবো, না আমার স্ত্রী ব'লে যাকে পরিচিত করা হচ্ছে তার গল্প শুনবে?

মানে?—ঈশানী উৎসুক হয়ে বললে, পুঁটুর মা যা বললে, তা কি সত্যি নয়?

পুঁটুর মা চোখে যা দেখেছে, তার বাইরে সবটাই মিথ্যে।

তুমি বিয়ে করোনি?

না।

লুকোচ্ছো আমার কাছে—ঈশানী তাকালো।

শান্তনু বললে, তোমার ওপর লোভ থাকলে লুকোতুম বৈ কি। তোমাকে

ভয় পেয়েও লুকোতুম, তোমার সঙ্গে চিরস্থায়ী সম্পর্ক রাখার আসক্তি থাকলেও লুকোতুম।

আশ্চর্য, সুষমা কি তোমার স্ত্রী নয়?

না।

তা হ'লে কি এই কথাই বুঝবো, তুমি তাকে লোভ দেখিয়ে পথে ভাসিয়ে পালাতে চাইছো?

শান্তনু চায়ের পেয়ালা রেখে অবাক হয়ে ঈশানীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঈশানী বললে, ঠিক অবস্থাটা বলো, শান্তনু, আমার কাছে কোনো লজ্জা ক'রো না। যদি দরকার হয় আমি তোমাদের সমস্ত বিপদে সাহায্য করবো। কি হয়েছে সত্যি বলো ত?

শান্তনু শান্তকণ্ঠে বললে, বিশ্বাস করো ঈশানী, এ জীবনে আমার হাতে কোনো মেয়ের প্রতি অবিচার হয়নি! আর—আর যদি বেশী জানতে চাও, তাহ'লে অকপটে বলবো, আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের কেশাগ্রও স্পর্শ করিনি, তাদের একটি আঙুলও কখনও ছুঁইনি!

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো কতক্ষণ হাসিমুখে। আগাগোড়া ব্যাপারটা তার সত্যই বোধগম্য হচ্ছিল না। কোথাও কিছু একটা চাপা থেকে যাচ্ছে, এই তার ধারণা। একসময় সে বললে, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করা যায় না?

যায় বৈ কি।

বাইরে থেকে কে যেন সাড়া দিল। ঈশানী মুখ ফিরিয়ে বললে, কে? এদিকে এসো।

একটি লোক জুতো ছেড়ে এদিকে এগিয়ে এলো। ঈশানী বললে, ও আপনি? নন্দকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম। এঁর গায়ের মাপটা নিন্ ত?

লোকটা ফিতা বা'র ক'রে শান্তনুর দিকে এগিয়ে এলো। ঈশানী বললে, আজ সন্ধ্যের দিকে অন্তত গোটাদুই পাঞ্জাবী বানিয়ে কেচে ইস্তিরি ক'রে দেবেন। এঁর বিশেষ দরকার।

সমস্ত ব্যাপারটার খেই হারিয়ে শান্তনু উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। বাইরের লোকের সামনে এমন কোনও মন্তব্য করা চলবে না, যেটা প্রতিবাদের মতো শোনায়। লোকটা তাকে উল্টে পাল্টে অনেক রকমের মাপ নিয়ে একসময় বললে, সন্ধ্যেবেলাতেই দিতে পারবো। বাকিগুলো একে একে এক সপ্তাহের মধ্যেই দিয়ে দেবো।

ঈশানী বললে, রেশমী কাপড় দেবেন না, বেশী সৌখীন হ'লে ওঁর পক্ষে অসুবিধে হবে।

লোকটা চ'লে যাবার পর শান্তনু বললে, পরের পয়সায় যদি বা একটু নবাবী করার সুবিধে পেলুম, লোকটাকে তুমি মানা ক'রে দিলে।

ঈশানী বললে, পরের পয়সা মানে? তোমাকে দিচ্ছে কে? এ ত' তোমারই টাকা।

শান্তনু বললে, অর্থাৎ?

তোমার ক্যামেরাটা যে আমি কিনে নিয়েছি।

কিনে নিয়েছ! এ যে তুমি দাদাকেও হার মানালে! যার সম্পত্তি সে জানলো না, অথচ বিক্রি হয়ে গেল? কত টাকা দিয়ে কিনলে শুনি?

হাসিমুখে ঈশানী বললে, যার সম্পত্তি সেই নির্দেশ করবে!

শান্তনু বললে, মনে রেখো ওটা আমার মূলধন। ওটাই ভাঙ্গিয়ে আমার পেট চলবে।

বেশ ত'—এখন থেকে তাই হবে!

সমস্যার এত সহজ মীমাংসা দেখে শান্তনু হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে, ঈশানী, তুমি কি আজ থেকে আমার সব ভার নিতে চাইছ?

ঈশানী বললে, স্বীকার ক'রে মরি আর কি! মেয়েমানুষ তোমার সব ভার নিলে তুমি হয়ত সব ফেলে পালাবে একদিন। তোমার মনের চেহারা আমার জানতে আর বাকি নেই!

তাহ'লে এভাবে আমার বন্ধনদশা ঘটাচ্ছ কেন? বনের পাখী সোনার খাঁচার লোভ ছেড়ে যদি আর উড়ে যেতে না চায়?

ঈশানী বললে, সে অজ্ঞান ব'লেই পোষ মানে। তুমি বনের পাখীর চেয়েও বন্য!

তোমার স্নেহ পেয়ে যদি পঙ্গু হয়ে যাই?

তোমার স্ত্রীর ভালোবাসাই সেই পঙ্গুতাকে ঘুচিয়ে তোমাকে পথ দেখাবে! ভয় কি?

শান্তনু বললে, কোথায় আমার স্ত্রী?

ঈশানী বললে, সুষমা কেমন মেয়ে আমি জানিনে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক যদি সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়, তা হ'লে আমি তোমার বিয়ে দিয়ে তোমার সংসার গুছিয়ে দেবো।

সংসার গুছিয়ে দেবে, মানলুম। কিন্তু মন? সে যদি কোনো গোছ না মানে? যদি সে সব পেয়েও কাঁদুনে শিশুর মতন আবদার ধ'রে থাকে?

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। কথাবার্তাগুলো তাড়াতাড়ি বড়ই গাম্ভীর্যের দিকে ঘেঁষে গেল। এক সময় সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, চলো যাই।

শান্তনু বললে, কোথায়?

বলছি।—ব'লে বারান্দার ছাদের দিকে ঈশানী এগিয়ে গেল, এবং গলা বাড়িয়ে বললে, তেওয়ারী, গাড়ী বাহার কর দো।

যো হুকুম, মেমসাব।—তেওয়ারী সাড়া দিল।

বিপন্নভাবে শান্তনু এগিয়ে এসে বললে, এই কিম্ভুতকিমাকার পোষাক নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি যাবো কোথায়?

ঈশানী বললে, বটে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছ একবার? সত্যবানের বৌ সতী সাবিত্রীরও মাথা ঘুরে যেত?

ঈশানী তাড়াতাড়ি ভিতরে গেল, এবং মিনিট দশেকের মধ্যে সেও ওই একই ঢিলা পায়জামা আর লম্বা গাউন চড়িয়ে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, এবার ভয় ভাঙলো ত?

শান্তনু বললে, সর্বনাশ! দুজনে এই জোব্বা নিয়ে পথে নামলে রাস্তার লোক কি ঠাওরাবে বলো ত?

মধুর আনন্দে ঈশানী হেসে উঠলো। বললে, নির্বোধ পথচারীরা চিরকালই যা কল্পনা ক'রে আনন্দ পায়, তাই ভাববে! চলো।

দুজনে নেমে এলো নীচে। গাড়ীতে উঠে ঈশানী নিজেই ষ্টিয়ারিং ধরলো। শান্তনুকে বসালো পাশে। তেওয়ারী যথারীতি পিছনের সীটে বসলো।

ফটক ছাড়িয়ে গাড়ী বেরিয়ে গেল।

একটা কথা জানবার জন্য শান্তনু অনেকক্ষণ থেকে উদ্বিগ্ন ছিল! কথাটা যে নতুন, তা নয়! মিহিজামে থাকতে সমস্ত হাসি পরিহাসের মধ্যেও ঈশানী একথাটা বলতে ভোলেনি যে, তাকে একটি বিশেষ বিষয়ে সাহায্য করা দরকার। বস্তুত, সাহায্যলাভের কথা থেকেই তাদের দুজনের প্রথম ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু সে-সাহায্য কি প্রকার, সেটার আনুপূর্বিক আলোচনা কোনো সময়ই হয়নি। গত-কাল থেকেও সে লক্ষ্য করেছে, ঈশানীর সমস্ত স্নেহ-সম্ভাষণ এবং সমাদরের আড়ালে ওই কথাটাই যেন সর্বপ্রধান হয়ে সকল প্রকার আলোচনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা বিস্ময়জনক সন্দেহ নেই। যার হাতের মধ্যে এত বড় প্রতিষ্ঠান, এত লোকজন এবং সুযোগ-সুবিধে চারিদিকে, অর্থের স্বাচ্ছল্য যার অব্যাহত, তার পক্ষে সাহায্যের জন্য নিরুপায়ের মতো হাত পেতে দাঁড়ানো একটু বিচিত্র ধরনের বৈ কি। আর্থিক, বৈষয়িক অথবা সামাজিক কোনো সাহায্যই ত' ঈশানীর পক্ষে দুর্লভ নয়।

শান্তনু শান্তভাবে বললে, আমার কথাগুলো তুমি আগাগোড়া শুনে নিলে, কিন্তু আমাকে দিয়ে তোমার কি দরকার মিটতে পারে,—কই, সে কথা একবারও বললে না ত'?

ষ্টিয়ারিং ধ'রে পথের দিকে চেয়ে ঈশানী হেসে বললে, আগে একটা কথা দাও আমাকে?

কি কথা?

আমার অবাধ্য হবে না কোনোদিন, কথা দাও?

দিলুম।

কথা দাও, কোনো অবস্থায় আমাকে ফেলে চ'লে যাবে না?

শান্তনু বললে, এত' আবার সেই বন্ধনদশার কথাই এনে ফেলছ। তুমি কি আমাকে দিয়ে দাসখৎ লিখিয়ে নিতে চাইছো? তোমার ঘরে বসে, দুটি-দুটি ভাত খাবো, তোমার মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী হাসি-তামাসা ক'রে তোমার মন ভোলাবো, দরকার হ'লে তোমার ফাই-ফরমাস খাটবো, এবং তোমার রূপের সুখ্যাতি করতে করতে তোমার পিছনে-পিছনে ঘুরবো,—তুমি কি এই কথাই আমার মুখ থেকে স্বীকার করিয়ে নিতে চাও? আমি পুরুষ মানুষ, ভুলে যেয়ো না, ঈশানী! আমার দাপটে মেদিনী কম্পিত থাকুক, সব পুরুষের মতন আমারও তাই কাম্য।

ষ্টিয়ারিংয়ের ওপর হাত রেখেই ঈশানী একেবারে হেসে লুটোপুটি। শান্তনু তৎক্ষণাৎ আবার যোগ ক'রে দিল, পুরুষকে খুশী করবার জন্যে মেয়েছেলের জন্ম, এই জেনে তোমার বাড়ী ঢুকেছিলুম, কিন্তু মেয়েছেলেকে খুশী করার জন্য আমার জন্ম, এই জেনে হয়ত তোমার বাড়ী থেকে পালাতে হবে।

আবার! ভালো হবে না কিন্তু!—ঈশানী শাসালো তাকে।

শান্তনু বললে, বেকার বসে থাকবো তোমার পাশে, আর দুটো ভালোমন্দ কথা বলতে পারবো না, এ কি কখনও হয়? আজ যদি তোমার দরকারের কথাটা না শুনতে পাই, তবে অর্ধেক রাত্রে ঠিকই শ্বশুরবাড়ী পালাবো।

আমার কিন্তু বিশ্বাস হয়ে গেছে, বিয়ে তুমি করোনি!

কেমন ক'রে বিশ্বাস করলে?

ঈশানী বললে, যে-পুরুষ একদিনের জন্যেও মেয়েছেলেকে নিয়ে কাটিয়েছে, তার চরিত্রের ইসারা অন্য রকমের। তুমি সেই চরিত্রের নও। আঁচলের হাওয়া তোমার গায়ে আজও লাগেনি।

শান্তনু বললে, তুমি জানলে কেমন ক'রে? তোমারও ত' কোনো অভিজ্ঞতা নেই!

ঈশানী সহাস্যে বললে, যদি বলি অনভিজ্ঞ নই, তা'হলে কি তুমি ঘেন্না করবে আমাকে?

শান্তনু বললে, ওটা ঠিক বুঝিনে, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরা কি স্বামীকে ঘেন্না করে ?

ওটা আমিও বুঝিনে, শান্তনু।—ঈশানী আবার হেসে উঠলে।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো একটি জনবহুল বাজারের সামনে। ফলের ও মনোহারির দোকান ঠিক পাশাপাশি। তেওয়ারী গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে ফলের দোকানে দাঁড়ালো। সেখান থেকে নিল কতকগুলি মেওয়া ফল, পাশের দোকান থেকে নিল কেক, বিস্কুট, মাখনের টিন, লজেন্স ইত্যাদি। অনেক দ্রব্যসম্ভার নিয়ে সে গাড়ীতে আবার এসে উঠলো। সমস্ত ব্যাপারটা যেন যন্ত্রচালিত। বুঝতে পারা যায়, এখানে ঈশানী নিয়মিতই আসে।

গাড়ী ছেড়ে দিল আবার। অনেক লোকের ভিড়। কথা বলছে না দুজনে। সতর্কভাবে ড্রাইভ করছে ঈশানী। জনতা তাকে বড্ড বেশী লক্ষ্য করছে। যৌবন যেন রাজবেশ ধরেছে। সবাই সেলাম ঠুকে যায়। এই গাড়ীর চাকার নীচে প্রাণ দেবার জন্য হয়ত অনেকেই প্রস্তুত হ'তে পারে !

দেখতে দেখতে নানাপথ পেরিয়ে একটি পুল ছাড়িয়ে গাড়ী এসে ঢুকলো এক গেট্‌-এর মধ্যে। সামনেই বিস্তৃত বাগান। বাগানের পরে বিশাল এক অট্টালিকা। উত্তর দিকের খোলা মাঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নানা খেলায় মত্ত। গাড়ী থামিয়ে ঈশানী বললে, একটু বসো, আমি বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

শান্তনু অপেক্ষা ক'রে রইলো। ঈশানী সেই ঢিলা পায়জামা আর জোব্বা সমেত নেমে গেল ও-পাশের পর্চের তলা দিয়ে ভিতর দিকে। মোটরের ঘড়িটার দিকে শান্তনু একবার তাকালো। পাশের সীট এখন শূন্য, কিন্তু সেখানে ঈশানী তার শুষ্ক চুলের সুগন্ধ রেখে গেছে। ষ্টিয়ারিংটায় হাত বুলিয়ে সে দেখলো, ঈশানীর নধর হাতের তালুর মধুর উত্তাপ এখনও জড়ানো। তেওয়ারী বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আন্দাজ করা যায়, ঠিক তারই মতো ঈশানীর জীবনটা একেবারে বাধ্য-বাধকতাহীন। এতদিনের মধ্যে একটিবারও ঈশানী তার কোন আত্মীয়স্বজনের

উল্লেখ করেনি! তবে কি কেউ নেই তার? কেন নেই? আছে কি কেউ? ছিল কেউ? সহসা অসীম কৌতূহলে শান্তনু আচ্ছন্ন। পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ, কিন্তু বৃন্তটা কই? গাছটা কোথায়? নামহারা পরিচয়হারা বনফুল। কিন্তু এটা ত' কাব্য। মা-বাবা-ভাই-বোন—তারা কোথায়? কেন ঈশানীর এই নিঃসঙ্গ স্বেচ্ছা-নির্বাসন?

মিনিট দশেক পরে ঈশানী বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে এলো একটি ইউরোপীয় মেম, এবং একটি নয় দশ বছরের সুশ্রী বালক। মেম-এর একখানা হাত জড়িয়ে ধরেছে বালকটি। হাসি হাসি মিষ্ট মুখ। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন রূপ।

ঈশানী ইঙ্গিত ক'রে শান্তনুকে নেমে আসতে বললে। নেমে এলো শান্তনু। ঈশানী উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল ইংরেজি ভাষায়।—ইনি হলেন শিলভিয়া ভায়োলেট—আমার অতি প্রিয় বন্ধু,—আর ইনি মিষ্টার চৌধুরী, এ জগতে আমার একমাত্র নবলব্ধ অভিভাবক।

সবাই সোল্লাসে হেসে উঠলো। ঈশানী বললে, আর একে চিনতে পারো? শিলভিয়ার ছেলে। ভিক্টর ডাট্। একটু একটু বাংলা বোঝে কিন্তু।

বিস্ময়ের কথা বৈ কি। শান্তনু হাসিমুখে গিয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর শিলভিয়ার দিকে চেয়ে বললে, কোন্ খনি থেকে এমন রত্ন খুঁজে পেলে, মিস ভায়োলেট?

ঈশ্বরের দান মিঃ চৌধুরী।

ভিক্টর ডাট্ মধুর ইংরেজি ভাষায় শান্তনুকে বললে, মিষ্টার চৌধুরী আমি একটা ছোট্ট লাইব্রেরী গড়েছি। আসুন, আপনাকে দেখাই। সব বই হোলো শিকারের আর ভ্রমণের গল্প!

চলো, নিশ্চয়ই দেখবো।

ভিক্টর সোৎসাহে বললে, জানেন, অ্যাড্ভেন্চারের গল্প সব চেয়ে ভালো। নানিংয়ের গল্প আপনি জানেন?

নানিং! গ্রীণল্যাণ্ডে যে গিয়েছিল বলছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি দেখছি সব জানেন। রোজ আসবেন ত? মাম্মি বলেছে, বড় হয়ে আমি সোয়েন হেডিনের গল্প পড়বো!

পিছনে পিছনে হাসিমুখে আসছে ঈশানী আর শিলভিয়া! শিলভিয়া বললে, বুঝলে চৌধুরী, ও হোলো সত্যি একটা প্রতিভা,—বাড্ডিং! বিশ্বাস করো, 'কুইয়্যার ষ্টোরিজ' আমাকে মুখে-মুখে বানিয়ে বলে। ওর চেহারাটি তোমার বেশ সুন্দর লাগছে না?

হাসিমুখে শান্তনু বললে, এত সুন্দর যে, বর্ণনা করতে গেলে তোতলা হয়ে যাই!

উল্লোল হাসির ফোয়ারায় সবাই যেন ফেটে পড়লো। শিলভিয়া তারপর মৃদু গলায় ঈশানীকে বললে, এমন সুরসিক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু দিন দিন তুমি যে আরো সুশ্রী হয়ে উঠছো, ব্যাপারটা কি বলো ত?

প্রেমে পড়েছি!—শিলভিয়ার কানে কানে ঈশানী বললে।

বিশ্বাস করিনে!

কেন? পড়তে পারিনে?

শিলভিয়া বললে, তোমার হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থ নেই। অনেক রাজপুত্র তোমার পায়ে সর্বস্ব দিতে পারতো, কিন্তু তোমার কঠিন মন গ্রাহ্যও করেনি। আর তা হবেই ত! তুমি হীরে কুড়িয়ে পেয়েছিলে, চকচকে পরকলার কাচে তোমার মন উঠবে কেন? জানি ত' সব!—যাকগে, খবর পেলে কিছু?

ঈশানী ঘাড় নেড়ে জানালো, না।

এতকালের মধ্যে কোনো সঙ্কেত পেলে না? তবে যে সেদিন বললে, পাঞ্জাব না কোথাকার কোন্ কাগজে তার একটা খবর দেখেছিলে? তুমিই ত বলেছিলে, তারি সন্ধান করবে। একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে মন্দ কি?

ঈশানী বললে, অবশ্য একবার শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে! আচ্ছা, সে কথা পরে হবে।

শিলভিয়া বললে, তুমি ত' তোমার এই বন্ধুর সাহায্য নিতে পারো এসব কাজে?

ঈশানী বললে, সেকথা আমি ভেবেছি, তবে ওঁকে এখনও খোলাখুলি কিছু বলিনি।

ভিক্টকরের সঙ্গে শান্তনু বেরিয়ে এলো। তেওয়ারী এগিয়ে গিয়ে এবার একজন খানসামার হাতে খাদ্যসামগ্রীগুলি একে একে তুলে দিল।

শিলভিয়া সোৎসাহে ব'লে উঠলো, কেমন, দেখলেন ত' মিষ্টার চৌধুরী, ও ছেলে আশ্চর্য। দু' দুবার ফার্ষ্ট হয়েছে এই কনভেণ্ট স্কুলে। আমি জানি ও ছেলে বড় হয়ে দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি হবে। ওর কৌতূহল এবং জানবার পিপাসা দেখে এখানে সবাই অবাক। রূপের সঙ্গে এমন গুণ ক'জন বালকের হয়!

ঈশানী বললে, ছেলের বড্ড সুখ্যাতি ক'রে ফেলছ তুমি, শিলভিয়া!

শিলভিয়া বললে, তুমি বাধা দিলেও আমি শুনবো না, ঈশানী! সব ছেলেই আমার সন্তান, কিন্তু ওর বৈশিষ্ট্য বর্ণনার অতীত।

ঈশানী হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে রুমাল দিয়ে ছেলেটির কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল। কিন্তু ভিক্টর আর শান্তনুর বন্ধুত্ব দেখার মতো। ওদের যেন কতকালের আলাপ! এই কন্‌ভেণ্টে কবে একটি মাছরাঙ্গা পাখী এসেছিল, ক্রিকেট খেলায় এবার কে-কে নাম করেছে, ওরা সদলবলে গঙ্গায় গিয়ে ভারতীয় ক্রুজার জাহাজ কবে দেখেছে, চিড়িয়াখানায় কোন্ জানোয়ার এসেছে নতুন,—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা গল্প নিয়ে ওরা দু'জন মেতে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে শান্তনুও তলিয়ে গেছে নিজের বাল্যকালে। সে মার্বেল গুলী খেলতো তার ছোটবেলায়, চলন্ত ষ্টিমারে দাঁড়িয়ে লাট্টু ঘোরাতো, পিক্‌নিক্ করতে যেতো বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে, ফুটবল-এ সে গোলকীপার খেলতো,—এবং তারপর একবার জঙ্গলে গিয়েছিল বন্দুক হাতে নিয়ে,—ইত্যাদি সব রোমাঞ্চকর কাহিনী।

অবশেষে ভিক্টর ধ'রে বসলো, সপ্তাহে অন্তত দু'বার তাকে এখানে আসতেই

হবে। এমন চমৎকার লোককে না পেলে তার কিছুতেই চলবে না। ড্ কাম্, প্লীজ, মিষ্টার চৌধুরী!

ঈশানী তামাসা ক'রে বললে, তুমি যে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলে শান্তনু।

শান্তনু ভিক্টরকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছিল। বললে, মুগ্ধ যদি কেউ করে, আমি নিরুপায়!

ঈশানী একবার তন্ময় হয়ে তাকালে ওদের দিকে, তারপর বললে, এবার চলো যাই।

ওরা সবাই পরস্পর বিদায় নিয়ে গাড়ীতে এসে উঠলো। তেওয়ারী এবার চালাবে। ঈশানী আর শান্তনু বসলো পিছনে। ভিক্টর চট ক'রে একবার গাড়ীর ভিতরে ঢুকে ওদের দুজনের সঙ্গে সাদরে করমর্দন ক'রে গেল। তারপর শিলভিয়া এগিয়ে এলো। ঈশানী বললে, বলবে কিছু, শিলভিয়া? এঁর কাছে গোপন ক'রো না, ইনি সব জানেন আমার।

শিলভিয়া বললে, আজকের টাকা কি ডোনেশনের খাতায় তোলা হবে?

ও আচ্ছা, আমি ফোনে কথা বলবো ফ্রেডেরিকের সঙ্গে।

শিলভিয়া চ'লে গেল। তেওয়ারী গাড়ী ছেড়ে দিল। চুপ ক'রে রইলো ঈশানী। উল্লাসের সমস্ত কলরবটা রেখে এলো সে ওখানে, গাড়ীর মধ্যে ব'সে সে যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কথা বলছে না কেউ। শান্তনু শুধু মনে মনে প্রশ্ন করছিল—সবই কি তোমার জানি? কই, কিচ্ছু জানিনে ত? শুধুই কি বন্ধুত্ব ওদের সঙ্গে, আর কিছু নয়? টাকা দিলে কেন শিলভিয়াকে? অত খাবার কিনে আনলে কা'র জন্যে? আর আমাকে অন্ধকারে রেখো না, ঈশানী।

গাড়ী হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। ঈশানী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল বাইরের দিকে চেয়ে। রৌদ্র গরম হয়ে উঠেছে। রুমাল বা'র ক'রে ঈশানী তার রাঙ্গা মুখখানা একবার মুছলো। একসময় সহসা সে যেন দূর আকাশ থেকে নেমে এলো। বললে, ভিক্টরের মুখের সঙ্গে তোমার ভাইপোটির একটু আদল আসে, নয়?

মাথা ঝাড়া দিল শান্তনু। বললে, হয়ত আসে, কিন্তু ভিক্টর চমৎকার। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন রূপ! ওদুটো বস্তু একসঙ্গে পেলে আনন্দে আমি অধীর হই।

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো। একটু পরে বললে, শিলভিয়ার মতো মাকে ওর পাশে বেশ মানায়, না?

কিন্তু ভিক্টর ত' ওর ছেলে নয়?

ঈশানী কিয়ৎক্ষণ থেমে বললে, কনভেণ্টের অনেক শিশু জন্ম-রহস্যে বাঁধা, এ কি তুমি জানতে না?

শান্তনু বললে, ওটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। জন্মরহস্য যদি থাকে থাক, পৃথিবীর সব শিশু নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ। প্রাকৃতিক কারণে প্রত্যেক সন্তানই কামজ, কিন্তু প্রেমের দ্বারা সেই সন্তান যদি অভিষিক্ত না হয়, তবে সে দোষ তার পিতামাতার,—তার নয়!